সাধন-সমর

বা

দেবী মাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

প্রথম খণ্ড

ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ—মধুকৈটভ-বধ

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব

নবম সংস্করণ

মাতৃ-চরণাশ্রিত সন্তান
শ্রীযোগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

সাধন-সমর কার্য্যালয়
২০১নং মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

সন ১৩৬৫ সাল

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র

প্রকাশকের নিবেদন

মা! যে দিন তুমি তোমার বড় সাধের শ্রীশ্রীচণ্ডীর ব্যাখ্যারূপে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইয়াছিলে, যে দিন দেবীমাহাত্ম্যের অপূর্ব্ব-রহস্য-পূর্ণ সাধনতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই দিন তুমিইত বাসনারূপে প্রাণে ফুটিয়া উঠিয়াছিলে—"যে অমৃতবিন্দু পান করিয়া আমাদের সংসার-সন্তপ্ত, বাসনাক্লিষ্ট শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় প্রাণগুলিও দিন দিন সরস ও মধুময় হইয়া উঠিতেছে; সে অমৃত জগতের প্রত্যেক নরনারী পান করিয়া সংসার-সন্তাপ বিমুক্ত হউক। আর—কুটিল রহস্যজালে আচ্ছন্ন সাধনার অন্ধকারময় গহ্বরগুলি অখণ্ড মধুময় সত্যের বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হউক।" আজ সে দুইটি বাসনাই তোমার মহীয়সী কৃপায় সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে; ইহা দেখিয়া, আমাদের চির অকৃতজ্ঞ হৃদয়ও তোমার রাতুলচরণে কোটি প্রণিপাত জ্ঞাপন করিয়া ধন্য হইতেছে।

সাধন-সমর বা দেবীমাহাত্ম্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। সহৃদয় পাঠক-বর্গের আগ্রহ এবং আনুকুল্য থাকিলে, সর্ব্বোপরি ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হইলে, দ্বিতীয় খণ্ড মহিষাসুরবধ ও তৃতীয় খণ্ড শুম্ভবধ প্রকাশ করিবার আশা রহিল। যাঁহাকে নিমিত্ত করিয়া এই মাতৃ-মহত্ত্বের প্রচার, আমাদের প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও এই গ্রন্থে তাঁহার পবিত্র নামটী সংযুক্ত করিয়া, পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিবার অনুমতি আছে—তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস—বরিশাল, নবগ্রাম—ঠাকুরবাড়ী।

লিপিকর, মুদ্রাকর ও মুদ্রণসংশোধকগণের অপরিহার্য্য অনবধানতার ফলে, স্থানে স্থানে ভ্রমপ্রমাদ রহিয়াছে। সহৃদয় পাঠকমহাশয়গণ সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ভগবৎকৃপায় পরবর্ত্তী সংস্করণে উহা সংশোধন করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করা যাইবে; ইতি।

মাতৃচরণাশ্রিত—

দাসানুদাস শ্রীপ্যারীমোহন দত্ত।

সাধন-সমর আশ্রম

প্রথম সংস্করণ,

ভাদ্রী পূর্ণিমা, ১৮৪২ শকাব্দা

দ্বিতীয় সংস্করণ, দেবীপক্ষ ১৮৪৬ শকাব্দা, তৃতীয় সংস্করণ দেবীপক্ষ ১৮৫০ শকাব্দা, চতুর্থ সংস্করণ, শ্রাবণী শুক্লা, দ্বিতীয়া ১৮৫৫ শকাব্দা, পঞ্চম সংস্করণ শ্রাবণী শুক্লা দ্বিতীয়া; জন্মতিথি ১৮৬০ শকাব্দা, ষষ্ঠ সংস্করণ, শ্রীপঞ্চমী ১৮৬৫ শকাব্দা। সপ্তম সংস্করণ শ্রাবণী শুক্লা দ্বিতীয়া ১৮৭০ শকাব্দা। অষ্টম সংস্করণ, নবনবতিতম সত্যাব্দ, শ্রাবণী শুক্লা দ্বিতীয়া, ১৩৭৯ সাল।

নবম সংস্করণের নিবেদন

মঙ্গলময়ী মায়ের ইচ্ছায় ব্রহ্মগ্রন্থিভেদের অষ্টম সংস্করণ মুদ্রিত হইল। মুদ্রণ দোষক্রটী যথাসাধ্য সংশোধন করা সত্ত্বেও অনবধানতাবশতঃ যাহা রহিয়া গেল, তাহা মার্জ্জনার চক্ষে দেখিবেন।

এই অমৃতবর্ষী ও সাধন জগতে নবযুগ প্রবর্ত্তনকারী গ্রন্থের যিনি লেখক, সেই মাতৃকল্প ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষের স্থূল শরীর লৌকিক চক্ষুর অন্তরালস্থ হইলেও আজ তাঁহার এই অমর দান, তাঁহার এই জীবহিতকর অমোঘ আশীর্ব্বাদ, তাঁহার দিব্যদৃষ্ট এই মহাসত্যরসামৃত শ্রদ্ধাবান্ পাঠকবৃন্দের হৃদয়ে অমৃতই বর্ষণ করিয়া অসিতেছে। তাঁহার এই দান সংসার-সন্তপ্ত জনগণের—সাধন পথের পথিকদিগের হৃদয়ে দিন দিন নূতন প্রেরণা ও আশার সঞ্চার করুক, মায়ের নিকট ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

পঞ্চসপ্ততিতম সত্যাব্দ ১৩৬৫ সাল
৺শ্রীশ্রীদুর্গা সপ্তমী
২০১নং মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—বিনয়াবনত—
কার্য্যাধ্যক্ষ
সাধন-সমর কার্য্যালয়

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান :—
সাধন-সমর আশ্রম,
লিলুয়া, হাওড়া।
সত্যাশ্রম—কারমাটার
ইষ্টার্ণ রেলওয়ে

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫নং চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা।

ব্রহ্মানন্দং পরম-সুখদং কেবলং জ্ঞান-মূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি ॥

গুরো! বহুরূপধারি-নারায়ণ-মূর্ত্তি তোমার সেবার জন্য এ আয়োজন তোমারই! তোমার সেবায় তুমি পরিতৃপ্ত হও! লীলা-কল্পিত অজ্ঞানতা ও আনন্দহীনতার ভাণ পরিত্যাগ করিয়া, একবার তোমার সেই বিজ্ঞানময় আনন্দময় মূর্ত্তিতে দাঁড়াও। সেবা সফল হউক! সেবক ধন্য হউক!

গুরোর্মধ্যে স্থিত মাতা মাতৃমধ্যে স্থিতো গুরুঃ।
গুরুস্মাতা নমস্তেহস্তু মাতৃগুরুং নমামাহম্॥

উদ্বোধন

মাতৃস্নেহ

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

হে অমৃতের বরপুত্র স্নেহের দুলাল বৎসগণ! কে কোথায় —আর্ত্ত দীন দুঃস্বপ্ন-পীড়িত—অজ্ঞানের—মিথ্যার গভীর কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছ! পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাতে, রোগ শোক অনুতাপের মর্ম্মন্তুদ উৎপীড়নে, চঞ্চলতার ঘোর আবর্ত্তনে মথিত দলিত ছিন্নমর্ম্ম হইয়া, হতাশের উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছ! এস, ছুটিয়া এস, পুত্র! সন্তান! এই দেখ—তোমাদের জন্য আমার বিশাল বক্ষ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। অনন্ত বাহু প্রসারিত করিয়া, তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছি। তোমরা মা বলিয়া ডাকিবে—তোমাদের কমনীয় শিশুকণ্ঠ-বিনির্গত সুধাময় মাতৃ-আহ্বান শ্রবণ করিয়া আমি আত্মহারা হইব, তোমাদিগকে আত্মহারা করিব। তোমাদের ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করিব, তোমরা অমর হইবে, তাই মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতেছি—এস বৎস! এস পুত্র! একবার নয়ন উন্মীলন কর। আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কতকাল কাঙ্গাল সাজিয়া থাকিবে। দেখ মুহূর্ত্তের জন্য আমি তোমাদিগকে অঙ্কচ্যুত করি নাই। তোমরা আমারই গর্ভে জাত, আমারই অঙ্কে ধৃত, আমারই স্তন্যে পরিপুষ্ট হইয়া অগ্রসর হইতেছ। দুঃখ আর ত্রিতাপ বলিয়া কিছু নাই, জন্ম

বা মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই, নৈরাশ্য বা উৎপীড়ন বলিয়া কিছু নাই, যাহা দেখিয়া তোমরা ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইতেছ, উহা আমারই স্নেহস্তন্য।

অই শোন! সত্যের বিজয় ঝঙ্কার উঠিয়াছে, সত্যালোকের শুভ্র জ্যোতি দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়াছে, মধুময় মাতৃ-আহ্বানে ব্যোমমণ্ডল মুখরিত হইতেছে, বসুন্ধরা প্রাণময় সত্য-আহ্বানে জড়ত্ব পরিত্যাগ করিয়াছে, সলিলরাশি সত্য-নিনাদে উদ্বেলিত হইতেছে, বায়ু সত্যধ্বনির অভিঘাতে তরঙ্গায়িত হইতেছে, অন্তরীক্ষ সত্যের পূত প্রণব-নাদে পরিপূরিত হইতেছে; এখনও তুমি সুপ্ত থাকিবে? এখনও মিথ্যার কালিমা মুখে মাখিয়া দীনতার দুঃস্বপ্নে উৎপীড়িত হইবে? আর না, বৎস! একবার এস, একবার ফিরিয়া দাঁড়াও, একবার মুখটী ফিরাও, আমি তোমাদের মুখ চাহিয়া কত যুগ যুগান্তর অপেক্ষায় বসিয়া আছি। এস মাতৃক্রোড়স্থ মাতৃহারা শিশু। অমৃতের সঞ্জীবনী ধারায় অভিষিক্ত হও। শান্তির—আনন্দের বিমল সলিলে অবগাহন কর। মায়ের কোলে নিত্য অবস্থান বা ব্রাহ্মীস্থিতির উপলব্ধি করিয়া অমর হও। তোমাদের শিরে শ্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক! তোমরা ধন্য হও।

দেবীসূক্ত—আমি কে ?

অম্ভৃণ নামক মহর্ষির বাক্‌নাম্নী এক কন্যা ব্রহ্মবিদুষী হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনিও ঋষি। ইনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া, যে আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই দেবীসূক্ত নামে কথিত। ইহাতে আটটি মন্ত্র আছে। এই দেবীসূক্তই চণ্ডীর মৌলিক উপাদান। চণ্ডী বা দেবীমাহাত্ম্য ইহারই বিশ্লেষণমাত্র। দেবীসূক্ত বেদ ; ইহা আপ্তকাম ভ্রম-প্রমাদশূন্য ঋষির সম্বেদন ; সুতরাং অপৌরুষেয়। চণ্ডীতে যে শব্দরাশি আছে, তাহা কোন মহর্ষির মুখে উচ্চারিত হইলেও, উক্ত শব্দরাশি যে জ্ঞান ও যে ভাবের প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নিত্য ও অপৌরুষেয়। সর্ব্বকালে সর্ব্বশ্রেণীর সমুন্নত সাধক ও মহাপুরুষদিগের হৃদয়ে ঐ একই জ্ঞান ও একই ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কেবল দেশ কাল পাত্র ও ভাষাগত বিভিন্নতা হেতু উক্ত অপৌরুষেয় জ্ঞান ও ভাবপ্রকাশক ভাষার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

দেবীসূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয়—সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মা। দেবীমাহাত্ম্যে এই পরমাত্মাই মহামায়ারূপে উপাখ্যানাকারে বর্ণিত হইয়াছে। পরমাত্মা ও মহামায়া অভিন্ন। শাস্ত্রীয় তর্কমূলক বিচারে কিংবা মৌখিক আলোচনায় মায়াকে আত্মা হইতে পৃথক্ বলা যায় মাত্র ; কিন্তু যাঁহারা সাধক, যাঁহারা ব্রহ্মবিৎ, যাঁহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ, তাঁহারা জানেন—আত্মা ও মায়া সম্পূর্ণ অভিন্ন পদার্থ। যতক্ষণ সাধনা আছে, যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ আত্মা মায়ারূপেই অভিব্যক্ত। যখন পরমাত্মা—তখন সাধ্য নাই, সাধনা নাই, সাধক নাই, শাস্ত্র নাই, চিন্তা নাই, ভাষা নাই। ভাষা চিন্তা কিংবা সাধনার মধ্যে আসিলেই, আত্মা মায়ারূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। তাই পরমাত্মাই দেবীসূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, চণ্ডীতে ইহা মহামায়ারূপেই অভিবর্ণিত হইয়াছে। এ সকল তত্ত্ব যথাস্থানে বিশদরূপে আলোচিত হইবে।

সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই প্রধান লক্ষ্য পরমাত্মজ্ঞান। আত্মবস্তু—জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়গত অসংখ্য বিভিন্নতার মধ্যেও অভিন্নভাবে সর্ব্বজীবে তুল্যরূপে বিদ্যমান। "আমি" কে? ইহা যথার্থরূপে জানার নাম আত্মজ্ঞান। জীবমাত্রেই এই আপনার স্বরূপটী জানিবার জন্য লালায়িত। যতদিন ইহা বুঝিতে না পারে, ততদিন সে সাধারণ জীবমাত্র। যখন জীব এই আত্মানুসন্ধানটী প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তখন লোকে তাহাকে সাধক ভক্ত ইত্যাদি আখ্যা দিয়া থাকে।

মানুষ যখন এই আত্মাভিমুখী গতি উপলব্ধি করিতে পারে, তখন তাহার বাহ্যিক যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, উহাই নিবৃত্তিমার্গ বা সাধনা নামে কথিত হয়। ঐ লক্ষণগুলিই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধিনিষেধ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কর্ম্মমাত্রই সাধনা, জীবমাত্রই সাধক এবং আত্মস্বরূপের অনুভূতিই সাধ্য। আত্মভাবশূন্য সর্ব্ববিধ সাধনাই অসম্যক ফলপ্রদ। যতক্ষণ আমি ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করা হয়, ততক্ষণ বস্তুগত্যা একমাত্র আমিই উপাসিত হইলেও (কারণ আমি ছাড়া কোথাও কিছু নাই) উহা অবিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত; সুতরাং মুক্তিরূপ মহাফল প্রদানে অসমর্থ। অতএব এক কথায় বলিতে গেলে আত্মভাবশূন্য সকল সাধনাই অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত। আবার আত্মানুসন্ধানযুক্ত আহার বিহারাদি জাগতিক কর্ম্মগুলিও সাধনা-পদবাচ্য হইয়া থাকে। এই আত্মাই—আমি—মা। আমাকে চেনা—মাকে পাওয়া ও আত্মসাক্ষাৎকার করা, এই তিনই এক কথা। দেবীসূক্তে "অহং"রূপে যে তত্ত্ব প্রকাশিত, চণ্ডীতে তাহাই মহামায়া-রূপে অভিবর্ণিত হইয়াছে। দেবীসূক্তে যাহা আত্মা, চণ্ডীতে তাহাই মা। সুতরাং শ্রীশ্রীচণ্ডী যে কেবল শাক্ত সম্প্রদায়েরই পাঠ্য, ইহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক কথা।

জীব যাহাকে চায়—জ্ঞানে বা অজ্ঞানে জীবের যাহা যথার্থ অভীষ্ট বস্তু, তাহার প্রকৃত স্বরূপ-সম্বন্ধে একটা স্থূল জ্ঞান সর্ব্বপ্রথমে একান্ত আবশ্যক; নতুবা অভীষ্টলাভের পথ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। তাই, দেবীসূক্ত না জানিয়া চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। আমরা জগতে যে

অধিকাংশ সাধককে প্রায় বিফলমনোরথ হইতে দেখি, তাহার একমাত্র কারণ উদ্দেশ্যহীনতা। ভগবৎস্বরূপ না জানিয়া—অমৃতের সন্ধান না লইয়া, সাধনাপথে অগ্রসর হইলে, পথ যে বিঘ্নসঙ্কুল হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? সে যাহা হউক, চল সাধক! আমরা প্রথমে মায়ের স্বরূপ কথঞ্চিৎ ধারণা করিয়া লইবার জন্য দেবীসূক্তের শরণাপন্ন হই।

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ।
অহংমিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥১॥

অনুবাদ। আমি (সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা) রুদ্র বসু আদিত্য এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করি। মিত্র বরুণ ইন্দ্র অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আমি ধারণ করি।

ব্যাখ্যা। অহং আমি ; সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ আত্মাই আমি। যদিও সাধারণতঃ আমি বলিলে, দেহাত্ম-বুদ্ধি-বিশিষ্ট জননমরণধর্ম্মী সুখদুঃখচঞ্চল একটী সংসারক্লিষ্ট জীবমাত্র বুঝি তথাপি একটু ধীরভাবে "আমি"র স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, আমরা ইহা অপেক্ষা অনেক উন্নত স্তরের "আমি" দেখিতে পাই। এস পিপাসিত সাধক! আমরা মায়ের নাম নিয়া অগ্রসর হই!

সচরাচর আমরা বলিয়া থাকি, "আমার দেহ"। ইহাতে আমরা কি বুঝি—দেহ হইতে আমি পৃথক্ একজন। আমার সত্তায় দেহের সত্তা। আমি দেখিতেছি, তাই দেহ আছে। আমি দেহ নই ; আমাতে দেহ আছে। এইরূপে আমরা দেহ হইতে "আমি"কে সম্পূর্ণ পৃথক্-রূপে বুঝিতে পারি। এখন ক্রমে অগ্রসর হওয়া যা'ক্—"আমার প্রাণ" "আমার মন" "আমার জ্ঞান" "আমার আনন্দ" এই যে শব্দ-গুলি আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি, উহা যে একেবারেই না বুঝিয়া বলি, তাহা নহে ; তবে বুঝিয়াও যেন বুঝি না এমনই একটা ভাব। আচ্ছা থাক্ যখন বুঝি না তখন না-ই বা বুঝিলাম, এখন বুঝিতে বসিয়াছি, নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিব। এই যে দেহ হইতে পৃথক্, প্রাণ হইতে পৃথক্, মন হইতে পৃথক্, জ্ঞান হইতে পৃথক্, আনন্দ

হইতে পৃথক্‌রূপে একটী ‘আমি’র সন্ধান পাইতেছি, ঐটী-ই না দেহাদি পাঁচটি আবরণের ভিতর দিয়া অভিন্নভাবে প্রকাশ পাইতেছে। আমার গৃহখানিকে যেরূপ “আমি গৃহ” বলিয়া বুঝিনা, সেইরূপ “আমি দেহ” “আমি মন” এরূপ প্রতীতিও আমাদের কখনও হয় না। তবে গৃহখানি ভাঙ্গিয়া গেলে যেরূপ আমি দুঃখিত হই, গৃহখানি সুসজ্জিত হইলে যেরূপ সুখী হই, ঠিক সেইরূপই দেহ প্রাণ মন ইত্যাদির সহিত “আমি” সুখ দুঃখের সম্বন্ধ বিশিষ্ট। দেহাদির সুখ দুঃখে “আমি” সুখ দুঃখের অনুভব করিয়া থাকে মাত্র। কেন করে, তাহা পরে বলিব। বস্তুতঃ ‘আমি’ কিন্তু সুখদুঃখশূন্য দেহাদিশূন্য একজন।

এইরূপে আমরা যাহাকে যথার্থ অন্বেষণ করি, সেই প্রকৃত বস্তুটীর সন্ধান পাইলাম। এইবার আমরা উহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করি। এতক্ষণ আমরা বিচারবুদ্ধির সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম, এইবার শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্য লইতে হইবে ; কারণ যথার্থ আত্ম-স্বরূপ জ্ঞান তাঁহার কৃপা ব্যতীত হইবার উপায় নাই ; তবে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা যতটুকু ধারণা করা যাইতে পারে, ততটুকু বুঝিবার চেষ্টা করায় ক্ষতি কি ?

আচ্ছা, ঐ যে দেহাদি হইতে পৃথক্ একটী ‘আমি’র সন্ধান পাওয়া গেল, আমরা যদি উহার স্বরূপটী বলিতে বা বুঝিতে যাই, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিব বা বুঝিব—অচিন্ত্য অব্যক্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য কিন্তু ‘সত্য’। চিন্তা করিয়া ঐ ‘আমি’ কে, তাহা ধরিতে পারি না, বাক্য দ্বারা বলিতে পারি না, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারাও অনুভব করিতে পারি না ; কিন্তু সে জিনিষটী যে সত্যই আছে, তাহা বুঝিতে পারি। কোনরূপেই ‘আমি’ নাই, ইহা প্রতীতি গোচর হয় না। এই যে সত্য ‘আমি’, আমরা সর্ব্বদাই ইহার উপলব্ধি করিতেছি, অথচ বুঝিতে পারিতেছি না। আচ্ছা থাক্, এই ‘আমি’র নাম রাখ সত্য বা আত্মা।

শাস্ত্র বলেন, এই আত্মার স্বরূপ আনন্দ। আনন্দ-বস্তুটীর বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, সত্য জ্ঞান আনন্দ অর্থাৎ সৎ চিৎ ও আনন্দ। সৎ একটী সত্তা—একটা কিছু আছে। চিৎ ঐ

সত্তাটী চৈতন্যময়, সেই যে আছে বলিয়া একটা প্রতীতি হয়, উহা শুধু সত্তা নহে—উহা চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় এবং ঐ জ্ঞানময় সত্তাটী নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। আরও একটু সরলভাবে আলোচনা করা যাউক।—"আমি" আছে, আমি বুঝিতেছি যে, "আমি" আছে এবং ঐ "আমিটীই" আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু; সুতরাং আনন্দময়। এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই "আমি"। এই "আমিই" সত্য। এই সত্যলাভই জীবমাত্রের উদ্দেশ্য, কারণ, ওখানে—ঐ আমিতে জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ হাসি কান্না কিছুই নাই, অথচ পূর্ণ আনন্দ আছে। পার্থিব সুখ এবং এই আনন্দ কিন্তু ঠিক এক জিনিষ নয়। এ জগতে অভীষ্ট বস্তু পাইলে আমার সুখ হয়, তদ্বিপরীতে দুঃখ হয়; 'আমি' কিন্তু এমনই একটী ক্ষেত্র, যেখানে অভীষ্ট অনভীষ্ট, পাওয়া বা না পাওয়া কিছুই নাই অথচ সর্ব্বদা আনন্দ রহিয়াছে। এক কথায় উহাতে অপর কোনও ভাব, যথা—দেহ মন প্রাণ ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম অধর্ম্ম সুখ দুঃখ জীব জগৎ ইত্যাদি কোনও ভাবই নাই। ঐ যে সর্ব্বভাব-বিনির্ম্মুক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা, উনিই হইতেছেন "আমি"। উনিই সত্য। উঁহাতে নিত্যযুক্ততা-উপলব্ধি করাই ব্রাহ্মীস্থিতি। স্থূলকথায় এই 'আমি' বস্তুটীকে সর্ব্বদা ধরিয়া থাকাই মানুষের মনুষ্যত্ব। যে মানুষ আমি কে, তাহা জানে না, সে পশু; ইহা শাস্ত্রকারগণ বলিয়া থাকেন। এই 'আমিই' সাধকের ইষ্টদেব। কালী কৃষ্ণ শিব দুর্গা আল্লা গড্ ইত্যাদি ইহারই বিভিন্ন পর্য্যায়মাত্র। যে সাধক তাহার ইষ্টদেবের যত অধিক নিকটবর্ত্তী সে-ই তত উন্নত, তত সুখী; কারণ, সুখ বা আনন্দই তাহার স্বরূপ। পরে এই সকল তত্ত্ব বহুস্থানে আরও বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা হইবে। পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা এই আত্মতত্ত্বটী বেশ বুঝিয়া লইয়া তবে চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইবে। অম্ভৃণঋষির দুহিতা বাক্ যখন এই সত্যে—এই আমিতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই দেবীসূক্ত। তিনি বলিতেছেন—"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি" আমি একাদশ রুদ্র ও অষ্টবসুরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকি।

একাদশ রুদ্র।—"রোদয়তি সর্ব্বমন্তকালে ইতি রুদ্র।" বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন—অন্তকালে যিনি সকলকে কাঁদাইয়া থাকেন, তিনি রুদ্র। চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, এই একাদশ রুদ্র। ইহারাই জীবের জন্মমৃত্যুর হেতু; সুতরাং কাঁদাইবার কর্ত্তা। আমরা যে ইন্দ্রিয় পথে প্রতিনিয়ত খণ্ড খণ্ড চৈতন্য-সত্তার উপলব্ধি করিতেছি, উহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ "আমি"—আত্মা; অন্য কেহ নয়। "আমিই" ইন্দ্রিয়পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছে। 'আমি যে আছেন', ইহা আমরা ইন্দ্রিয় ও মন দ্বারা প্রতিনিয়ত বোধ করিতেছি। যখন ইন্দ্রিয় ও মন সুপ্ত হইয়া পড়ে, তখন আর আত্মসত্তার উপলব্ধি করিতে পারি না; সুতরাং আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বিষয় গ্রহণ করি এবং মনে যাহা কিছু ভাবি, সকলই সত্যস্বরূপ আত্মা। সাধক! বেদের এই সকল বাণী হৃদয়ে অতি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত রাখিও, চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া যেন ভুলিয়া যাইতে না হয়।

অষ্ট বসু।—ধন বা অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য! অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যরূপে ঐ সত্যই প্রকাশ পাইতেছে। অথবা ভাগবতে বসু শব্দের অর্থ করা হইয়াছে শুদ্ধ-সত্ত্বগুণ। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয় হইলে, সাধকের পুলক অশ্রু কম্প স্বেদ প্রভৃতি অষ্টবিধ বহির্লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহাই ভক্তগণের বসু বা ঐশ্বর্য্য। এই অষ্টবসুরূপেও "আমি"—সত্যস্বরূপ আত্মাই প্রকাশ পাইতেছেন।

অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ:—আমিই দ্বাদশ আদিত্য ও বিশ্বদেববৃন্দরূপে প্রকাশমান। আদিত্য—অদিতি হইতে সঞ্জাত। অদিতি—প্রকৃতি—ত্রিগুণাত্মিকা—সত্ত্বরজস্তমোময়ী। বুদ্ধি, অহঙ্কার চিত্ত ও মন; এই অন্তঃকরণ-চতুষ্টয় প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত। অন্তঃকরণ-চতুষ্টয় আবার গুণত্রয়ের সংযোগ তারতম্য বশতঃ দ্বাদশ ভেদ বিশিষ্ট হয়। যথা সত্ত্বগুণাত্মক বুদ্ধি, রজোগুণাত্মকবুদ্ধি এবং তমোগুণাত্মক বুদ্ধি। এইরূপ মন চিত্ত ও অহঙ্কার ত্রিগুণে গুণিত হইয়া দ্বাদশপ্রকার ভেদবিশিষ্ট হয়; ইহারাই আদিত্য নামে

অভিহিত। মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার ও সত্ত্ব রজঃ তমোগুণরূপে একমাত্র 'আমি'—সত্য স্বরূপ আত্মাই প্রকাশমান।

মনকে একবার রুদ্র বলিয়া আবার আদিত্য বলায় কোন দোষ হয় নাই। মনের যে অংশ জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াভিমুখী বা ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র, তাহাই রুদ্র—দুঃখদায়ক। আর যে অংশ বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বের অভিমুখী, তাহাই আদিত্য অর্থাৎ মনের সেই অংশে চৈতন্যের প্রকাশ ধর্ম্ম-অধিক আছে।

বিশ্বদেব—যে চৈতন্য এই বিশ্বরূপে বিরাজিত তাহাই বিশ্বদেব। এই বহু নাম রূপ ও ব্যবহার বিশিষ্ট হইয়া যে চৈতন্য-সত্তা প্রকাশ পাইতেছে, উহারই নাম বিশ্বদেব। নাম রূপ ও ব্যবহারভেদে ঐ চৈতন্যাংশের অসংখ্য ভেদ পরিলক্ষিত হয়; তাই বিশ্বদেব বহু। এই বিশ্বদেব মূর্ত্তিতেও "আমি"—আত্মাই নিত্য প্রকাশিত; সুতরাং জগদ্ রূপে যাহা আমাদের প্রতীত হইয়া থাকে, তাহা সত্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"যদিদং কিঞ্চ তৎ সত্যম্"। এই যাহা কিছু প্রত্যক্ষ কর—বোধ কর সকলই সত্য। সাধক! মনে রাখিও —এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপে একমাত্র সত্য "আমি"রই প্রকাশ। এই জগৎ প্রপঞ্চই—"আমি"র ব্যক্তস্বরূপ। এ সকল তত্ত্ব দেবীমাহাত্ম্যে বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হইবে।

অহং মিত্রাবরুণৌ—মিত্র সূর্য্যের অন্য নাম। দ্বাদশাদিত্য মধ্যে ইনি প্রধান। অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণাত্মক প্রকাশের নাম মিত্র। এক কথায় ধর্ম্মই মিত্র। ধর্ম্মই যথার্থ বন্ধু; কারণ, মৃত্যুর পরও সঙ্গে গমন করে ও আনন্দ প্রদান করে। বরুণ—জলাধিপতি। জীবকে অনন্ত কালের জন্য সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন করে বলিয়া অধর্ম্মই এস্থলে বরুণ শব্দের অর্থ। অতএব "মিত্রাবরুণৌ—ধর্ম্মাধর্ম্মৌ" ইহা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রাগ্নী—সুখদুঃখে। ইন্দ্র—ঐশ্বর্য্যশালী অর্থাৎ সুখস্বরূপ; অগ্নি—দাহজনকত্বহেতু দুঃখস্বরূপ; সুতরাং ইন্দ্রাগ্নী শব্দের অর্থ— সুখ এবং দুঃখ। এইরূপ অশ্বিনৌ—প্রাণাপানৌ ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।

প্রাণ এবং অপান বায়ুকে অশ্বিনীকুমার কহে। মিত্রাবরুণৌ, ইন্দ্রাগ্নী এবং অশ্বিনৌ; ইহারা উভয়াত্মক দেবতা; ইহারাই দ্বন্দ্ব। স্থূলজগতে এই সকল দেবতা ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুখ দুঃখ এবং প্রাণ অপান-রূপে প্রকাশিত। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং তজ্জন্য সুখদুঃখ ও তাহার ভোগস্থান অপানসহকৃত প্রাণরূপে একমাত্র "আমি"—বিশুদ্ধ চৈতন্যময় আত্মাই প্রকাশিত। প্রাণ একটী জড়বায়ুমাত্র নহে; অনুভূতি-স্থান। অপানের সহচারিত্ব নিবন্ধনই প্রাণের ভোগ নিষ্পন্ন হয়.।

"উভৌ বিভর্ম্মি" শব্দের অর্থ—উভয়কে ধারণ করি। আত্মা ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থ নাই; সুতরাং তিনিই ঐসকল রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং এই সকল বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াও তাঁহার স্বীয় বিশুদ্ধ অখণ্ড চৈতন্য সত্তার বিন্দুমাত্র বিকার হয় না। একমাত্র আত্মাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ; সুতরাং তিনি—আমি এক অথচ বহুভাবে বিরাজিত; সুতরাং বহুভাবের ধারণকর্ত্তা। সেইজন্য মন্ত্রে "বিভর্ম্মি" পদটির প্রয়োগ হইয়াছে।

এইখানে বলিয়া রাখি—রুদ্র বসু আদিত্য প্রভৃতি শব্দের এরূপ ব্যাখ্যা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ঐ সকল নামে কোন দেবমূর্ত্তি নাই। রুদ্রাদি শব্দ যে বিশিষ্ট চৈতন্যের প্রকাশক, সেই বিশেষ ভাবাপন্ন চৈতন্যাংশের নামই দেবতা। উঁহারা সর্ব্বত্র বিরাজিত। ভক্তগণের কাতর প্রার্থনায় বাধ্য হইয়া কৃপাপূর্ব্বক বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে উঁহারাই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ভক্তগণের স্ব স্ব সংস্কারানুরূপ ঐ সকল মূর্ত্তির প্রকাশ হয়। তাহাই পুরাণাদি-শাস্ত্রবর্ণিত দেবমূর্ত্তি। দেবতাতত্ত্ব দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইবে।

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥২॥

অনুবাদ—আমি শত্রুহন্তা সোম, ত্বষ্টা, পূষা এবং ভগ নামক দেবতাগণকে ধারণ করি। যাহারা দেবতাগণের উদ্দেশ্যে প্রচুর

হবির্যুক্ত সোমযাগাদি অনুষ্ঠান করে, সেই যজমানগণের যজ্ঞফল আমিই ধারণ করি।

ব্যাখ্যা। আহনস্ শব্দের অর্থ শত্রুহননকারী। সোম শব্দের অর্থ সোমযাগ। দুর্জ্জয় কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে নির্জ্জিত করিবার জন্য সোমযাগাদির অনুষ্ঠান করা হয়। পক্ষান্তরে, সোম শব্দের অর্থ চন্দ্র। চন্দ্র মনের অধিপতি দেবতা। মন যখন কাম ক্রোধাদিবৃত্তিরূপ রিপুগণকে বশীভূত করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহাকে আহনস্ সোম বলা যায়।

ত্বষ্টা—বিশ্বকর্ম্মা। যিনি এই বিশ্বকে গঠন করেন। অর্থাৎ যে চৈতন্যকর্ত্তৃক বিশ্ব বহুবিধ নামে ও রূপে ব্যাকৃত হয়, তিনিই ত্বষ্টা।

পূষণ্—সূর্য্য। পক্ষান্তরে পুষ্টিরূপা চেতনা। যে চৈতন্য দৈহিক এবং মানসিক পুষ্টিরূপে প্রকাশিত তাঁহারই নাম পুষণ্।

ভগ—ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব। সর্ব্ববিধ অভ্যুদয় ও ইচ্ছার অনভিঘাতরূপে যে চৈতন্য প্রকাশিত, তিনিই ভগ নামে কথিত হন।

এই সকলকে অর্থাৎ শত্রুহননকারী সোম, ত্বষ্টা, পূষা এবং ভগ নামক দেবতাগণকে "অহং বিভর্ম্মি" আমিই ধারণ করি। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা আমিই ঐ সকল রূপে আত্মপ্রকাশ করি।

অহং দধামি দ্রবিণং—আমি দ্রবিণকে ধারণ করি। কেবল সোমযাগাদিরূপ কর্ম্মকাণ্ডকেই যে ধারণ করি তাহা নহে, কর্ম্মকাণ্ডের যাহা দ্রবিণ তাহাও আমাকর্ত্তৃক পরিধৃত। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকাণ্ড যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলে তজ্জন্য একটী অপূর্ব্ব অর্থাৎ শুভাদৃষ্ট উপচিত হয়। কালে ঐ অপূর্ব্ব যথোক্ত ফল প্রসব করে। এই অপূর্ব্বকে দ্রবিণ বলে।

হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে—যজমানগণ অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠাতৃগণ দেবতাগণের উদ্দেশ্যে প্রচুর হবির্যুক্ত যে সোমযাগাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, ঐ সকল যাগাদির যাহা দ্রবিণ, তাহা কালান্তরভাবি ফলের জন্য যজমানগণের নিমিত্ত আমিই ধারণ করিয়া থাকি।

একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ আত্মা আমিই যাবতীয় কর্ম্মরূপে কর্ম্মসংস্কার রূপে এবং কর্ম্মফলরূপে বিরাজ করি। ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞীয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥৩॥

অনুবাদ। আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিশ্বরী। আমি পার্থিব ও অপার্থিব ধনদাত্রী। আমি ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপা সম্বিদ্ বা জ্ঞানরূপা। এই জ্ঞানই যাবতীয় উপাসনার আদি। আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থিতা। আমি ভূরিভাবে অনন্তজীবে প্রবিষ্টা, দেবতাগণ এইরূপে আমাকে বহুভাবে উপাসনা করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রে অহংপদটী স্ত্রীলিঙ্গরূপে উক্ত হইয়াছে। অহং অলিঙ্গক, সর্ব্বলিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। একটী গানেও শুনিয়াছি, —'তুমি পুরুষ নারী চিন্‌তে নারি, কোনও যুক্তিশাস্ত্রে মিলে না।' এই মন্ত্রে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া এবং অন্যান্য মন্ত্রেও শক্তিরূপে চৈতন্যের বিকাশ দেখিয়াই বোধ হয় প্রাচীন আচার্য্যগণ এই বেদমন্ত্রগুলিকে দেবীসূক্ত আখ্যা দিয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি—"অহং" অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য। বাক্যের মধ্যে আসিলেই তিনি শক্তিরূপে প্রকাশিত হন। রাম কৃষ্ণ শিব ইত্যাদি পুংলিঙ্গ শব্দেরই প্রয়োগ কর, দুর্গা কালী রাধা ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দেরই প্রয়োগ কর কিংবা ব্রহ্ম প্রভৃতি ক্লীবলিঙ্গ শব্দেরই প্রয়োগ কর, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। তবে ইহা স্থির, যতক্ষণ তিনি বুদ্ধি ইন্দ্রিয় কিংবা ধ্যানধারণার মধ্য দিয়া প্রকাশিত, ততক্ষণ তিনি শক্তিরূপেই প্রত্যক্ষভূতা।

সে যাহা হউক, এইবার আমরা মন্ত্রটীর অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। 'রাষ্ট্রী' শব্দের অর্থ প্রপঞ্চরূপে বিরাজিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী ; এক কথায় জগদীশ্বরী। 'বসু' শব্দের অর্থ ধন। পার্থিব গো-হিরণ্যাদি এবং অপার্থিব জ্ঞানবিদ্যাদি, এতদুভয় ধনের একমাত্র

সঙ্গময়িত্রী অর্থাৎ সর্ব্ববিধ-ধনদায়িনী 'আমি'। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ধনরূপে আমি প্রকাশমান ; এখন বলিতেছেন সেই ধনের প্রাপয়িত্রীও আমি।

'চিকিতুষী' শব্দের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান। যে জ্ঞান দ্বারা জীব 'আমি'র স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, সেই জ্ঞান-স্বরূপা "আমি"—মা। "প্রথমা যজ্ঞীয়ানাম্"—এই জ্ঞানই যজ্ঞাঙ্গসমূহের মধ্যে প্রথম। 'আমি'র স্বরূপ কথঞ্চিৎ অবগত হইয়া, যজ্ঞাদি উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় ; নতুবা ঐ সকল কর্ম্ম অবৈধ হইয়া থাকে। তাই 'চিকিতুষী' সমস্ত উপাসনার আদি। ইহা দ্বারা বুঝা গেল—উপাসনা, উপাসনার ফল এবং উপাসনার আদি বা কর্ম্মকাণ্ডের মূলীভূত জ্ঞানরূপেও একমাত্র 'আমি'রূপী চৈতন্যসত্তাই বিরাজিত।

'ভূরিস্থাত্রা' শব্দের অর্থ বহুভাবে অবস্থিতা। 'ভূরি আবেশয়ন্তী' শব্দের অর্থ বহুভাবে প্রবিষ্টা। অনন্তভাবে অবস্থিতা আমি। আবার অনন্তভাবের মধ্যে আমিই নিত্য-প্রবিষ্টা। 'তাং মা দেবা ব্যদধুঃ'—এইরূপ আমিকে আত্মাকে দেবতাগণ ভজনা করে। দেবতাগণ—উন্নতজ্ঞান-বীর্য্যসম্পন্ন সন্তানগণ এই অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবজগদ্‌রূপে প্রকাশমান আমিকে বহুভাবে উপাসনা করিয়া থাকে, অর্থাৎ যেখানে যাহা কিছু দেখে, যেখানে যাহা কিছু পায়, তাহাই যে 'আমি'—তাহাই যে সত্য আত্মা, এইরূপ জ্ঞান নিয়া সরল শিশুর ন্যায় আমাকে আত্মা বলিয়া—মা বলিয়া ডাকে। ইহাই ত' দেবতাদিগের লক্ষণ।

ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষীয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবন্তে বদামি ॥৪॥

অনুবাদ। জীব যে অন্নাদি খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করে, দর্শন করে এবং প্রাণধারণ করে, এই সকল ক্রিয়া আমাকর্ত্তৃকই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। যাহারা আমাকে এইরূপ (সর্ব্বকর্ম্মের ভিতর দিয়া) দেখে

না, বুঝিতে পারে না, তাহারাই সংসারে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। হে সৌম্য! তোমায় এই যে সকল তত্ত্ব বলিতেছি, ইহা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যা। অন্ন শব্দের অর্থ আহার্য্য দ্রব্য। স্থূল দেহ রক্ষার জন্যই হউক, অথবা মনোময়াদি সূক্ষ্ম দেহ পুষ্ট করিবার জন্যই হউক, জীব যে আহার বা বিষয় আহরণ করে, উহা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা "আমিই" নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।

বিপশ্যতি—দর্শন করে। কি জ্ঞান-নেত্রে, কি বহিশ্চক্ষুতে জীব যে প্রত্যক্ষ করে, ঐ প্রত্যক্ষ করা রূপ ক্রিয়াটীও 'আমি' কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয়।

যঃ প্রাণিতি—ঐ যে প্রতিনিয়ত শ্বাস প্রশ্বাসরূপ প্রাণন-ক্রিয়া দ্বারা জীবগণ জীবিত রহিয়াছে, উহারও একমাত্র কর্ত্তা "আমি"।

যঃ শৃণোতি—ঐ যে কর্ণেন্দ্রিয় দ্বারা জীবগণ শব্দ গ্রহণ করিতেছে, উহারও কর্ত্তা একমাত্র আমি।

এইরূপ সর্ব্ববিধ কর্ম্মই যে 'আমি' কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইতেছে ইহা যাহারা মানে না—বিশ্বাস করে না, তাহারাই 'মাং অমন্তবঃ'। মানুষ দিবারাত্র যে পুরুষকার বলিয়া চীৎকার করে, যে অহং-বোধ নিয়া জগতে বেড়ায়, সেই পুরুষটি কে? সেই অহংএর স্বরূপ এবং কার্য্য কি? একটু লক্ষ্য করিলে সকলেই বুঝিতে পারে; অথচ যাহারা ইচ্ছা করিয়া ইহা বুঝিতে চায় না, তাহারাই 'আমি'কে উপেক্ষা করে, অবমাননা করে। ঈশোপনিষদে—এইরূপ মনুষ্যকেই আত্মহন্ বা আত্মঘাতী পুরুষ বলা হইয়াছে। এইরূপ যাহারা সত্যকে—আত্মাকে অবমাননা করে, "ত উপক্ষীয়ন্তে" তাহারাই সংসারে নানারূপ লাঞ্ছিত হইয়া থাকে।

কৃতজ্ঞতা-প্রকাশরূপ ধর্ম্মটি পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ জাতির মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে এই ধর্ম্মের বিকাশ না থাকিলে তাহাকে পশু অপেক্ষাও হীন মনে করা অন্যায় নহে। কার্য্যতঃ, জগতেও সে সকলের চক্ষেই উপেক্ষিত হইয়া থাকে।

মনে কর, তুমি পথিমধ্যে এমন এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছ যে, সামান্য একটিমাত্র পয়সার জন্য লাঞ্ছিত হইতেছ, নিজ বাড়ীতে আসিলে একটি পয়সা কেন, একশত টাকার জন্যও তোমার অভাববোধ হয় না ; কিন্তু আজ তুমি সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে একটি পয়সার অভাবে অসম্মানিত হইতে বসিয়াছ। এমন সময় কোন অপরিচিত লোক অযাচিতভাবে তোমাকে একটি পয়সা দিয়া উপকার করিল। তুমি বাড়ী আসিয়া পয়সাটির বিনিময়ে তাহাকে শত টাকা দিলে ; কিন্তু যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তোমার বুকের ভিতর একটা কৃতজ্ঞতার ভাব—একটা অবনত ভাব ফুটিয়া উঠিবেই, যদি তুমি মানুষ হও। আর—যিনি আমাদিগের সর্ব্বকর্ম্মের প্রেরক, যাঁহার আলোকসম্পাতে আমাদের এই জগদ্‌ভোগ, যিনি আমাদের প্রাণ দিয়াছেন, যে প্রাণ আমাদের সর্ব্বস্ব, সেই প্রাণরূপে যিনি প্রতিনিয়ত আমাদের সর্ব্ববিধ ভোগ-বাসনা পূর্ণ করিতেছেন, তাঁর দিকে একবারও আমরা সম্পূর্ণ সরলভাবে একটা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিলাম না ; আমরা যদি সংসারে উপক্ষীণ না হই, তবে কে হইবে ? তাই আত্মা—সত্য মা আমার গম্ভীরস্বরে বলিতেছেন—"হে শ্রুত ! হে সৌম্য ! 'তে বদামি শ্রদ্ধিবং শ্রুধি'। তোমায় আত্মস্বরূপ যাহা প্রকটিত করিতেছি, তাহা অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর।" 'আমি'কে অশ্রদ্ধা করিও না। উহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, উহাকে পূজা কর, উহার মহত্ত্ব দর্শন কর।

জীব ! দেখ তোমার আহার বিহার প্রভৃতি জাগতিক কার্য্য, এমন কি অতি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসটী হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কর্ম্মের ভিতর দিয়া চৈতন্যরূপে—বোধরূপে—জ্ঞানরূপে—অনুভূতিরূপে কে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে ! দেখ, কোথা হইতে কর্ম্মগুলি ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার কোথায় লীন হইয়া যাইতেছে। দেখ, সর্ব্বকর্ম্মের নিয়ন্তা কে ? আর কেহ নয়—তোমার সর্ব্বদা অনুভূত তিনি, তোমার অতিপ্রত্যক্ষ তিনি, তাঁহাকে ছাড়িয়া তুমি

মুহূর্ত্তার্দ্ধকালও থাকিতে পার না। তাঁহাকে দূরে মনে কর, তাই দূরে ; নতুবা নিকট হইতে নিকটে তিনি। তিনি তোমার "আমি"— সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য অথচ সত্য। শরণ লও তাঁহার চরণে।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যংযং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি তংব্রহ্মাণং তমৃষিংতং সুমেধাম্ ॥৫॥

অনুবাদ। আমি স্বয়ংই এই সকল তত্ত্বের উপদেশ দিয়া থাকি ; দেবতাগণ এবং মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক ইহাই পরিসেবিত। 'আমি' যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত পদ প্রদান করি, তাহাকে ব্রহ্মা করি, তাহাকে ঋষি করি, তাহাকে আত্মজ্ঞানধারণোপযোগিনী মেধা প্রদান করিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা। বাস্তবিকই 'আমি'র তত্ত্ব আমি ব্যতীত আর কে বলিতে পারে ? কারণ, আমি বেদ্য, আমি বেত্তা, আমিই সকল জানেন, 'আমি'কে জানিবার দ্বিতীয় কেহ নাই, তাই বলিতেছেন— 'অহমেব স্বয়মিদং বদামি'। আর এই তত্ত্ব আত্মস্বরূপাবগতি দেবতা ও মনুষ্যগণের একান্ত প্রার্থিত। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রমুখ দেবতাবৃন্দ অনন্তকাল ধরিয়া তপস্যা করিতেছেন, ইহা তোমরা পুরাণ-প্রসঙ্গে শুনিতে পাও। তাঁহারা অত উচ্চপদ পাইয়াও কোন্ বস্তুর অন্বেষণ করেন, এইবার তাহা বুঝিতে পারিবে সন্দেহ নাই। ঐ 'আমি'— ঐ সত্য যেখানে ব্রহ্মত্ব বিষ্ণুত্ব প্রভৃতি কোন ভাবই নাই। তাঁহারা সেই ভাবাতীত নিত্য-নিরঞ্জন আত্মা—'আমি'রই সন্ধান করিতেছেন। আর মনুষ্যগণ ত করিবেই।

'জুষ্টং' শব্দের অর্থ সেবিতও হইতে পারে। 'ক্ত' প্রত্যয়টী বর্ত্তমান কালেও ব্যবহৃত হয়। দেবতাগণ ও মনুষ্যগণ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে 'আমির'ই সেবা করিতেছে। যাহারা অজ্ঞান তাহারা জীবভাবাপন্ন 'আমি'র সেবা করে, যাহারা জ্ঞানী তাহারা সর্ব্বভাব-বিনির্ম্মুক্ত 'আমি'র সেবা করে। আমি একজন—"একোঽহং"। জীবভাবের মধ্য

দিয়াই হউক, বা দেবভাবের মধ্য দিয়াই হউক, অথবা সর্ব্বভাব-বিরহিতই হউক, এক আমি—সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই বিরাজিত।

যং কাময়ে—আমি যাহাকে (উন্নত করিতে) ইচ্ছা করি, তাহাকে উন্নত করি। 'আমি'রই ইচ্ছায় জীব সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত পদ প্রাপ্ত হয়। উন্নতি দ্বিবিধ—পার্থিব এবং অপার্থিব। পার্থিব—সুখ সমৃদ্ধি যশ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি লাভ করিয়া কেহ মনে করিও না—তোমরা দৃঢ় প্রযত্ন ও কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা উহা লাভ করিয়াছ। ঐ উন্নতির, ঐ অভ্যুদয়ের ঐ পুরুষকারের এক মাত্র হেতু পুরুষরূপী 'আমি'র ইচ্ছা। তারপর অপার্থিব। ইহা তিন প্রকারে প্রকাশ পায়—সুমেধা, ঋষি ও ব্রহ্মা। সচ্চিদানন্দরূপী 'আমি'র ইচ্ছায় জীব যখন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম আস্বাদ পায়, তখন সে সুমেধা হয় অর্থাৎ আত্মজ্ঞান-ধারণোপযোগিনী বুদ্ধি লাভ করে। যতদিন এই ধারণাবতী মেধা লাভ না হয়, ততদিন "শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ" বহুবার এই জ্ঞান এই উপদেশ শ্রবণ করিয়াও সে কিছু বুঝিতে পারে না। তাই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম সূচনায় জীব সুমেধা হয়। তারপর ঋষিত্ব লাভ করে। "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ"। যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্ম-সম্বেদনে, আত্মানুভূতিতে অভ্যস্ত, তাঁহার সেই বেদন বা অনুভূতিগুলি যখন ভাষার আকারে বাহিরে আসে, তখন উহাই মন্ত্র নামে অভিহিত হয়। এই মন্ত্রদ্রষ্টা সাধকই ঋষি। এক কথায় সর্ব্বত্র আত্মদর্শীই যথার্থ ঋষি। ইহাই আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বিতীয় স্তর। তারপর ব্রহ্মা—হিরণ্যগর্ভ, জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কেন্দ্র-স্থান। সেইস্থানে জীব আধ্যাত্মিক উন্নতির তৃতীয় স্তরে উপনীত হয়। যতদিন পরান্তকাল বা ব্রহ্মলীলার অবসান না হয়, ততদিন জীবকে ব্রহ্মলোকেই বাস করিতে হয়। এই যে অপার্থিব ত্রিবিধ উন্নতি—ইহাও একমাত্র আত্মা—'আমি'রই কামনা। 'আমি'রই ইচ্ছায় এই সকল সংঘটিত হয়।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ ॥৬॥

অনুবাদ। আমি ব্রহ্মজ্ঞানবিরোধী বিনাশযোগ্য রুদ্রকে (একাদশ ইন্দ্রিয়কে) হনন করিবার জন্য প্রণবরূপী ধনুতে আত্মরূপ শর যুক্ত করিয়া থাকি এবং এইরূপে আমিই জনসমূহের জন্য যুদ্ধ করি। আমি স্বর্গ মর্ত্ত্য, উভয়লোকে সর্ব্বতোভাবে অনুপ্রবিষ্ট।

ব্যাখ্যা। রুদ্র—দশ ইন্দ্রিয় ও মন (প্রথম মন্ত্র দেখ), ইহারাই ব্রহ্মদ্বিষ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী। এস্থলে 'রুদ্র' শব্দে একবচন ব্যবহার করা হইয়াছে; যেহেতু ইন্দ্রিয়বর্গ মনেরই অন্তর্গত। মনের সত্তায় ইন্দ্রিয়সত্তা, মনের লয়ে ইন্দ্রিয়েরও লয় হয়। মনই একমাত্র শরব্য অর্থাৎ বিনাশ্য। শরপাতযোগ্য স্থানকে শরব্য বলে। যকারলোপ ছান্দস।

সায়নাচার্য্য 'শরবে' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, হিংস্র। সে অর্থও এস্থলে পরিগৃহীত হইতে পারে। মন ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী; সুতরাং মনকে হিংস্র বলা যায়। ধনু শব্দের অর্থ প্রণব—ওঙ্কার অথবা মন্ত্রমাত্র। আতনোমি শব্দের অর্থ—শর যোজনা করি। উপনিষদ্ বলেন—"প্রণবো ধনু শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে"। প্রণব ধনুঃ শর আত্মা (জীবাত্মভাব), ব্রহ্মই লক্ষ্য। প্রণব বা মন্ত্ররূপ ধনুতে জীবাত্মবোধরূপী শর যোজনা করিয়া ব্রহ্ম উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিলে, তাহার ফল হয়—মনের লয়। এই মনই রুদ্র। ইনিই ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী। এই মনই 'আমি'কে—অখণ্ড চৈতন্যকে, খণ্ড-জ্ঞানে জগদাকারে পরিণত করে, তাই মন হিংস্র অর্থাৎ শরব্য; ইহাকে "হন্তবৈ" হনন করিবার জন্য যে ধনুঃশরসংযোজনা অর্থাৎ যোগ ধারণা সমাধি কিংবা পূজা হোম প্রার্থনা প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিতে হয়; সেই উপায় সকলও 'আমি'ই। সাধনারূপেও 'আমি'ই প্রকাশমান।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—রুদ্ররূপে 'আমি' বিরাজিত। এখানে

আবার সেই রুদ্রকে হনন করিবার জন্যও 'আমি'ই উদ্যত। ইহাই 'আমি'র কার্য্য—জীবরূপে, জগৎরূপে, বন্ধনরূপে 'আমি'। আবার এই বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইবার জন্য—অখণ্ড 'আমি' হইবার জন্য যে যোগসাধনাদি উপায়, তাহাও 'আমি'। বন্ধন আমি, বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায় আমি, আবার মুক্তিও আমি।

এখানে বলিয়া রাখি—এই মন্ত্রটী পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি মন্ত্রের পরে উক্ত হওয়ারও একটু রহস্য আছে—যাঁহারা সর্ব্বভাবে আত্মাকে দর্শন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন অর্থাৎ "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি সংপশ্যন্ ব্রহ্ম পরমং যাতি নান্যেন হেতুনা" এই বেদমন্ত্রের সাধনায় যাঁহারা সিদ্ধ, তাঁহারাই রুদ্র বা মনের বিনাশ করিবার জন্য আত্মার ধনুশর-সংযোজনরূপ প্রকাশ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাই প্রথম পাঁচটী মন্ত্রে সর্ব্বভাবে আত্মপ্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে এবং এই মন্ত্রে সেই সর্ব্বভাব-বিলয়পূর্ব্বক একাত্মপ্রত্যয়মাত্রের সাধনরূপেও 'আমি' বা আত্মাই যে উদ্যত, তাহা ব্যক্ত হইল। বুদ্ধিযোগীর পক্ষে এ সকল অবস্থা প্রায় অযত্নলভ্য বলিয়াই মনে হয়।

অহং জনায় সমদং কৃণোমি—'আমি'—বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাই জীবের জন্য যুদ্ধ করিয়া থাকেন। যখন জীবের প্রাণ আত্মরাজ্যস্থাপন করিতে উদ্যত হয়, তখন দেখিতে পায়, মন কর্ত্তৃক সর্ব্বস্ব অপহৃত। প্রাণ চায় ভগবৎচরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া চরিতার্থ হইতে, মন চায় সংসার বাসনায় আবদ্ধ রাখিতে। তখনই জীব-জীবনের শুভ সন্ধিক্ষণ, তখনই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কুরুক্ষেত্রে—কর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপে যে সমর সংঘটিত হয় এবং তৎপর বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে যে দেবাসুর-সংগ্রাম সংঘটিত হয়, (যাহা চণ্ডীতত্ত্বে বর্ণিত) তাহাও 'আমি'ই করিয়া থাকি। সুতরাং কি সাধনাক্ষেত্রে, কি বিষয়ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র সর্ব্বকর্ম্মের একমাত্র নিয়ন্তা 'আমি'—আত্মা।

অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ—'আমি' দ্যুলোক ও ভূলোক প্রকাশ করিয়া সর্ব্বত্র সম্প্রবিষ্ট। দেবলোক বিজ্ঞানময় কোষ। এই স্থানে আত্মবোধ উপসংহৃত হইলে, চৈতন্যময় ব্রহ্মসত্তার দর্শন হইয়া

থাকে। ভূলোক—অন্নময় কোষ বা স্থূলদেহ। অন্যান্য কোষগুলি উক্ত উভয় লোকের অন্তর্গত বলিয়া পৃথক্ উল্লিখিত হয় নাই। আত্মার অন্নময় কোষ—এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড। প্রাণময় কোষ—সৃষ্টিস্থিতি-ক্রিয়াশক্তি। মনোময় কোষ—বহুভাবে ব্যক্ত হইবার সঙ্কল্প। বিজ্ঞানময় কোষ—যে জ্ঞানে এই বহুত্বসঙ্কল্প ধৃত হইয়া আছে। আনন্দময় কোষ—যে স্থলে আত্মার স্বরূপ কেবলানন্দময়। এই স্থানে জগতের বীজ অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। এই সমষ্টি বা বিরাট বিজ্ঞানময় কোষই স্বর্গলোক। জীবভাবীয় ব্যষ্টি বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করিতে পারিলেই এই স্বর্গলোকে অনায়াসে গতিশীল হওয়া যায় এবং অসংখ্য দেবদেবীমূর্ত্তিদর্শন—নানারূপ আত্মবিভূতি লাভ করা যায়। শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব এই বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা—ইহা পরে ব্যক্ত হইবে। প্রত্যেক মানুষই ইচ্ছা করিলে এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিতে পারেন। ইহা শুধু ভাষার ঝঙ্কার নহে; ধ্রুব সত্য।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃসমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানুবিশ্বোতামূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥৭॥

অনুবাদ। আমি জগৎপিতাকে প্রসব করি। ইহার উপরিভাগে আনন্দময় কোষাভ্যন্তরস্থ বিজ্ঞানময় কোষে আমার কারণ-শরীর অবস্থিত। আমি সমগ্র ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিতা। ঐ যে দূরবর্ত্তী স্বর্গলোক তাহাও আমি স্বকীয় শরীরদ্বারা স্পর্শ করিয়া আছি।

ব্যাখ্যা। জগৎপিতা হিরণ্যগর্ভ; যাহা হইতে এই জীবজগৎ জাত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহা পরমাত্মার মনোময় কোষ বা সমষ্টি মন। ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতের আদি—আকাশ বা ব্যোমতত্ত্ব। এই ব্যোমতত্ত্বের উপরে মন আছে। মনের আকাশাদি ভূতসমূহের সঙ্কল্প

থাকে। আমরা যেমন মনে নানারূপ কল্পনা করি, সেইরূপ সমষ্টি বা বিরাট মনের কল্পনা—এই ব্রহ্মাণ্ড। আমাদের মনের কল্পনাগুলি ক্ষণস্থায়ী ও অন্যের অদৃশ্য; কিন্তু মনোময় আত্মার সঙ্কল্প ঘন, দীর্ঘকালস্থায়ী ও সর্ব্ব জীবের ভোগ্য। এই বিরাট্ পুরুষের নাম হিরণ্যগর্ভ—ইনিই জগতের পিতা। ইঁহাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা 'আমি' প্রসব করিয়া থাকি। এক কথায় আমি—জগৎপিতারও জননী।

অস্য মূর্দ্ধন্ মম যোনিঃ—ইহার উপরে আমার কারণদেহ অবস্থিত। অপ্‌সু অন্তঃসমুদ্রে—সমুদ্রের মধ্যস্থিত জলে। সমুদ্র শব্দের অর্থ আনন্দ। শ্রুতিও আছে—এই সমুদয় প্রাণী সমুদ্রবান্ অর্থাৎ আনন্দময়। ধাতুপ্রত্যয়ের অর্থ দ্বারাও সমুদ্র শব্দে আনন্দ পাওয়া যায়—সম্ পূর্ব্বক ক্লেদনার্থক উদ্ ধাতু হইতে সমুদ্র শব্দ নিষ্পন্ন। সম্যক্ প্রকারে ক্লিন্ন অর্থাৎ রসার্দ্র করে বলিয়াই ইহার নাম সমুদ্র। আনন্দই জীবকে রসার্দ্র করে, তাই সমুদ্র আনন্দ। আচার্য্য সায়নদেবও ইহার অর্থ করিয়াছেন—পরমাত্মা। পরমাত্মা ও আনন্দ একই কথা। অপ্ শব্দের অর্থ—ব্যাপনশীলা ধীবৃত্তি; ইহা সায়নভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। ধীবৃত্তির অন্য নাম বিজ্ঞানময় কোষ। পূর্ব্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যায় পরমাত্মার পঞ্চ কোষের বিবরণ প্রকটিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, এই মন্ত্রের অর্থ আমরা বুঝিলাম—আনন্দময় কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিজ্ঞানময় কোষই হিরণ্যগর্ভের উপরে অবস্থিত উহাই "মম যোনিঃ" পরমাত্মার কারণ শরীর। জীবের কারণ-শরীর যদিও আনন্দময় কোষ নামে অভিহিত, তথাপি কেবল আনন্দময় কোষই কারণ নহে, তন্মধ্যস্থ বিজ্ঞানই হইতেছে প্রকৃত কারণ। বিজ্ঞানেই এই জগৎ পরিধৃত, উহা উদাসীন সাক্ষিবৎ দ্রষ্টামাত্র। উহারই ঈক্ষণে বা আলোক-সম্পাতে এই প্রকৃতিরূপী মন অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎপ্রপঞ্চ রচনা করিতেছে। সুতরাং হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ জগৎপিতার উপরেই 'আমার'—আত্মার কারণ-শরীর অবস্থিত।

ততোবিতিষ্ঠে ভুবনানুবিশ্বা—অতএব সমস্ত ভুবনে 'আমি'ই

অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছি। "উত অমূং দ্যাং বর্ষ্মণা-উপস্পৃশামি" ঐ যে সাধারণ জীবের পক্ষে দূরবর্ত্তী স্বর্গলোক—যাহা বিজ্ঞানময় কোষ নামে পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে, সেই স্থানেও 'আমি' স্বকীয় শরীর দ্বারা স্পর্শ করিয়া আছি। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই 'আমার'—সচ্চিদানন্দের শরীর; তবে দ্যুলোকে আরোহণ করিতে পারিলেই বিশেষভাবে 'আমার' স্পর্শ অনুভব করিতে পারা যায়; ইহাই এই বাক্যের বিশেষ তাৎপর্য্য।

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সম্বভূব ॥৮॥

অনুবাদ। আমি যখন বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হই, তখনই এই সমগ্র ভুবনের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই স্বর্গ মর্ত্ত্যের পরেও আমি বর্ত্তমান। ইহাই আমার মহিমা।

ব্যাখ্যা। বায়ুর ন্যায় প্রবাহশীল কথাটী ক্রিয়াশক্তির প্রকাশক। ভূতজাতের মধ্যে আকাশ নিষ্ক্রিয় উদাসীন ও সর্ব্বাধার। কিন্তু বায়ু প্রবাহরূপ ক্রিয়াশক্তিময়। গীতায় উক্ত হইয়াছে—'যথাকাশ-স্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্। তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয়।' যেরূপ সর্ব্বত্রগামী ও মহান্ বায়ু আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ সর্ব্বভূত আত্মায় অবস্থিত। জীব যখন এই আত্মবস্তু-সাক্ষাৎকার করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে, তখন ইহাকে ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্টই দর্শন করে। যতক্ষণ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা আত্মসমীপস্থ হইতে হয়, ততক্ষণ যথার্থই ইনি বায়ুর ন্যায় প্রবাহশীলই বটে। তাই বেদান্তসূত্রে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বলিয়া ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়াছেন। যাঁহা হইতে এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন, যাঁহাতে অবস্থিত এবং যাঁহাতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই আমি। 'আমি'কে যাঁহারা জানিতে চাহিবেন, ঐ একটী কথাই

তাহার উত্তর—"জন্মাদ্যস্য যতঃ।" ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় সরল উত্তর নাই। এই যে জগৎ-প্রসূতি পালয়িত্রী এবং সংহন্ত্রী, শক্তিরূপা জননী, ইনিই 'আমি'। তাই মন্ত্রেও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন—'আরভমাণা'। ইনিই সর্ব্বজীবের সাধ্য এবং উপাস্য। এই বিশ্বভুবন যতদিন আছে, ততদিন ইনি 'বাত ইব প্রবামি' অর্থাৎ ক্রিয়া-শক্তিরূপা—ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। নির্গুণভাবেই হউক আর পুরুষভাবেই হউক, উপাসনা ব্যাপার যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ আত্মা ক্রিয়াশক্তি বা মহামায়া রূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত আমার আর একটি অবস্থা আছে—তাহাও উপসংহারে বলিতেছেন—'পরো দিবা পর এনা পৃথিবী এতাবতী মহিমা।' এই যে দ্যুলোক ভূলোকব্যাপী এবং দ্যুলোকরূপী 'আমি'র স্বরূপ প্রকটিত করা হইল, ইহার উপরেও 'আমি' আছেন ; উহা বাক্য এবং মনের অগোচর ; উহাই জীবের গম্য এবং লক্ষ্য। জগদতীত নিরঞ্জন-স্বরূপে তাঁহার কোন মহিমার বিকাশ নাই। 'আমি'র মহিমা—এই জগৎ এই দ্যু-ভূ-ব্যাপী বিরাট্ দেহ। বেদান্তসূত্রেও ইহা উক্ত আছে। কিরূপে নিত্য নিরঞ্জনস্বরূপটী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, 'আমি'—মা আমার স্বয়ং পরিচ্ছিন্ন জীব-জগৎ-আকারে বিরাজিত হয়েন, ইহাই বিস্ময়কর এবং ইহাই যথার্থ 'আমি'র মাহাত্ম্য।

এই মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিলেও জীবন সার্থক হইবে। তাই চল সাধক, চল জীব, আমরা এতক্ষণ যে 'আমি'কে দেখিতেছিলাম, এইবার দেখি, তাঁহার মাতৃ-স্বরূপের অসীম উদার স্নেহবিকাশ, অনির্ব্বচনীয় সন্তানবৎসলতা ও অভূতপূর্ব্ব অলৌকিক মাহাত্ম্য আমাদের মত অকৃতজ্ঞ সন্তানের প্রতি কিরূপ ভাবে প্রকাশিত হয়।

অর্গলা—মাতৃমুখী গতি

অর্গল শব্দের অর্থ খিল। যেরূপ গৃহদ্বার অর্গলাবদ্ধ থাকিলে সহসা কেহ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না; সেইরূপ দেবীমাহাত্ম্য-পাঠের পূর্ব্বে অর্গলা স্তোত্র পাঠ করিয়া লইলে, বাহ্য বিষয়সমূহ চিত্তক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না। বহির্মুখ বা একান্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ দুরূহ; তাই পরম- কারুণিক পূর্ব্বাচার্য্যগণ চণ্ডী পাঠের পূর্ব্বে, চিত্তের বৃত্তিগুলিকে কথঞ্চিৎ মাতৃমুখী করিবার জন্য, এই অর্গলা, কীলক, ও দেবীকবচপাঠের বিধান করিয়াছেন। মন্ত্রচৈতন্য না হওয়া পর্য্যন্ত স্তোত্রাদি পাঠের ফল অতি সামান্য মাত্র। দেবী-মাহাত্ম্যে ব্রহ্মস্তোত্রে মন্ত্র-চৈতন্য ব্যাখ্যাত হইবে।

এই স্তোত্রে প্রথমেই—'জয় ত্বং দেবী' ইত্যাদি বাক্যে জয়শব্দ-উচ্চারণপূর্ব্বক চিত্তবৃত্তিকে মাতৃমুখে প্রবাহিত করিবার প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। উক্ত স্তুতির প্রত্যেক পদের ব্যাখ্যা করা হইল না; কারণ চণ্ডী-ব্যাখ্যাবসরে উহার প্রায় সকল পদেরই ব্যাখ্যা করা হইবে। বিশেষতঃ ঐ সকল পদের ব্যাখ্যা বিশেষ কঠিন নহে, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই উহা বুঝিতে পারিবেন। 'মধুকৈটভ-বিধ্বংসি', মহিষাসুর নির্নাশি, ইত্যাদি শব্দের অর্থ যথাস্থানে প্রকটিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই স্তোত্রের প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রেরই শেষার্দ্ধ—'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশোদেহি, দ্বিষোজহি'। এই অংশের ব্যাখ্যা নিতান্ত প্রয়োজন। যিনি যেরূপ অধিকারী তিনি সেরূপ অর্থ গ্রহণ করিবেন।

রূপং দেহি—(১) মা আমায় সুন্দর আকৃতি দাও, স্বাস্থ্যবান কর।

(২) মা তোমার রূপটি আমায় দেখিতে দাও।

(৩) মা জগৎময় যে তোমারই রূপ, তাহা বুঝিতে দাও।

(৪) মা আমার যে রূপের অভাববোধ আছে, তাহা দূর কর। এস্থলে দেহি শব্দের অর্থ 'অভাবং পূরয়' অভাব পূর্ণ করার জন্যই 'দেহি' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

(৫) মা! একমাত্র নিরুপণীয় বস্তু পরমাত্মা ; আমাকে তাহার স্বরূপ বুঝিতে দাও। "রূপ্যতে নিরূপ্যতে ইতি রূপং তচ্চ পরমাত্মবস্তু"। ইহাই রূপশব্দের অর্থ।

জয়ং দেহি—(১) মা আমায় জয় দাও।

(২) মা আমি যেন সাধনসমরে জয়লাভ করিতে পারি।

(৩) মা আমায় চিত্ত ও ইন্দ্রিয়জয়ে অধিকারী কর।

(৪) মা জয়স্বরূপা তুমি আমার হও অর্থাৎ জয়রূপিণী তোমাতে আমার মতি হউক।

(৫) মা আমায় সত্য-প্রতিষ্ঠ কর। এস্থলে জয় শব্দের অর্থ সত্য। উপনিষদ্ বলেন—'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' একমাত্র সত্যই জয়যুক্ত, মিথ্যার জয় হয় না। সত্যই জয়। একমাত্র 'সত্যই' যে সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে বিরাজিত—এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই যথার্থ জয়লাভ।

যশো দেহি—(১) মা আমাকে কীর্ত্তিমান্ কর।

(২) "মা আমি যে তোমার পুত্র" এই যশ আমাকে দাও।

(৩) মা আমাকে সাধন-সমরে জয়লাভের যশ দাও।

(৪) মা যশের ন্যায় নির্ম্মল শুভ্র সত্ত্বগুণ উদ্‌বোধিত কর।

(৫) মা আমায় নিত্য—চিরস্থায়ী যশ (পরমাত্ম-বস্তু) দাও, অর্থাৎ আমায় অমর কর—মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে নিয়ে চল। শাস্ত্রেও আছে—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" যাঁহার যশ আছে, তিনি চিরজীবী—অমর। চিরজীবন লাভ করা, অমর হওয়া ও মুক্তিলাভ করা একই কথা। যাঁহারা জাগতিক কোন প্রসিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া স্মরণীয় হয়েন, তাঁহারা বাস্তবিকই অমর নহেন, দীর্ঘকাল স্মরণযোগ্যমাত্র। কিন্তু যাঁহারা অমৃতস্বরূপ আত্মবস্তু লাভ করিতে পারেন, তাঁহাদের আর মৃত্যুই হয় না। 'ইহৈব লীয়তে' ইতি শ্রুতিঃ।

দ্বিষোজহি—(১) মা আমার শত্রুদিগকে হনন কর।

(২) মা আমার কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে নাশ কর।

(৩) মা আমার সাধনার বিরোধী ভাবসমূহ দূরীভূত কর।

(৪) মা আমার ত্রিবিধ কর্ম্মফল ধ্বংস কর ; কারণ, উহারাই আমার যথার্থ শত্রু, ব্রাহ্মীস্থিতির দুর্জ্জয় অন্তরায়। উহারা আমাকে মায়ের কোল হইতে টানিয়া নামায়।

(৫) মা সর্ব্বই আমার শত্রু—মুক্তিমার্গের পরিপন্থী ; অতএব সর্ব্বজ্ঞান—সর্ব্বধর্ম্ম রূপ মহাশত্রু বিনাশ কর।

প্রয়োজন বোধে আরও দুই একটি স্থানের অর্থ করা যাইতেছে—

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যম্—(১) মা আমায় সৌভাগ্যবান্ কর এবং আরোগ্য দান কর।

(২) মা তোমাকে লাভ করিবার সৌভাগ্য আমাকে দাও।

(৩) মা সংসার-সমুদ্র পার হওয়াই যথার্থ সৌভাগ্য, সেই সৌভাগ্য আমাকে দাও। আমার এই ভবরোগ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু দূর করিয়া চির আরোগ্য প্রদান কর।

বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ—(১) মা আমায় শারীরিক বল দাও।

(২) মা আমায় চিত্তের বল দাও।

(৩) মা আমায় পরমাত্মবস্তুলাভের উপযুক্ত বল প্রদান কর। শ্রুতি আছে—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" বলহীন ব্যক্তি আত্মলাভ করিতে পারে না ; সুতরাং আমায় এমন বল দাও, যেন মা তোমায় লাভ করিতে পারি।

ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্—(১) মা আমার মনোবৃত্তির অনুসরণ করিতে পারেন, এমন মনোরমা পত্নী দাও।

(২) মা আমার পত্নীকে আমার মনোরমা ও অভিপ্রায়ানুসারিণী সহধর্ম্মিণী কর।

(৩) মা আমায় আত্মাভিমুখী ইচ্ছাশক্তি দাও, সেই শক্তি যেন আমার মনেরও প্রিয়তমা হয় এবং আমার চিত্তের বৃত্তিসমূহ যেন সেই শুভ ইচ্ছাশক্তিরই অনুসরণ করে। আর যেন জগৎমুখী মনোবৃত্তি না থাকে।

(৪) মা আমায় দৈবী প্রকৃতি দাও, সেই প্রকৃতি যেন আমার মনোরমা হয় এবং চিত্তের বৃত্তিগুলিও যেন তাহারই অনুসরণ করে।

কিছু না কিছু সদিচ্ছা, একটু না একটু দৈবী প্রকৃতি মানুষমাত্রেরই আছে; কিন্তু উহা মনের পক্ষে প্রীতিজনক হয় না বলিয়াই ত লোক জগদ্‌ভোগে মুগ্ধ থাকে; এই ভাবটি যাহাতে দূরীভূত হয় অর্থাৎ আত্মাভিমুখী ইচ্ছাশক্তি—দৈবীপ্রকৃতিরূপিণী ভার্য্যা যাহাতে মনোরমা হয়,—মনের পক্ষে প্রীতিজনিকা হয়, তাহাই প্রার্থনা করা হইতেছে।

এইরূপ যে ব্যক্তি যে বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন, যে সাধক যেরূপ অভাব বোধ করেন, তাহা সরলপ্রাণ শিশুর ন্যায় মায়ের নিকট প্রার্থনা করিবেন। যে ব্যক্তি যেরূপ অধিকারী, তিনি সেইরূপ অর্থ গ্রহণ করিবেন। মায়ের নিকট চাহিতে কোন নিষেধ নাই। যাঁহারা আদর্শ পুরুষ—আমাদের দেশের পূর্ব্বতন ঋষিমণ্ডলী, তাঁহারাও যখন যাহা আবশ্যক হইত অম্লান বদনে প্রার্থনা করিতেন; ইহা তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইত না। আর চাহিবার জন দ্বিতীয় কে আছে? যিনি আমাদের প্রাণের প্রত্যেক ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাটী পূর্ণ করিবার জন্য নিত্য কল্পতরুরূপে বিরাজমান, তিনি আর কেহ নন, আমার মা—আত্মা বা আমি। চাহিতে হয়—উহার নিকট চাহ, বিমুখ হইবে না; সরল বিশ্বাসে চাহিও। তিনি ইচ্ছামাত্রেই সব দিতে পারেন, এই বিশ্বাসে বুক ভরিয়া রাখিও। শুধু চাহিতে পারিনা বলিয়াই পাই না, ইহা বুঝিও। একজন মানুষের নিকট যতটা বিশ্বাস নিয়া চাহিতে পার, অন্ততঃ ততটা বিশ্বাস রাখিও—নিশ্চয়ই পাইবে। তা কে জানে ছোট জিনিষ, কে জানে বড় জিনিষ। ধন রত্নই হউক, আর আত্মজ্ঞানই হউক, যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। শুধু চাহিতে অভ্যাস কর।

যে স্থানে দেখিবে তুমি চাহিয়াও প্রার্থিত বস্তু পাইতেছ না, সেখানে বুঝিবে তোমার বিশ্বাস হয় নাই। যথার্থ "মা কল্পতরু, এই সত্যই মা রহিয়াছেন, আমি তাঁহার নিকট চাহিতেছি" এই বোধ স্থির হইলে নিশ্চয়ই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। মা কোথায়? সে অনুসন্ধান তোমাকে করিতে হইবে না। তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বরূপে পূর্ণভাবে বিরাজিতা। তুমি যেখানে বলিবে সেইখানেই তিনি শুনিবেন। মনে রাখিও—তোমার

প্রত্যেক কথাটি শুনিবার জন্য তিনি উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। তবে এই কথা যে, তিনি ইচ্ছা করিলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য দিতে পারেন, তাঁহার নিকট ক্ষুদ্র জিনিষ প্রার্থনা করা বালকোচিত কার্য্যমাত্র; নতুবা চাহিতে কোন দোষ নাই। চাহিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন না।

সে যাহা হউক, চণ্ডীপাঠের প্রথমেই—এত কামনা পূর্ণ করিবার কথার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে। জীব স্বভাবতঃ বিষয়বিমুগ্ধ, দেহাত্মবোধ-বিশিষ্ট, বাসনার আগুনে নিয়ত বিদগ্ধ; সুতরাং যদি প্রথমেই বাসনা পূর্ণ হইবার সহজ উপায় দেখিতে পায়, তবে নিশ্চয়ই তাহাতে আকৃষ্ট হইবে। ফলের লোভে আকৃষ্ট হইয়াও যদি জীব মাতৃ-মুখী হয়, তাহাও পরম সৌভাগ্য। আর যাহারা আত্মাভিমুখী গতি উপলব্ধি করিয়াছে, যাহারা মায়ের দিকে মুখ ফিরাইয়াছে, মাতৃ-লাভের জন্য আকুল পিপাসা যাহাদের প্রাণে জাগিয়াছে তাহাদের পক্ষে যে সকল শক্তি লাভ একান্ত প্রয়োজন, যে বল লাভ করিতে না পারিলে, অতি গহন চণ্ডীতত্ত্বে বা মুক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে পারা যায় না, সেই বল লাভের জন্যই অর্গলাস্তোত্র। অথচ এই ব্যপদেশে স্তোত্রটী মন্ত্রচৈতন্য করিয়া পাঠ করিলে, বহির্মুখী চিত্তবৃত্তি কিছুক্ষণের জন্য অন্তর্মুখী হইয়া থাকে এবং সেই অবসরে শনৈঃ শনৈঃ সাধন-সমরে অগ্রসর হইবার সুবিধা হয়।

কীলক—অধিকার-নির্ণয়

কীলক শব্দের অর্থ এ স্থানে—অভীষ্ট-সিদ্ধির প্রতিবন্ধক। যাহাকে সাধারণ কথায় শাপ বলে। গায়ত্রী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মন্ত্রেই কোনও ঋষি কিংবা দেবতার শাপ আছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই শাপ-উদ্ধারেরও বিধান আছে। এই কীলকস্তুতিও শাপোদ্ধার-বিশেষ। সপ্তশতী-মন্ত্রাত্মক দেবীমাহাত্ম্যের উপরও মহাদেব-কৃত কীলক আছে। সেই কীলক দূর করিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠ না করিলে, উহা অভীষ্ট ফলপ্রদানে অসমর্থ। এই শাপ বা কীলকের প্রকৃত রহস্য—অধিকার নির্ণয়। কিরূপ ক্ষেত্রে আরোহণ করিয়া, কিরূপ মানসিক উন্নতি লইয়া, কিরূপ সাধন-বল লাভ করিয়া চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহাই কীলকস্তোত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অন্যান্য মন্ত্রেরও শাপোদ্ধার ব্যাপারটার প্রকৃত তাৎপর্য্য ইহাই। সে যাহা হউক, এই স্তোত্রেই আছে—

> কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দ্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ,
> দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি।
> ইত্থং রূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতম্।
> যো নিষ্কীলাং বিধায়ৈনাং চণ্ডীং জপতি নিত্যশঃ।
> স সিদ্ধঃ ... . ॥

ইহার বঙ্গানুবাদ। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী কিংবা অষ্টমী তিথিতে দান এবং প্রতিগ্রহ করিতে হয়, অন্যথা এই চণ্ডী প্রসন্না হয়েন না। এইরূপ কীলক দ্বারা মহাদেব এই চণ্ডীকে কীলিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি নিষ্কীল করিয়া (অর্থাৎ ঐরূপ দান প্রতিগ্রহ করিয়া) নিত্য এই চণ্ডী জপ (পাঠ) করেন, তিনি সিদ্ধ হইয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা। দান ও প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে মূলে কিছুই উল্লেখ নাই। কে দিবে, কি দিবে, কাহাকে দিবে এবং কাহার নিকট হইতে কি

প্রতিগ্রহ করিবে, কিছুই মন্ত্রে বলা হয় নাই; সুতরাং বিভিন্ন ভক্ত উহার বিভিন্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু সে সকল অর্থ অনেকেরই সংশয়-নিরাশক নহে। যাহা হউক, আমরা ঐস্থানের যে অর্থ বুঝিয়াছি, জ্ঞানরূপিণী মা আমাদের হৃদয়ে উহার যেরূপ অর্থ বিকাশ করিয়াছেন, এস পিপাসিত সাধক! আমরা একবার সেই অর্থটীর আলোচনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি।

কৃষ্ণায়াং চতুর্দ্দশ্যাং অষ্টম্যাং—এইটী সাধকের বিশেষণ। এই স্থানে সপ্তমী বিভক্তিটী বিশেষণে প্রযুক্ত হইয়াছে; অধিকরণে নহে। উহার প্রমাণ রঘুনন্দন-কৃত তিথিতত্ত্বে বিশদ্‌ভাবে বিবৃত হইয়াছে। বৈধকার্য্যে সঙ্কল্পবাক্যে যে মাস পক্ষ তিথি প্রভৃতির উল্লেখ আছে, উহা পুরুষ-বিশেষণ অর্থাৎ ঐ মাস ঐ পক্ষ ঐ তিথিবিশিষ্ট পুরুষ, এইরূপ অর্থ বুঝাইয়া থাকে; সুতরাং এস্থলেও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী এবং অষ্টমী তিথি-বিশিষ্ট পুরুষ বা সাধকই ঐ মন্ত্রের অর্থ। সাধক কিরূপ অবস্থায় আসিলে উক্ত বিশেষণযুক্ত হইতে পারে?

চন্দ্রকলাক্ষয় পক্ষের নাম কৃষ্ণপক্ষ; চন্দ্র—মনের অধিপতিদেবতা। চতুর্দ্দশী—এককলামাত্র-অবশিষ্ট চন্দ্র বা মন। অষ্টমী—অর্দ্ধক্ষীণ চন্দ্র বা মন। যাঁহারা মনের অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ মাতৃ-চরণে উপহার দিতে পারিয়াছেন, আত্মাকে বা আমিকে লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া, অন্ততঃ অর্দ্ধেক মন হারাইয়া ফেলেন, তাঁহারাই কৃষ্ণাষ্টমী-তিথিবিশিষ্ট সাধক। আর যাঁহাদের প্রায় সমগ্র মনটী মাতৃময় হইয়াছে, একটি কলা অবশিষ্ট আছে—শুধু মাকে ভোগ করিবার জন্য, উপাস্য উপাসক উভয়ই এক, অথচ পরমানন্দরস-আস্বাদন জন্য, একটু ভেদবোধ রাখিবার জন্য, মা কোন কোন সাধকের এককলামাত্র মন অবশিষ্ট রাখিয়া দেন;—এই শ্রেণীর সাধকই কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথিবিশিষ্ট। এই উভয় অবস্থার অন্তরালটি (অর্থাৎ অষ্টমী হইতে চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত) সুতরাং পরিগৃহীত।

সমাহিতঃ—একাগ্রচিত্ত—সমাধিস্থ। কৃষ্ণাষ্টমী বা মনের অর্দ্ধলয়াবস্থা হইতে মৃদু মৃদুভাবে সমাধি আরম্ভ হয় এবং এককলা

অবশিষ্ট থাকা পর্য্যন্ত, মাতৃ-ভোগ বা আত্মসাক্ষাৎকারজনিত আনন্দসম্ভোগ হইয়া থাকে। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীই সমাধির দৃঢ়াবস্থা। মনের সম্যক্ লয়ে—অমাবস্যায় অর্থাৎ সমাধির পরিণত অবস্থায় আর কিছুই থাকে না—জ্ঞাতাজ্ঞেয়-বোধের পর্য্যন্ত লয় হয়, যাহা থাকে, তাহা অব্যক্ত অচিন্ত্য অথচ উহাই গম্য। সেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসে না। উহাই 'আমি'র পরম ধাম। "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" (গীতা)। সে অবস্থায় চণ্ডী বা সাধন-সমরের সম্পূর্ণ অবসান হয়; তাই এস্থলে কৃষ্ণাষ্টমী হইতে মাত্র চতুর্দ্দশী পর্য্যন্তের উল্লেখ আছে এবং উহাই সমাহিত অবস্থা।

দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি—অর্পণ ও গ্রহণ; পূর্ব্বোক্তরূপ সমাহিত অবস্থা আসিলে একটি ব্যাপার স্বতঃই সংঘটিত হইতে থাকে; উহাই দদাতি ও প্রতিগৃহ্ণাতি। যাঁহাদের মনের অর্দ্ধাংশ মাতৃ-মুখী হইয়াছে, তাঁহারা মাতৃ-মহিমা, মাতৃ-স্নেহ কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। মাতৃ-স্নেহ যিনি একবার উপলব্ধি করেন, তিনি আর অকৃতজ্ঞ থাকিতে পারেন না, কৃতঘ্নতা তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। কিছু না কিছু মাতৃ-চরণে অর্পণ করিবার বাসনা ফুটিবেই; পত্র পুষ্প ফল জলই হউক কিংবা ভাব ভক্তি শ্রদ্ধা প্রণামই হউক, একটা কিছু অর্পণরূপ কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ ফুটিবেই; এই যে অর্পণ, ইহাই দদাতি; তারপর এইরূপ অর্পণ হইলে, উহার প্রতিগ্রহও অবশ্যম্ভাবী। তুমি মাকে যাহা অর্পণ করিবে, তাহা বহুগুণে গুণিত হইয়া আবার তোমাতেই প্রত্যর্পিত হইবে; ইহা সাধনাজগতের একটি অপূর্ব্ব রহস্য! মাতৃ-স্নেহের ইহাই চরম নিদর্শন! কেন ইহা হয় শুনিবে? তবে শুন! মা যে আত্মা। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বে মালা পরাইতে গেলে, কার্য্যতঃ তাহা আপনার কণ্ঠেই অর্পিত হইয়া থাকে। এই সমাহিত অবস্থায়—ভগবৎ উদ্দেশে অর্পিত বস্তু বা ভাবসমূহ সাধকের মনে একটী অভূতপূর্ব্ব তৃপ্তি আনয়ন করে। সে মাকে স্নান করায়, কিন্তু স্নাত হয় আপনি। পূজা করে মাকে, পূজিত হয় আপনি। মাতৃ-উদ্দেশে অন্নসম্ভার উৎসর্গ করে, ক্ষুধা দূর হয় আপনার। মাতৃ-

তৃপ্তির জন্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে; কিন্তু অনুভব করে—নিজেরই সহস্রার হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত কি যেন একটা সুখময় স্পর্শ অনুভূত হইতেছে, এমনই একটা অবস্থা সাধকমাত্রেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ইহারই নাম দদাতি ও প্রতিগৃহ্নাতি। যতদিন সাধনার মধ্যে এইরূপ আত্ম-সম্বেদন না আসে, ততদিনই সাধনা একটা নীরস কষ্টসাধ্য অনুষ্ঠানমাত্র বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু সে অন্যকথা।

নান্যথৈষা প্রসীদতি—অন্যথা চণ্ডী প্রসন্না হয়েন না। যাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত রূপ অবস্থা আসিয়াছে, তাঁহারাই চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশের উপযুক্ত অধিকারী। ইহা না হইলে চণ্ডীর প্রসন্নতা-উপলব্ধি সম্যক্-রূপে হয় না, ইহাই মহাদেবের কীলক অর্থাৎ জ্ঞানময় গুরুর আদেশ। এই কীলকই শ্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ। যে ব্যক্তি নিষ্কীল করিয়া এই চণ্ডীপাঠ করে, সে-ই সিদ্ধ হয়। নিষ্কীল করা—সিদ্ধির প্রতিবন্ধক দূরীভূত করা। একটু সমাহিত-চিত্ত না হইলে আত্মবোধ প্রস্ফুটিত হয় না, আত্মবোধ মহিমান্বিত না হইলে অর্পণ ও গ্রহণ হয় না; সুতরাং সে অবস্থায় চণ্ডী-তত্ত্বে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কি দুরাশা নহে? সাধনসমরে জয়লাভ করিতে যেরূপ বল সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাই ক্রমে ক্রমে অর্গলা কীলক ও দেবীকবচে পরিবর্ণিত হইয়াছে।

এই কীলকস্তুতির আর একটী প্রয়োজন—ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান। 'এই কার্য্য দ্বারা আমার এই ইষ্টফল সংসিদ্ধ হইবে' এইরূপ জ্ঞানই কর্ম্মপ্রবৃত্তির মূল। উক্ত ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানাংশে ভ্রম বা অজ্ঞানতা থাকিলে কর্ম্মসিদ্ধি সুদূরপরাহত হয়। তাই চণ্ডী-তত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারিলে কি লাভ হইবে, তাহাও এই স্তোত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সৌভাগ্য, আরোগ্য বশীকারাদি ষড়্‌বিধ শক্তি প্রভৃতি আপাত-প্রীতিকর পার্থিব ফল যাঁহারা কামনা করেন, তাঁহাদের সে সকল ত' হইবেই, প্রধান ফল-লাভ হইবে—মোক্ষ। স্তোত্রের শেষভাগে তাহা উক্ত হইয়াছে—"শত্রুহানিঃ পরোমোক্ষঃ স্তূয়তে ন স কিং জনৈঃ"। এক কথায় চণ্ডী ভোগ এবং অপবর্গ উভয়েরই সাধন; সুতরাং যাহারা

ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষরূপ মহাফলের অভিলাষী, তাহারাই চণ্ডীপাঠের অধিকারী কীলক-স্তুতিতে ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনও মোক্ষশাস্ত্র বটে, কিন্তু ঐহিক ও পারত্রিক ফলে সম্যক্ বিরক্ত এবং একমাত্র মোক্ষাভিলাষী সাধকই ঐ সকল শাস্ত্রশ্রবণের অধিকারী। দেবীমাহাত্ম্য কিন্তু উভয় ফলেরই সাধন; ইহা কীলক-স্তোত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা ইহাকে মাত্র স্তুতিবাদ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। কীলকস্তোত্রে যাহা বলা হইয়াছে, সেইরূপ নিষ্কীল করিয়া—সমাহিত হইয়া, চণ্ডী-তত্ত্বে প্রবেশ করিলে, নিশ্চয়ই ভোগ এবং অপবর্গ, এতদুভয় ফললাভ হইয়া থাকে।

কিন্তু মা! আমাদের কি উপায়! আমরা যে কোন অধিকারই লাভ করি নাই! যে সকল অধিকার লাভ করিলে, মা তোমার বড় সাধের সাধনসমরে প্রবেশ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিব, আমাদের যে তাহার কিছুই নাই! বন্ধন-জ্ঞানই হয় নাই, মুমুক্ষু কিরূপে হইব? মনের ষোল কলাই ত' জগৎ-মুখী, আমরা ত' অষ্টমী চতুর্দ্দশী তিথি-বিশিষ্ট সাধক বা অধিকারী হইতে পারি নাই! তবে, কি সাহসে তোর অতি গহন চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিব মা! কেন—সাহস আছে বই কি? তুই যে মা! আমরা যে তোর সন্তান! ইহা অপেক্ষা আর কি বল—কি সাহস থাকিতে পারে! আমরা জানি—মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে—চণ্ডীতত্ত্বে বারংবার প্রবেশের উদ্যম করিতে করিতেই উপযুক্ত অধিকারী হইব এবং তারপর যথার্থ সাধনসমরে জয়লাভ করিব—সিদ্ধ হইব! ইহাই আমাদিগের অমোঘ আশা।

দেবীকবচ—মাতৃ-অনুভূতি

কবচ—অঙ্গত্রাণ। যাহা পরিধান করিয়া শত্রুনিক্ষিপ্ত অস্ত্রাদি হইতে আত্মরক্ষা করা যায়, তাহাকে কবচ কহে। সাধন-সমরে প্রবেশ করিতে হইলে, এই কবচ দ্বারা আবৃত হইয়া অগ্রসর হইতে হয়; নতুবা জয়লাভের আশা দুরাশামাত্র। তাই, উক্ত হইয়াছে—'জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং কৃত্বা তু কবচং পুরা। নির্ব্বিঘ্নেন ভবেৎ সিদ্ধিশ্চণ্ডীজপসমুদ্ভবা॥' সপ্তশতী চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে এই কবচ পাঠ করিতে হয়; যাঁহারা এই কবচ দ্বারা আবৃত হইতে পারেন, তাঁহারাই নির্ব্বিঘ্নে চণ্ডী-জপ-জন্য সফলতা বা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন।

এই কবচে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির উল্লেখ আছে এবং সেই সকল স্থান রক্ষা করিবার জন্য মায়ের বিভিন্ন নাম স্মরণপূর্ব্বক প্রার্থনার বিধান আছে। যথা—'প্রাচ্যাং রক্ষতু মামৈন্দ্রী' ইন্দ্রশক্তিরূপিণী মা আমায় পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন; কিংবা—'শিখাং মে দ্যোতিনী রক্ষেৎ' প্রকাশ-শক্তিস্বরূপা মা আমার শিখাস্থান রক্ষা করুন; এইরূপ সর্ব্বত্র। ইহাতে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সেই সকল স্থানে লইয়া যাইতে হইবে; যথাস্থানে মন পরিচালিত হইয়া কিছুকালের জন্য একতানতা প্রাপ্ত হইলেই, সেই সকল স্থানে বিশিষ্ট বোধশক্তি প্রকাশ পাইবে; কল্পনায় নহে—প্রত্যক্ষ অনুভূতি ফুটিবে। সেই অনুভূতি লক্ষ্য করিয়া মায়ের বিভিন্ন নাম স্মরণ ও প্রার্থনা করিতে হইবে। কবচে যে স্থানে নাম উচ্চারণের বিধান আছে, সেই নামে মায়ের যে ধর্ম্ম বা শক্তির প্রকাশ প্রতীতিগোচর হয়, সেই ধর্ম্ম বা শক্তিটী উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ঐ সকল নামে বিশিষ্ট কোন মূর্ত্তির ধ্যান করিবার আবশ্যক নাই; মাত্র সেই ধর্ম্মটী বোধে আসিলেই যথেষ্ট। যেমন 'খড়্গাধারিণী'—এস্থলে খড়্গাধারণকারিণী মূর্ত্তির চিন্তা না করিয়া, দৃঢ় হস্তে খড়্গাদি অস্ত্র

ধারণ করিবার যে শক্তি, সেই শক্তি-অংশমাত্র বোধ করিতে হইবে। এইরূপ সর্ব্বত্র।

যাঁহারা জগৎময় সত্যপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত কিংবা গুরুদত্ত বিশিষ্ট প্রক্রিয়াদ্বারা মনকে কেন্দ্রীভূত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে এই বোধশক্তির পরিচালনা অনায়াস-সাধ্য। তাহা না হইলেও, যে কোন ব্যক্তি সাধারণ যত্নের ফলে, এই কবচে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। •স্বকীয় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বোধশক্তি লইয়া যাওয়া এবং সেই বোধশক্তিকে মাতৃ-শক্তিরূপে অনুভূতি করা, ইহা করিতে পারিলেই কবচপাঠের যথার্থ সার্থকতা লাভ করা যায়। কেহ মনে করিও না, এই কবচের শেষভাগে যে ফলশ্রুতি আছে, উহা স্তুতিবাক্য-মাত্র। উহার বর্ণে বর্ণে সত্যনিহিত রহিয়াছে। অন্য ফলগুলির লাভ হইবে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার সময় ও সুযোগ না হইলেও, 'নশ্যন্তি ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে' শারীরিক ব্যাধি-নাশ যে নিশ্চয়ই হইয়া থাকে, ইহা অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ নহে, সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বল ও আধ্যাত্মিক গতির উৎকর্ষতা-লাভও অবশ্যম্ভাবী। আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি—রামকবচ, সূর্য্যকবচ, শ্রীকৃষ্ণকবচ, কালীকবচ ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর কবচসমূহের মধ্যে, যে কোনও কবচ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পাঠ করিলেও ঐ ফললাভ হইয়া থাকে; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে দেবী কবচে যত বেশী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উল্লেখ আছে, অন্য কবচগুলিতে তাহা নাই। সে যাহা হউক, যাহারা চণ্ডী পাঠের প্রকৃত ফল—ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষফলের অভিলাষী, তাহাদের পক্ষে কবচপাঠ নিতান্ত আবশ্যক; কারণ, ইহাদ্বারা নির্ব্বিঘ্নে সাধন-সমরে জয়লাভ করা যায়। তবে যথানিয়মে পাঠ করিতে হইবে অন্যথা আশানুরূপ ফললাভের পথ দূরতর হইয়া পড়ে।

দেবীসূক্ত, অর্গলা, কীলক এবং দেবীকবচ, এইগুলি সাধন-সমরে বা চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব আয়োজন। এই উদ্যোগ-পর্ব্ব যাহার যত সুন্দর, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও দৃঢ় অধ্যবসায়ে অনুষ্ঠিত, তাহার

সিদ্ধিলাভ বা আধ্যাত্মিক গতিও তত সুন্দর, শৃঙ্খলাপূর্ণ এবং দ্রুততর হইয়া থাকে। তবে যতদিন আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী অনুষ্ঠানগুলির সম্যক্‌ভাবে নির্ব্বাহ না হয়, ততদিন কি আমরা চণ্ডীপাঠ হইতে বিরত থাকিব ? না, তাহা নহে ; পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে পুনঃ পুনঃ চণ্ডীপাঠ করিতে করিতে আমরা একদিন দেখিতে পাইব যে, পূর্ব্ব আয়োজনগুলি যেন কোনও অজ্ঞেয় শক্তিপ্রভাবে, আমাদের প্রায় অজ্ঞাতসারেই সুসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে ; তখনই আমরা চণ্ডীর প্রকৃত রহস্য অবগত হইয়া মাতৃ-কৃপালাভে ধন্য হইব।

প্রথম চরিত

ঋষিচ্ছন্দ—উপোদ্‌ঘাত-সূত্র

সাধন-সমর বা দেবীমাহাত্ম্যে মায়ের তিনটী চরিত বর্ণিত হইয়াছে; তন্মধ্যে প্রথম চরিত—মধুকৈটভ বধ। ইহার ঋষি—ব্রহ্মা। যিনি যেরূপ সম্বেদনের বা মন্ত্রের প্রথম দ্রষ্টা, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি। এই মধুকৈটভনিধন বা সত্ত্বগুণের প্রলয় বিরাট মনেই সংঘটিত হয়; তাই সৃষ্টিকর্ত্তা বা ব্রহ্মা এই চরিতের প্রথম দর্শক। উপাখ্যানেও দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রহ্মাই মধুকৈটভ-নিধনের প্রথম হেতু।

মহাকালী—দেবতা। প্রলয়ঙ্করী তামসী মূর্ত্তির অঙ্কেই সত্ত্বাদি গুণের অবসান। ইনি কালশক্তির ঊর্দ্ধে অবস্থিতা; তাই মহাকালী। গায়ত্রী—ছন্দঃ। প্রাণ-প্রবাহের স্পন্দনই ছন্দঃ। এই প্রথম চরিতে প্রবিষ্ট সাধকের প্রাণের স্পন্দন বা প্রাণায়াম ঠিক বেদমাতা গায়ত্রীর তুল্যরূপই হইয়া থাকে, তাই গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ। নন্দা বা হ্লাদিনী ইহার শক্তি। রক্তদন্তিকা—অর্থাৎ পরা প্রকৃতির রক্তবর্ণ রজোগুণাত্মিকা চিৎ ইহার বীজ। রজোগুণের ক্রিয়াশীলতাদ্বারাই সত্ত্বগুণ প্রলয়াভিমুখী হয়। সাধকগণ মনে রাখিবেন, চণ্ডীতত্ত্বই পরা প্রকৃতির বিলয়। অপরা প্রকৃতির যেখানে আদিবিন্দু বা সত্ত্বগুণের উন্মেষ, পরা প্রকৃতির সেইটিই চরমবিন্দু।

অগ্নি বা তেজস্তত্ত্বেই বিশিষ্টসর্ব্বভাবের প্রলয় হয়; তাই, অগ্নিই ইহার তত্ত্ব। মণিপুরচক্র বা নাভিকমল ইহার স্থান। ঋক্ বেদ—

স্বরূপ। শ্রুতি আছে ‘বাগেবর্ক্’। বাক বা নাদই ঋক্। বাক্ প্রাণশক্তিরই বিশিষ্ট প্রকাশ। অন্য শ্রুতি বলেন—‘অগ্নে র্ঋচো’ অগ্নি বা তেজ হইতেই ঋকের বা বাক্যের আবির্ভাব। নাদ বা শব্দরূপে শক্তির বিকাশ না হইলে জপ হয় না। মহাকালীর প্রীত্যর্থ অর্থাৎ প্রলয়ঙ্করী তামসী মূর্ত্তিতে সাধকের প্রীতি বা আসক্তির জন্যই এই প্রথমচরিতের জপরূপ কার্য্যে ইহার বিনিয়োগ।

সাধন-সমর

বা

দেবী মাহাত্ম্য

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মগ্রন্থি-ভেদ

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

চণ্ডমূর্ত্তি-মাতৃকাচরণে প্রণাম।

জীব! সাধক! তুমি মায়ের আমার চণ্ডমূর্ত্তি দর্শন করিতে চাও। তুমি কি একদিনের জন্যও মায়ের স্নেহকরুণাভার-নম্রা মূর্ত্তি দেখিয়াছ? একদিনের জন্যও কি মায়ের রক্ত-চরণে কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া, আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছ? একদিনের জন্যও কি কাতর-প্রাণে মা মা বলিয়া, অশ্রুসিক্ত নয়নে মায়ের চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছ? একদিনের জন্যও কি "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং" বলিয়া গুরু-রূপিণী মায়ের আমার অভয় চরণে শরণ লইয়াছ? একদিনের জন্যও কি মাকে আমার হৃদয়-রাজ্যের অচ্যুত সারথি বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ? একদিনের জন্যও কি মাকে আমার চিরজীবনের একান্ত সুহৃদ্, বন্ধু ও সখা বলিয়া স্নেহের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়াছ? একদিনের জন্যও কি মায়ের বিশ্বরূপ দর্শনে সত্যপ্রতিষ্ঠ হইয়াছ? একদিনের জন্যও কি মায়ের আমার

শ্রীমুখবিনির্গত "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই মধুময় অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পবিত্র করিয়াছ? যদি তোমার জীবনে অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই সকল শুভ সংঘটন ঘটিয়া থাকে, তবেই তুমি মায়ের আমার চণ্ডিকা-মূর্ত্তি-দর্শনের অধিকারী।

ভগবদ্‌গীতা মায়ের হিরণ্ময় মন্দিরের অক্ষয় ভিত্তি—মনোময় কোষের সাধনা এবং চণ্ডী বা দেবী-মাহাত্ম্য তদুপরিস্থিত অতুলনীয় প্রাসাদ—বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা। যেরূপ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া সমুন্নত মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়, সেইরূপ গীতোক্ত সপ্তশত মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া চণ্ডীরূপ মুক্তিমন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে হয়। যাহারা গীতার বুদ্ধিযোগে অভ্যস্ত, তাহারাই দেবী-মাহাত্ম্য দর্শনের অধিকারী। চণ্ডী কি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। চণ্ডী মাতৃমিলনের তিনটী তরঙ্গ। সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রে অবগাহন করিবার পর, যে তিনটী তরঙ্গ আসিয়া জীবত্বের অচ্ছেদ্য গ্রন্থি সম্যক্ উচ্ছেদ করিয়া দেয়, তাহাই চণ্ডীর তিনটী রহস্য। ভগবদ্‌গীতায় ব্রহ্মসমুদ্রে অবগাহন এবং চণ্ডীতে নিরবশেষ মিলন পরিব্যক্ত হইয়াছে। জীব যখন পূর্ণভাবে মাতৃ-কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাসবান্ হয়, যখন জীবকর্ত্তৃত্ব সম্যক্‌ভাবে মাতৃ-চরণে উৎসর্গ করে, তখন সে দেখিতে পায়—"মা আমার হৃদয়রূপ রণক্ষেত্রে চণ্ডমূর্ত্তিতে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া মুক্তিপথের অন্তরায়স্বরূপ দুরপনেয় সংস্কাররূপী অসুরকুলকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়া, স্বকীয় অঙ্গে মিলাইয়া লয়েন।" সেই মহা-মিলনের সময় যে প্রবাহগুলি স্বতঃই আসিতে থাকে তাহাই দেবী মাহাত্ম্যে অসুরনিধনরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সঞ্চিত, প্রারব্ধ এবং ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ কর্ম্মসংস্কার বা বাসনা-বীজই মুক্তির অন্তরায়। সূক্ষ্মদর্শনে ইহারা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ-রূপে পরিচিত। ইহারাই ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি নামে অভিহিত। যতদিন এই গ্রন্থি ভেদ না হয়, ততদিন পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর উৎপীড়ন বিদূরিত হয় না। একমাত্র মাকে দেখিলে, এই গ্রন্থির উচ্ছেদ হয়। "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থি তস্মিন্ দৃষ্টে।" মাতৃ-চরণে আত্মসমর্পণ করিবার পর সাধক দেখিতে পায়—তাহার এই হৃদয়গ্রন্থি

সম্যক্ উচ্ছেদ করিবার জন্য, মা স্বয়ং চণ্ডিকামূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। এক একটী গ্রন্থি ভেদ করিবার সময় সাধকগণের হৃদয়ে মা যেরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, তাহাই চণ্ডীর এক একটী রহস্য। প্রথম মধুকৈটভবধ বা ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ, দ্বিতীয়—মহিষাসুরবধ বা বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ, তৃতীয়—শুম্ভবধ বা রুদ্রগ্রন্থিভেদ। এই সকল তত্ত্ব যথাস্থানে বিশদ্ভাবে আলোচিত হইবে।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি যতদিন অনুলোম গতি বা বহির্মুখী শক্তির বিকাশ করেন, ততদিন জীব এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। যখন বিলোম গতি বা অন্তর্মুখী শক্তির বিকাশ হয়, ধীরে ধীরে গতি পরমাত্মাভিমুখী হয় অর্থাৎ শক্তিপ্রবাহ স্থিরত্বের অভিমুখী হয়, তখনই জীব-হৃদয়ে এই দেবাসুর সংগ্রাম আরম্ভ হয়; তখন জীব প্রত্যক্ষ করে —মা স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সুর-বিরোধী ভাবসমূহকে সমূলে বিলয় করিতে থাকেন। মায়ের ইচ্ছা—পুত্রকে সর্ব্বভাব-বিনির্ম্মুক্ত করিয়া—শুদ্ধ পূত মুক্ত করিয়া, আপানতে মিলাইয়া লয়েন। তিনি পুত্রস্নেহবিমূঢ়া মা, তাঁর ইচ্ছা আমাকে একত্বে উপনীত করেন—চিরতরে আপনবক্ষে স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, আর আমি চাই—সর্ব্বভাবে খেলা করিয়া জগতের ধূলি গায়ে মাখিয়া, পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতে। কিন্তু তিনি যে মা! কতদিন আমাকে পুতুল খেলা খেলিতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন? তাই মা যখন আমার এই বড় সাধের খেলাঘর তিনখানি ভাঙ্গিয়া দিবার উপক্রম করেন—যখন আমার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহের বিলয় করিবার জন্য বিশেষভাবে আবির্ভূতা হয়েন, তখনই চণ্ডীমূর্ত্তিতে মায়ের প্রকাশ হয়।

চণ্ডশব্দের অর্থ—অত্যন্ত কোপন। মাতৃস্নেহে বিমুগ্ধ সন্তানই মায়ের চণ্ডিকামূর্ত্তি-দর্শনে সমর্থ; কারণ, সে প্রতিকর্ম্মে মাতৃস্নেহের বিকাশমাত্র দেখিতে পায়। জন্ম-মৃত্যুতে, সুখ-দুঃখে, পাপ-পুণ্যে, রোগ ও স্বাস্থ্যে, সর্ব্বত্র মায়ের মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মহারা হয়। কি ব্যবহারিক জগতে, কি সাধনরাজ্যে সর্ব্বত্র মায়ের মঙ্গলময় হস্তের

অমৃতময় স্পর্শ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হয়। আনন্দময়ী চিন্ময়ীর বক্ষে নিরানন্দ বা ধ্বংস কোথায়! বিশেষতঃ সাধকপুত্রগণ মায়ের আমার চণ্ডমূর্ত্তি দেখিতেই ভালবাসে। যে মূর্ত্তিতে মা আমার আমিত্বকে বিনাশ করিতে উদ্যতা যে মূর্ত্তিতে মা আমার ক্ষুদ্রত্ব, পরিণামিত্বকে গ্রাস করিয়া জীবত্বের অচ্ছেদ্য বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত করিতে উদ্যতা, সেই মূর্ত্তিই সাধকপুত্রের অভীষ্ট—প্রিয় হইতে প্রিয়তর। সরল নির্ভীক শিশুপুত্র কি মায়ের ক্রোধময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত বা সঙ্কুচিত হয়, না আরও দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া মাতৃ-ক্রোড়ে আরোহণ করিতে প্রয়াস পায়?

জীব! তুমি কি এই জন্মমৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যথিত হইয়াছ? প্রতিনিয়ত এই ঘোর চঞ্চলতাময় জীবনকালকে একটা উৎপীড়নমাত্র বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ? হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিত্যস্থিরত্ব লাভের জন্য আকুল উদ্বেলন অনুভব করিয়াছ? তুমি কি কাম ক্রোধাদি রিপুবর্গের অসহনীয় অত্যাচারে আপনাকে সম্পূর্ণ জর্জ্জরিত—মথিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ? রোগে শোকে প্রবলের অযথা অত্যাচারে, আপনাকে নিতান্ত দীন আর্ত্ত বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছ? যদি করিয়া থাক—যদি অমৃতময় মাতৃঅঙ্ক লাভের আশায় আশান্বিত হইয়া থাক, তবে এস, আমরা মায়ের চণ্ডীকামূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হই। আর দূর হইতে দাঁড়াইয়া —মাতৃ অঙ্কে আরোহণ করিয়া দেখি, কিরূপে মা আমার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, আমাকে মুক্তিমন্দিরে উপনীত করেন—আপন অঙ্গে মিলাইয়া লয়েন। যখন দেখিতে পাইবে—আমার ক্ষুদ্র নিশ্বাসটি হইতে আরম্ভ করিয়া নির্ব্বাণ বা মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্য মায়ের মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছায়—অঙ্গুলিচালনে নিষ্পন্ন হইতেছে; কেবল তখনই সাধক, তুমি স্ফীতবক্ষে হর্ষোৎফুল্ললোচনে বাহুদ্বয় উত্তোলন করিয়া 'জয় মা জয় মা' বলিতে বলিতে, মায়ের আমার চণ্ডমূর্ত্তির সমীপস্থ হইতে সমর্থ হইবে। তখন দেখিবে—তোমাকে কিছুই করিতে হয় না। তোমার সমস্ত কার্য্য, সমস্ত সাধনা তোমার

অজ্ঞাতসারে অচিন্ত্যনীয় উপায়ে মা স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া লইতেছেন, তখনই বুঝিতে পারিবে—মায়ের এই অভাবনীয় অনন্ত লীলায় তুমি নিমিত্তমাত্র। তবে আর ভয় কি সাধক? এস, আমরা চণ্ডমূর্ত্তি-মাতৃকাচরণে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হই, মায়ের সম্মুখে দাঁড়াই—দেখি তিনি কিরূপে আমাদের আমিত্ববন্ধন ছিন্ন করিয়া, তাঁহার স্বকীয় "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্" আমিত্বে চিরতরে মিলাইয়া লয়েন।

ওঁ

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন।

কথিত আছে—পূর্ব্বকালে ব্যাসশিষ্য মহাতেজা জৈমিনি মুনি, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট প্রসঙ্গক্রমে দেবীমাহাত্ম্য-শ্রবণের অভিলাষী হইয়া ছিলেন; কিন্তু মার্কণ্ডেয়ের অবসর-অভাবে তাঁহাকে বিন্ধ্যাচল-নিবাসী পক্ষীচতুষ্টয়ের নিকট চণ্ডীতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয় মুনি যেরূপভাবে দেবীমাহাত্ম্য ক্রোষ্টুকি মুনিকে বলিয়াছিলেন, পক্ষিগণ ঠিক সেইভাবে মার্কণ্ডেয়ের মুখের কথাগুলি জৈমিনিকে শুনাইয়াছিলেন। তাই, এস্থলে 'মার্কণ্ডেয় উবাচ' বলা হইল। মার্কণ্ডেয়—প্রাজ্ঞপুরুষ বা প্রজ্ঞাচক্ষু—এবং জৈমিনি বিশ্ব বা জীব।

মার্কণ্ডেয়—সপ্তকল্পান্তজীবী—অমর। জীব যখন আপন-অমরত্ব বুঝিতে পারে; যখন চৈতন্যকে—প্রাণকে নিত্য, স্থির, ধ্বংস ও উৎপত্তিশূন্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে; যখন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকাল নখদর্পণে বিম্বিত চিত্রের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়; যখন মৃত্যুঞ্জয় বিজ্ঞানময় গুরুরূপী মহাদেবের কৃপায় জীবত্ব হইতে—কালপাশ হইতে মুক্ত হইয়া প্রজ্ঞাক্ষেত্রে উপনীত হয়, তখনই জীব মার্কণ্ডেয় অর্থাৎ প্রাজ্ঞ বা অমর হয়। তখনই কর্ম্মপরায়ণ নিয়ত পরিণামশীল সংশয়পূর্ণ জৈমিনিরূপী স্থূলাভিমানী বিশ্বকে এই অঘটনঘটনপটীয়সী মহামায়ার মহাশক্তিরহস্য বর্ণনা করিতে সমর্থ

হয়। তাই, আমরা চণ্ডীর ষট্‌সংবাদে দেখিতে পাই, মার্কণ্ডেয়-জৈমিনিসংবাদে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখিয়া, কেহ যেন এরূপ ভ্রমে পতিত না হন যে, মার্কণ্ডেয় কিংবা জৈমিনি নামে কোন ঋষি ছিলেন না অথবা চণ্ডীর উপাখ্যানভাগ রূপকমাত্র। রূপকচ্ছলে স্বল্পবুদ্ধি মানবের নিকট আধ্যাত্মিক রহস্য বর্ণনা করাই যে সমস্ত পুরাণের অভিপ্রায়, একথা আমরা কখনই বলিতে পারি না। যেহেতু, দর্শন ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক। বৃক্ষকে শাখা-পল্লবাদি-বিশিষ্ট একটি পাঞ্চভৌতিক পদার্থরূপে যতক্ষণ দর্শন করা যায়, ততক্ষণ উহা আধিভৌতিক দর্শন। যখন দেখা যায়—একটী চৈতন্য-সত্তাই বৃক্ষের আকারে প্রকাশ পাইতেছে, তখন উহাকে আধিদৈবিক দর্শন বলা যায়; কারণ, বৃক্ষাধিষ্ঠিত চৈতন্য বা দেবতাকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত দর্শন-ব্যাপারটি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। আর, যখন জীবের যোগচক্ষু বা তৃতীয় নেত্র গুরুকৃপায় উন্মীলিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়—আত্মা অর্থাৎ 'আমি'ই বৃক্ষাকারে প্রকাশিত; এই দর্শনের নাম আধ্যাত্মিক দর্শন। জীবের জ্ঞান এই ত্রিবিধ স্তরে বিচরণ করে; সুতরাং জগতের প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনার মধ্যে এই ত্রিবিধ জ্ঞানের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। কেহ কেহ দেখে—নদীর স্রোত বহিয়া যাইতেছে; কেহ দেখে—স্বামীর সহিত—সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য নদী দ্রুতবেগে ছুটিতেছে; আবার কেহ দেখে—আমারই আত্মা—আমারই প্রাণ—আমারই মা স্নেহতরল প্রবাহরূপে অবস্থান করিতেছেন। ইহার কেহই ভ্রান্তদর্শী নহে, সকলেই সত্যদর্শী। জ্ঞান যখন যে স্তরে বিচরণ করে, তখন সেই স্তরোপযোগী অনুভূতির বিকাশ হয়। তবে ইহা স্থির, যাহা স্থূলে—ভৌতিক জগতে অর্থাৎ আধিভৌতিক ভাবে একটি পদার্থ বা ঘটনামাত্র, তাহাই সূক্ষ্মে—চৈতন্যরাজ্যে বা আধিদৈবিক ভাবে বিশিষ্ট চৈতন্যের অভিব্যক্তিরূপে প্রতিফলিত হয়। আবার তাহাই কারণে—আত্মক্ষেত্রে অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে, মাত্র আত্মরূপে—'আমি'রূপেই প্রতীতিগোচর

হইয়া থাকে। যে যেরূপ চক্ষু পাইয়াছে—যাহার জ্ঞান স্বভাবতঃ যেরূপ স্তরে বিচরণশীল, তিনি সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করিবেন। তবে সাধারণ দৃষ্টিতে স্থূলে যাহার প্রত্যক্ষ হয়, চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তাহাই সূক্ষ্ম ও কারণ পর্য্যন্ত অবিকলভাবে দেখিতে পান। তাই, কথায় বলে—'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে (দেহ) ভাণ্ডে'। স্থূল ও সূক্ষ্ম শুধু মাত্রা বা পরিমাণগত বৈষম্য, বস্তুগত বা তত্ত্বগত উভয়ই অভিন্ন।

সেইজন্যই এস্থলে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, চণ্ডীর উপাখ্যানভাগ রূপকমাত্র নহে; উহা সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা। তবে জীবশিক্ষার জন্য, স্থূলে—ভৌতিক রাজ্যে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই চৈতন্যক্ষেত্রে বা আত্মরাজ্যে তুল্যরূপে প্রতি জীব-হৃদয়ে সংঘটিত হয়; জীবজগতে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণের মধ্যে এমনই একটা শৃঙ্খলা, এমনই একটী অলঙ্ঘ্য নিয়ম বিরাজিত। এমন কোন জীবন্মুক্ত সাধকের নাম আজ পর্য্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই, অথবা হইতেই পারে না, যাঁহার হৃদয়ে কুরুক্ষেত্রসমর—গীতাতত্ত্ব কিংবা দেবাসুর-সংগ্রাম—চণ্ডীতত্ত্ব বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। তবে, কোনও কোনও সাধক ঐগুলি লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হন, আবার কেহ বা লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইয়া, জীবনের অতীত ঘটনাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, দেখিতে পান যে, তাঁহাকে প্রায় অজ্ঞাতসারে গীতা ও চণ্ডী-তত্ত্বের ভিতর দিয়াই আসিতে হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক রহস্য অবগতির জন্যই চণ্ডী-তত্ত্বে অবগাহন করিব। মা আমাদিগের প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত করুন আমাদের হৃদয়ে চণ্ডী-তত্ত্ব উদ্‌ভাসিত হউক, আমরা কৃতার্থ হই।

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।
নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্ গদতো মম ॥১॥

অনুবাদ। যিনি অষ্টম (অষ্টসিদ্ধীশ্বর অষ্টপাশবিমুক্ত) মনু নামে কথিত হন, তিনি সূর্য্যতনয় সাবর্ণি। তাঁহার উৎপত্তি-বিবরণ আমি সবিস্তার বর্ণনা করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যা। সূর্য্য—জগৎ-প্রসবিতা, প্রাণশক্তির একমাত্র আধার। যে বরণীয় ভর্গ বা ব্রহ্মজ্যোতি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে সম্যক্‌ভাবে ওতপ্রোত রহিয়াছেন, তাঁহারই বিশিষ্ট বিকাশক্ষেত্র সূর্য ; তাই ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী মন্ত্রে সেই বরণীয়ভর্গের উপাসনা করিতে গিয়া, সূর্য্যকেই প্রতিনিধি স্বরূপে গ্রহণ করেন। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে, প্রতি বাক্যব্যয়ে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-সঞ্চালনে, প্রত্যেক চিন্তায় আমাদের যে প্রাণশক্তি পরিব্যয়িত হয়, একমাত্র সূর্য্য হইতেই, তাহা আমরা পুনরায় লাভ করিয়া আপন অস্তিত্ব উদ্বুদ্ধ রাখিতে সমর্থ হই। তাই কি বহির্জগতে কি অন্তর্জগতে, কি সাধনাক্ষেত্রে, একমাত্র সূর্য্যই জীবের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয় ও অবলম্বন। গর্ভস্থ শিশু যেরূপ নাভিসংযুক্ত নাড়ীদ্বারা মাতৃভুক্ত অন্নাদির রসপ্রবাহে পরিপুষ্ট হয়, সেইরূপ আমাদের নাভিচক্রে বা মণিপুর কেন্দ্রে সূক্ষ্ম সূত্ররূপী জ্যোতির্ধারা অবলম্বনে প্রতিনিয়ত সূর্য্য হইতে প্রাণশক্তিরূপ রসপ্রবাহ আসিতেছে। তাহারই ফলে জীব আমরা সঞ্জীবিত থাকি। জীব মনুষ্যত্বলাভ করিলে বুঝিতে পারে, এই পরিদৃশ্যমান সূর্য্যই তাহার পিতৃস্থানীয়।

সাবর্ণি—সবর্ণার পুত্র। সবর্ণার অন্য নাম সরণ্যু। বেদে ইনি সরণ্যু নামেই অভিহিত হইয়াছেন। সবর্ণা—সূর্য্যশক্তি। ইহা ঐশীশক্তিরই প্রতিনিধি। সূর্য্য যেরূপ ব্রহ্মজ্যোতির বিশিষ্ট প্রতিনিধি, সবর্ণা বা সৌরশক্তি সেইরূপ ব্রহ্মশক্তির বিশিষ্ট প্রতিনিধি। এই শক্তির প্রভাবেই এই ভূতধাত্রী বসুন্ধরা এবং অনন্ত গ্রহমালা সূর্য্যমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পরিধৃত হইয়া, মহাশূন্যে অবস্থান করতঃ স্ব স্ব অবয়ব-পরিবর্ত্তন-রূপ প্রণাম করিতে করিতে সেই রমণীয় ভর্গপ্রতিনিধি

সূর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই মহীয়সী শক্তির প্রভাবে জীবসঙ্ঘ স্ব স্ব অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রাখিয়া ব্রহ্মত্বের—মহত্ত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে; মনু এই মহীয়সী সৌরশক্তিরই গর্ভ-সঞ্জাত, তাই সাবর্ণি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

মনু—মন্ ধাতু হইতে মনুশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মন্ধাতুর অর্থ—বোধ বা জ্ঞান। যখন জীবভাবাপন্ন কল্পিত শিশু-চৈতন্য বা ক্ষুদ্র জ্ঞান, সমষ্টি-মানব-চৈতন্যরূপে প্রতিভাত হয়, তখনই উহা মনু নামে অভিহিত হইয়া থাকে; যেরূপ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিচৈতন্য হিরণ্যগর্ভ, তদ্রূপ সমগ্র মনুষ্যজাতির সমষ্টিচৈতন্য মনু। এই মনুচৈতন্যের প্রত্যেক কল্পিত অণুই ব্যষ্টি মনুষ্যরূপে প্রতিভাত; তাই মনুষ্যগণকে মনুজ কহে। আর একটু খুলিয়া বলি—প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরে 'আমি মানুষ' এরূপ একটি বোধ সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত থাকে, ঐ বোধটির নাম ব্যষ্টি মনুষ্য। সমগ্র মানবজাতি যে চৈতন্যে পরিপ্লুত বা অবস্থিত তাহা সমষ্টি মানবচৈতন্য বা মনু। তিনি যতক্ষণ 'আমি মানুষ' এই বোধে সম্বুদ্ধ থাকেন, ততক্ষণ আমরা স্ব স্ব মানবত্বের উপলব্ধি করিতে সমর্থ। যেরূপ আমাদের দেহস্থিত অসংখ্য কীটাণু আমাদেরই চৈতন্যে সচেতন, সেইরূপ সমগ্র মানবজাতি মনুচৈতন্যের সত্তায়ই সত্তাবান; এক কথায় ভগবান্ মনুকেই মনুষ্যজাতির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতা বলা যায়। তাই, মনুকে প্রজাপতি এবং ব্রহ্মাকে পিতামহ বলা হয়। মনুই ব্রহ্মার আত্মজ বা প্রথম সৃষ্টি। সাধনাবলে মানুষ যখন এই মনুত্ব লাভ করে, তখন দেখিতে পায়, সে একমাত্র জগৎপ্রসবিত্রী সূর্য্যশক্তি সবর্ণার অঙ্কেই নিত্য অবস্থিত। তাই মনুকে সূর্য্যতনয় সাবর্ণি বলা হইয়াছে।

মনুষ্য! তুমি কি তোমার ব্যষ্টিভাবাপন্ন ক্ষুদ্র মানবচৈতন্যকে মনুত্বে বা সমষ্টিরূপ মহান্ মানবচৈতন্যে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছ? তুমি কি ক্ষুদ্র ও পরিণামী জ্ঞানের গণ্ডী ছিন্ন করিয়া এক বিশাল আনন্দময় জ্ঞানে উপনীত হইতে চাও? তুমি কি মনুজত্ব পরিত্যাগ করিয়া মনুত্ব লাভের অভিলাষী হইয়াছ? কেন হইবে না! এই মনুষ্য-ক্ষেত্রে অবস্থিত তোমার জ্ঞান যে প্রতিমুহূর্ত্তে বিষয়রূপে পরিণত না হইয়া—

ক্ষুদ্রত্বের আলম্বনরূপ যষ্টি না ধরিয়া, স্থির হইতে পারে না, তুমি যে প্রতি মুহূর্ত্তে জন্ম মৃত্যু ভয়ে শঙ্কিত, প্রতি মুহূর্ত্তে চঞ্চলতার উৎপীড়নে বিব্রত, তুমি কি স্থিরত্ব ও মহত্বের সন্ধান না করিয়া থাকিতে পার? নিশ্চলা নির্ব্বিকল্পা শ্রীকৃষ্ণরূপিণী মায়ের আমার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া একদিন এই সঙ্কীর্ণতারূপ গণ্ডীর বাহিরে যাইতে তোমার প্রবল বাসনা জাগিবেই জাগিবে ; কারণ, স্থিরত্ব ও মহত্ত্বই যে তোমার অব্যয় স্বরূপ! সেই নিত্য স্থিরত্ব লাভ করিতে হইলে তোমাকে মনুজত্ব ছাড়িয়া মনুত্বে উপনীত হইতে হইবে। কখন তুমি মনুজত্ব পরিহারে সমর্থ হইবে, তাহার ইঙ্গিত পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। জীব! যখন তুমি সাবর্ণি সূর্য্যতনয় হইতে পারিবে, অর্থাৎ আপনাকে বরণীয় ভর্গ এবং তদধিষ্ঠিতা মহীয়সী জগদ্বিধাত্রী ঐশীশক্তির অঙ্কে নিত্য সংস্থিত পরিপুষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারিবে, যখন তুমি "নমো বিবস্বতে" বলিতে গিয়া সৌরশক্তি সবর্ণারূপিণী মায়ের স্নেহময় স্পর্শে মুগ্ধ হইবে, যখন তুমি "ভর্গো দেবস্য ধীমহি" বলিয়া অমৃতস্রাবী অনন্ত জ্যোতিস্তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়িবে, যখন তুমি "তত্ত্বে পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে" বলিয়া সূর্য্যে সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া সত্যদর্শী ঋষির ন্যায় মহাসত্যের আভাসতরঙ্গে সম্বেদিত হইবে, যখন তুমি "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" বলিয়া বৈদিকযুগের ব্রহ্মর্ষিদিগের ন্যায় সূর্য্যে আত্মপ্রাণ সম্প্রতিষ্ঠ দেখিয়া জীবভাব সম্যক্‌রূপে বিস্মৃত হইতে পারিবে, তখনই তুমি মনুজত্ব পরিহার পূর্ব্বক মনুত্বলাভের অধিকারী হইবে। সাধক! মনে করিও না যে, ইহা তোমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণ যে অব্যয় সরল পন্থার আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সেই পথে গুরূপদিষ্ট উপায়ে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকিলে, ইহা মানুষমাত্রেই লাভ করিতে পারে।

আমাদের দেবকার্য্যাদিতে আসনশুদ্ধি নামে যে একটী অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই এই সৌরশক্তি উপলব্ধির পথে অগ্রসর হইতে হয়। বর্ত্তমানে ঐ আসনশুদ্ধি একটি মন্ত্রপাঠমাত্র ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইয়াছে বলিয়াই, উহার যথার্থ ফললাভ হয় না।

যাহা হউক এই স্থলে আমরা ঐ মন্ত্রটী ও তাহার সাধনরহস্য উল্লেখ করিতেছি :—

"পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্ ॥"

সাধক! মনে করিবে—তুমি গোলাকার একটী ফুটবলের ন্যায় পৃথিবীর পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া আছ। যেরূপ ভাবে উপবেশন করিলে, কিছুক্ষণ স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পার, সেইরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইবে। 'সমকায়শিরোগ্রীব' হইবে, অর্থাৎ মেরুদণ্ডটী ঠিক সরলভাবে রাখিবে। তারপর ধারণা করিবে—তোমার উর্দ্ধে নিম্নে দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে সর্ব্বত্র মহাশূন্য বিরাজিত। মহাব্যোম-মণ্ডল-মধ্যে তুমি পৃথ্বিরূপিণী মাতৃ-বক্ষে উপবিষ্ট। সম্মুখে সূর্য্যদেব মহাশূন্যে অবস্থিত। তাঁহারই স্নেহময় আকর্ষণে ভূপৃষ্ঠে তুমি ধৃত হইয়া রহিয়াছ। পৃথিবী যেন তোমাকেই বক্ষে ধরিয়া সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় উক্ত মন্ত্রটি চৈতন্যময় করিয়া পাঠ করিবে। উহার অর্থ—হে পৃথিবীরূপিণী মা! তোমা কর্ত্তৃক এই লোকসমূহ ধৃত হইয়া রহিয়াছে। তুমি এই সম্মুখবর্ত্তী সূর্য্যরূপী বিষ্ণু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রহিয়াছ। মা! তুমি আমায় ধরিয়া থাক এবং আমার আসনখানি পবিত্র করিয়া দাও; এইরূপ উপলব্ধি করিয়া, প্রতিদিন সৌরজ্যোতিতে অভিস্নাত হইয়া, সূর্য্যে সত্য ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, জ্যোতির্ম্ময় ব্যোমমণ্ডলে অবস্থান করিতে অভ্যাস করিবে। কিছুদিন এই অভ্যাসের ফলে তুমি দেখিতে পাইবে—তোমার অন্তরে বাহিরে চৈতন্যময় জ্যোতি ব্যতীত অপর কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। ক্রমে যখন সেই দিগন্তব্যাপী চিন্ময় জ্যোতির্মণ্ডলে আত্মহারা হইয়া পড়িবে, তখনই বুঝিতে পারিবে, তুমি সৌরশক্তির অঙ্কে অবস্থিত হইয়াছ। তখন ধীরে ধীরে "আমি মানুষ" এই বোধটির সমীপস্থ হইয়া মহতী ধীশক্তিরূপিণী সবর্ণার অতুলনীয় কৃপা প্রার্থনা করিবে, এবং যে বিরাট মনুচৈতন্য হইতে ঐ ক্ষুদ্র বুদ্বুদ উঠিতেছে, সেই "আমি মানুষ"

রূপ বোধটি তাহাতেই মিলাইয়া দিবে। তখনই এই মনুত্বের আভাস উপলব্ধি করিতে পারিবে।

এই মনুত্ব লাভ করিলে আমাদের কি হইবে? আমরা অষ্টম হইব। অষ্টম কি? "অষ্টৌ সিদ্ধয়ঃ ঐশ্বর্য্যাণি বা মিয়ন্তে অস্মিন্ ইতি অষ্টমঃ"। যেখানে অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য সম্যক্ পরিমিত হয়, তাহাই অষ্টম। জীব যখন এই মনুত্ব লাভ করে, তখন অণিমা লঘিমা প্রভৃতি সিদ্ধি তাহার আয়ত্তীভূত হয়। একদিকে যেমন এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া জীব ভগবৎসারূপ্য উপলব্ধি করে, অন্যদিকে তেমনই ঘৃণা লজ্জা ভয় জুগুপ্সা প্রভৃতি অষ্টবিধ পাশ হইতে মুক্ত হইয়া যায়; তাই মনুকে অষ্টম বলা হইয়াছে।

মুমুক্ষু সাধক যে তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়া মোক্ষলাভ করে, মা আমার দেবীমাহাত্ম্যের প্রারম্ভেই তাহার সূচনা করিয়াছেন। মনুজত্ব হইতে মনুত্ব এবং মনুত্ব হইতে ব্রহ্মত্ব, এই ত্রিবিধ অবস্থা একটির পর একটি মায়ের কৃপায় সাধকের সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হয়। দেবত্বস্তর মনুত্ব ও ব্রহ্মত্বস্তরের অন্তর্গত বলিয়াই এস্থলে পৃথক্‌ভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। পিতৃ-অঙ্কস্থিত শিশুপুত্র যেরূপ নির্ভয়ে করতালি দিয়া সহচরবর্গের সহিত হাসিতে হাসিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনরূপ আনন্দক্রীড়া করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করে, সেইরূপ জীব যখন বুঝিতে পারে,—আমরা পিতৃরূপী মনুর অঙ্কে নিত্য অবস্থিত, আমার জন্ম মৃত্যু, রোগ শোক, বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থার যতই কেন পরিণাম হউক না, আমি আমার আনন্দময় পিতৃ-অঙ্কে অবস্থিত। হই না কেন ক্ষুদ্র, হই না কেন দীন, হই না কেন পাপের অন্ধ তমসাচ্ছন্ন গভীর কূপে নিপতিত, হই না কেন অবিশ্বাসী, হই না কেন শ্রদ্ধাহীন, হই না কেন অজ্ঞানান্ধ, "আমি আমার আনন্দময় পিতৃ-অঙ্কে নিত্য অবস্থিত", জীব যখন এইরূপ উপলব্ধি লাভ করে, এইরূপ আনন্দময় সম্বেদনে অহর্নিশ সম্বেদিত হয়, এইরূপ নিত্যযুক্ততা যখন প্রত্যক্ষ অনুভূত হইয়া থাকে, তখন জীব মর্ত্ত্যে থাকিয়াও অমরত্বের আস্বাদে মুগ্ধ থাকে এবং সাধারণের পক্ষে নিয়ত দুঃখময় এই জগৎকে

আনন্দময়রূপে ভোগ করিয়া অনির্ব্বচনীয় শক্তি লাভ করে। মনুজবৃন্দ তোমরা কি এই নিত্য শান্তিলাভের জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়াছ ?

মহামায়ানুভাবেন যথা মন্বন্তরাধিপঃ।
স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো রবেঃ ॥২॥

অনুবাদ। সেই রবিতনয় মহাভাগ সাবর্ণি মহামায়ার অনুকূল ইচ্ছায় যেরূপে মন্বন্তরের অধিপতি হইয়াছিলেন (তাহা শ্রবণ কর)।

ব্যাখ্যা। মনুত্ব লাভ করিলে অষ্টম হওয়া যায়; ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে আর একটি অলৌকিক লাভের কথা বলিলেন —মন্বন্তরাধিপ। যে অখণ্ডবোধ মনু-চৈতন্যরূপে প্রতিভাত, সেই সমষ্টি মানব-চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলে, ব্যষ্টি মানব-চৈতন্য আয়ত্তীভূত হয়। মনুষ্যজাতি মনুরই অন্তর; মনু হইলেই মন্বন্তরের আধিপত্য লাভ হয়। সমগ্র মানবজাতির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় তাহারই ইঙ্গিতে সাধিত হয়। সে তখন প্রত্যেক মানুষের সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারে। তাহার ফলে—প্রত্যেক মানুষের অন্তর-নিহিত ভাবরাশি দর্শন করিতে সমর্থ হয়। আমরা মানুষ, আমাদের অন্তরে কত জন্মজন্মান্তর-সঞ্চিত সংস্কার-রাশি লুক্কায়িত আছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; কিন্তু যখন আমরা মনুত্ব লাভ করিব, মন্বন্তরের অধিপতি হইব, তখন আমার নিজের সংস্কাররাশি ত দেখিতে পাইবই, তদ্ভিন্ন প্রত্যেক মানুষের বহুজন্মসঞ্চিত পাপ পুণ্য জন্ম জাতি আয়ু ভোগ ইত্যাদি সকলই প্রত্যক্ষ করিতে পারিব। আমরা কখন কখন কোনও বিশিষ্ট সাধু মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হইলে দেখিতে পাই, তিনি আমাদের মনের ভাবগুলি বলিবার পূর্ব্বেই বুঝিয়া লইতে পারেন, ইহা ঐ আংশিক মনুত্ব-লাভের ফল। ব্যষ্টি মানবগণ মনুরই অন্তর; সেই অন্তররাজ্যের আধিপত্য লাভ করিতে পারিলে, প্রত্যেক মানুষের

উপরে নিজের ইচ্ছা-শক্তি পরিচালনা করিয়া, তাহাদের স্বাভাবিক নিম্ন গতির পরিবর্ত্তন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়।

একমাত্র মহামায়ার অনুভাবে—অনুকূল ইচ্ছায়—কৃপায় এই মনুত্ব লাভ করা যায়। মনুত্বে বা বোধময় ক্ষেত্রে উপনীত হইলে, সমস্ত জগৎ আমারই অন্তরে অবস্থিত এইরূপ প্রতীতি হয়, ইহাই যথার্থ মন্বন্তরের আধিপত্য।

মহামায়া কি, তৎসম্বন্ধে নানাবিধ দর্শনকার এবং তদনুগামী ভাষ্য ও টীকাকারগণ নানারূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন—জড়া প্রকৃতি, কেহ বলেন—মিথ্যা, ভ্রান্তি ইত্যাদি। এইরূপ কত মতই না আছে! আমরা সেই সকল মতবাদ উপস্থিত করিয়া কূট তর্কের আশ্রয়ে মায়ার বিচার করিতে যাইব না; কারণ, জানি—তিনি বিচারলভ্য নহেন। আমাদের উদ্দেশ্য তাহাকে লাভ করা, আমরা মাতৃ-স্নেহের অভিলাষী, মায়ের স্বরূপ বিচারে আমাদের কি প্রয়োজন? আমরা যখন গর্ভধারিণী মায়ের নিকট মা বলিয়া দাঁড়াই, তখন যেরূপ তাঁহার স্বভাবের বিচার করি না, শুধু মা বলিয়া স্নেহের ধারায় অভিষিক্ত হই, সেইরূপ চল আমরা আমাদের একান্ত আশ্রয়স্বরূপা মহামায়া জগৎ-জননীর সম্মুখে মা বলিয়া দাঁড়াই—দেখি তিনি কি ভাবে আমাদের নিকট আত্ম-স্বরূপ প্রকটিত করেন, কি ভাবে সন্তানকে আনন্দময় স্নেহধারায় অভিষিক্ত করেন।

আমরা দেখি—মহামায়াই সত্য। মহামায়া ছাড়া কোথাও কিছু নাই, মহামায়াই জীবের জননী। আমরা তাঁহারই গর্ভসঞ্জাত, তাঁহারই বক্ষে সংস্থিত, তাঁহারই স্নেহময় জ্ঞান-স্তন্যে পরিপুষ্ট হইতেছি; আবার তাঁহারই কৃপায় মাতা-পুত্র-সম্বন্ধশূন্য এক অদ্বিতীয় স্থির নিরঞ্জন স্বত্তায় উপনীত হইব। অর্থাৎ আমি সম্যক্‌ভাবে মহামায়ায় মিলাইয়া যাইব। আমরা জানি—মহামায়াই জীব, মহামায়াই ঈশ্বর এবং মহামায়াই ব্রহ্ম। যেখানে মায়া নাই, সেখানে সত্যও নাই মিথ্যাও নাই; যতক্ষণ মায়া আছে, ততক্ষণ সত্য ও মিথ্যা উভয়ই আছে; যতক্ষণ বাক্য মন ইন্দ্রিয় আছে, সৎ চিৎ আনন্দ আছে, ততক্ষণ মায়া

আছে। নিগু´ণ চৈতন্যে যখন বহুভাবে ব্যক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তখন তিনি—ঐ চৈতন্যই মায়ারূপে অভিব্যক্ত হন। এই বহু ভাবের বীজ গর্ভে ধারণ করেন বলিয়াই তিনি জননী ; আবার জগৎ-রূপে প্রকটিত হইয়া অর্থাৎ অব্যক্ত জীবসমূহকে প্রসব করিয়া পুনরায় নিগু´ণত্বে উপনীত করিবার জন্য স্বয়ং মহতী ক্রিয়াশক্তিরূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন, এবং স্বীয় অঙ্কধৃত জীবজগৎকে পুনরায় একত্বে—ব্রহ্মত্বে প্রলীন করিয়া থাকেন ; তাই মহামায়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের একমাত্র অধীশ্বরী—জগদ্‌বিধাত্রী জগৎ-পালয়ত্রী জগৎ-সংহর্ত্রী মোক্ষপ্রদায়িনী জননী।

এই মহামায়ার অনুকূল ইচ্ছা—কৃপা হইলে অর্থাৎ তাঁহার স্নেহের উপলব্ধি করিতে পারিলেই, জীব মন্বন্তরের অধিপতি হয়। সাধক! তুমি কি ইহাকে জানিতে চাও? এই মহামায়ার স্বরূপ অন্ততঃ আংশিকভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলে চণ্ডীতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না ; তাই খুলিয়া বলিতেছি—মাতৃ-অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া, মাতৃ-স্তন্যে পরিপুষ্ট হইয়া যে সন্তান আপন গর্ভধারিণীকে জানে না, সে পুত্র যতই না কেন অভ্যুদয়সম্পন্ন হউক, যতই না কেন জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করুক, জগতে সে যতই সম্মানিত হউক, বাস্তবিক সে যেরূপ ঘৃণার পাত্র, সেইরূপ মানুষ হইয়া যদি মহামায়াকে মা বলিয়া চিনিতে না পারে, তাহার মনুষ্য-জন্মই বৃথা। সাধক! তুমি আমার মাকে দেখিবে? তবে ঐ দেখ,—যিনি তোমার ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসটি হইতে আরম্ভ করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি পর্য্যন্ত ক্রিয়া-শক্তি-রূপে, সঙ্কল্প-বিকল্প-আকারে মনোরূপে, কামক্রোধাদি-আকারে বৃত্তিরূপে, বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্যাদি-আকারে অবস্থারূপে এবং জন্ম-মৃত্যুরূপে মহা-পরিবর্ত্তনের আকারে তোমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, ঐ উনিই যে তিনি, মহামায়া মা আমার। যাঁহাকে তুমি সাধনার অনন্ত অন্তরায় মনে করিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক কুটিল কটাক্ষে পরিহার করিতে উদ্যত হও, যাঁহাকে তুমি মায়া বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া, বন্ধন বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিতে চেষ্টা কর—ঐ উনিই যে তিনি গো! উর্দ্ধে নিম্নে, পূর্ব্বে পশ্চিমে

উত্তরে দক্ষিণে যাহা কিছু দেখিতে পাও—ঐ উনিই যে মহামায়া মা আমার। এই যে স্নেহময় পুত্রের কমনীয় মূর্ত্তিখানি দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, উহা আর কেহ নয়—মহামায়া মা; ঐ যে কামিনীর কমনীয় অঙ্গস্পর্শে আত্মহারা হইলে, উহা আর কেহ নয়—মহামায়া মা; ঐ যে কাঞ্চনের লোভে তৃষ্ণার্ত্ত হরিণের মত ছুটিতেছ, উহা আর কেহ নয়—মহামায়া মা; ঐ যে কুসুম-সৌরভে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতেছ, উহা আর কেহ নয়—মহামায়া মা; ঐ যে নানাবিধ ভোজ্য-সম্ভারে রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছ, উহা আর কেহ নয়—মহামায়া মা। তোমার স্থূলদেহের প্রত্যেক পরমাণু—মহামায়া মা। তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা মা, কাম ক্রোধ মা, সুখ দুঃখ মা, পাপপুণ্য মা, জন্ম মৃত্যু মা, দীনতা মা, স্বর্গ নরক মা, অজ্ঞানতা মা; মা ছাড়া কোথাও কিছু নাই, তোমার অন্তরে বাহিরে একমাত্র মা-ই পূর্ণভাবে প্রকটিত। যাঁহাকে তুমি চাও, যাঁহাকে তুমি অন্বেষণ কর, ঐ যে তিনি—মহামায়া মা আমার তোমাকে স্নেহময় আলিঙ্গনে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া, অনন্ত জন্মমৃত্যু-প্রবাহের ভিতর দিয়া, উন্মাদিনীবেশে আলুলায়িতকেশে, 'পুত্র! আয় আয়' বলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। বড় আদরে—অতি যত্নে তোমায় জড় পরমাণু হইতে জীবশ্রেষ্ঠ মানবকুলে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। এতদিন মহামায়াকে—মাকে আমার চিনিতে পার নাই; ক্ষতি নাই; কিন্তু এখন মানুষ তুমি—মাকে চিনিবে না! মাকে দেখিবে না! ইহা কি মানুষের কাজ। মা আমার তোমার মুখে আধ আধ মাতৃ-আহ্বান শুনিতে বড়ই উৎসুকা! তাই তিনি প্রতিনিয়ত নিজে মা বলিয়া তোমাকে মা বলা শিখাইতেছেন; তবু তুমি মা বলিবে না।

ঐ দেখ, তুমি যাহা চাহিতেছ, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যাহা যখন চাহিতেছ, তৎক্ষণাৎ মা আমার সেইরূপে—তোমার ভোগ্যরূপে সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন। তুমি বহুত্বের আনন্দক্রীড়া করিতে চাহিয়াছিলে—ক্ষুদ্রত্বের, পরিণামিত্বের অভিনয় করিতে চাহিয়াছিলে—দেখ, স্নেহময়ী স্মেরাননা মা অমনি তোমার প্রকৃতিরূপে অবস্থান

করিয়া, অনুগতা পরিচারিকার ন্যায় তোমার অভিলাষ মিটাইতেছেন। তুমি ফল চাহিলে, ফুল চাহিলে, অমনি মা আমার ফলের আকারে ফুলের আকারে তোমার নিকট উপস্থিত হইলেন। হায়! তুমি মাকে চিনিলে না। শুধু ফল ফুল চিনিলে! কে তোমার নিকট ফল ফুলের আকারে—কাম কাঞ্চনের আকারে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা চাহিয়া দেখিলে না! শুধু নাম-রূপে মুগ্ধ হইলে! ঐ নাম ও রূপ কাহার!' কে ঐ বহু নামে, বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহা একবার দেখিলে না! বড় বড় দার্শনিকের ভাষাগুলি মুখস্থ করিয়া উহাকে মিথ্যা বলিয়া, ভ্রান্তি বলিয়া, উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছ? উনি মিথ্যা নহেন, ভ্রান্তি নহেন, স্বপ্ন নহেন, অধ্যাস নহেন, জড় নহেন, উনি সত্য, উনি ব্রহ্ম, উনি অভয়, উনি অমৃত, উনি আর কেহ নহেন, উনি মহামায়া মা—'আমি'।

ধার্ম্মিক! তুমি যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া জগতে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইয়াছ! ঐ যে তোমার প্রকৃতি ধর্ম্মরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন! উনি কে? উনিই যে মহামায়া মা! অধার্ম্মিক! তুমি প্রতিনিয়ত কাহার ইঙ্গিতে পাপের পঙ্কিল অভিনয় করিতেছ? কাহার তৃপ্তিসাধন করিবার জন্য পাপপূর্ণ পথে বিচরণ করিতেছ? কে তোমার নিন্দিত-প্রকৃতিরূপে মলিনতার ছিন্ন বসন পরিয়া, তোমাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন? একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ঐ উনিই মহামায়া মা। হিংসাদ্বেষ-নিষ্ঠুরতারূপে কিংবা দয়া-ক্ষমা উদারতারূপে, নিদ্রা তন্দ্রা আলস্যরূপে কিংবা উৎসাহ উদ্যম অধ্যবসায়-রূপে বিষয়সম্ভোগরূপে কিংবা সন্ন্যাসরূপে বিষয়-বিদ্বেষের আকারে, অর্থোপার্জ্জন, পরিবার-প্রতিপালন কিংবা জপ ধ্যান যোগ পূজাদি উপাসনারূপে, কে তোমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছেন?

ঐ দেখ—তোমার দেহাত্মবুদ্ধিরূপে মা! ঐ দেখ—চঞ্চলতাময় মনোরূপে মা। ঐ দেখ—সুখদুঃখের ভোক্তা প্রাণরূপে মা! ঐ দেখ—শুদ্ধ বোধরূপে মা! ঐ দেখ—বন্ধনরূপে মা! ঐ দেখ—মুক্তিরূপে মা! ওরে! এত নিকটে এত অন্তরে আর কে আছে

রে। এত আত্মীয়তা, এত স্নেহ আর কোথায় আছে। এত স্নিগ্ধ মধুর আলিঙ্গনে আর কে মুগ্ধ করিবে? তোমরা জগতে প্রিয়তমা ভার্য্যার সোহাগপূর্ণ আলিঙ্গনে মুগ্ধ হও, আত্মহারা হও; সে আলিঙ্গন যতই ঘনিষ্ঠ হউক না কেন, তাহাতে দেহের ব্যবধান থাকে, সম্যক্ মিলাইয়া যাইতে পারা যায় না; কিন্তু তাঁহার—মহামায়া মায়ের আমার আত্মহারা-আলিঙ্গনে কিছুই ব্যবধান থাকে না। তিনি সর্ব্বতোভাবে আপনাকে হারাইয়া আমাতে মিলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই স্নেহের আত্মহারা, আনন্দের নিগূঢ় আলিঙ্গন উপলব্ধি কর, উঁহারই চরণে তোমার কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর। যিনি তোমার প্রকৃতি সাজিয়া, দীনতার নিম্নতম সোপানে অবতরণ করিয়া, মলিন পরিচ্ছদে জীবত্বের অভিনয় করিতেছেন; ঐ মহামায়া মায়ের, ঐ পরমাত্মরূপিণী মায়ের, ঐ জগৎরূপে প্রকাশশীলা মায়ের সম্মুখে একবার মা বলিয়া দাঁড়াও। তিনি যেমন বহুরূপে বহু মূর্ত্তিতে তোমায় মুগ্ধ করিয়া 'আয় আয়' বলিয়া ডাকিতেছেন, তুমিও যাই মা, যাই মা বলিয়া ছুটিয়া চল। মহামায়া মায়ের আমার বড় সাধ— তাঁহার মনুজ পুত্রকে মনুত্বে অধিরোহণ করাইবেন, অষ্টম করিবেন, মন্বন্তরের আধিপত্য দিবেন। আমরা রাজরাজেশ্বরীর সন্তান! মা কি আমাদের দীনতা দেখিতে পারেন। আমাদের দীনতা হীনতা দেখিয়া যে মায়ের চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হয়। আমাদের ক্ষুদ্রত্ব দূর করিবার জন্য পরিণামিত্ব অপনয়ন করিবার জন্য—জন্ম-মৃত্যু-যাতনা চিরদিনের জন্য বিদূরিত করিবার জন্য তিনি রাজরাজেশ্বরী হইয়াও দীনবেশে আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছেন। চল আমরা একবার মা বলিয়া দাঁড়াই। আর কিছুই করিতে হইবে না—চল কোটি কণ্ঠে একবার মা বলিয়া ডাকি। তাহাতেই তিনি প্রীত হইবেন, আনন্দে আত্মহারা হইবেন, মন্বন্তরের আধিপত্য দিবেন। আমরা মহাভাগ হইব—সৌভাগ্যবান্ হইব। আমরা সূর্য্যতনয় হইব। অনন্ত জগৎপ্রসবিণী সবর্ণা মায়ের পুত্র বলিয়া আপনাদিগকে বুঝিতে পারিব। মনু হইব—মুক্তিলাভ করিব।

বিশুদ্ধ চৈতন্য যখন বহুভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন উহাই মায়া নামে অভিহিত হয়। মাতৃ-ক্রোড়স্থ শিশুর ন্যায় জগতের প্রত্যেক পদার্থই মহামায়ার অঙ্কস্থিত। মনে কর একটি বৃক্ষ দেখিতেছ, 'বৃক্ষ আছে' বলিয়া একটি বোধ প্রকাশ পাইল। ঐ বোধের যে অংশটি 'আছে' অর্থাৎ অস্তিরূপে প্রতিভাত, সেই অস্তিত্বই বৃক্ষরূপ বিশেষণযুক্ত হইয়া প্রতীতিগোচর হইয়াছে। বৃক্ষ—একটি শক্তি মাত্র। বহির্দৃষ্টিতে যদিও বৃক্ষকেঁ শক্তিরূপে অনুভব করা যায় না, তথাপি একটু ধীরচিত্তে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—স্থির ভাবে দণ্ডায়মান বৃক্ষটি বাস্তবিক স্থির নহে, উহা একটি শক্তি প্রবাহমাত্র। একটি শক্তি পরমাণুগুলিকে দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, প্রতিক্ষণে অকর্ম্মণ্য পরমাণুগুলি বহিঃনিস্থত হইতেছে, অভিনব পরমাণু সংযোজিত হইতেছে, অন্তর্নিহিত রসপ্রবাহ শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্পাদিতে পরিচালিত হইতেছে, পৃথিবীস্থ মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া. আপনি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এইরূপ বহু ক্রিয়াশক্তি বৃক্ষের ভিতর রহিয়াছে ; অতএব কতকগুলি শক্তিপ্রবাহ একস্থানে 'বৃক্ষ' এই নামে পরিচিত হইতেছে। ঐ শক্তিপ্রবাহগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—একটি বৃক্ষকে গঠন করিতেছে, একটি স্থির রাখিতে চেষ্টা করিতেছে এবং তৃতীয়টি বিনাশ করিতেছে। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়-শক্তিরই সাধারণ নাম জগৎ বা পদার্থ। প্রতি পদার্থে প্রতিক্ষণে এই ত্রিশক্তির সম্মিলনমাত্র পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি—অস্তিত্বটি বিশেষণ যুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়। ঐ বিশেষণই হইতেছে শক্তি। 'জগৎ আছে' এই যে প্রতীতি, এই যে জগৎ বিশিষ্ট একটি সত্তা-জ্ঞান, উহা হইতে জগৎ অংশ বা বিশেষণ অংশ দূরীভূত হইলে, সাধারণতঃ ঐ সত্তা-অংশটি এখন আমাদের প্রতীতিযোগ্যই হয় না। আবার জগৎ-সত্তার প্রতীতি না হইলে আত্মসত্তা অর্থাৎ আমি আছি এই জ্ঞানও থাকে না। ঐ সত্তা বা অস্তিত্ব-অংশ সর্ব্বদা শক্তির অঙ্কেই অবস্থিত ; সুতরাং জগৎ বলিলে আমরা বুঝি—একটি শক্তি এবং একটি সত্তা। তন্মধ্যে শক্তি অংশটি প্রতিনিয়ত আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া স্থূলভাবে

প্রকাশ পাইতেছে। এই অংশের সাধারণ সংজ্ঞা—নাম ও রূপ। অপর অংশটি অর্থাৎ সত্তাটি আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও অপ্রত্যক্ষ নহে। এই শক্তি ও সত্তা বস্তুতঃ অভিন্ন। শক্তির সত্তা অথবা সত্তারই শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানে-কোনও ভেদ নাই। যতক্ষণ ভেদ-প্রতীতি থাকে, ততক্ষণ দেখা যায়, শক্তি যেন সত্তাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। এই শক্তিটিও জড় নহে, চিৎ বা চৈতন্যমাত্র। ইহারই নাম মহামায়া। তাই, পূর্ব্বে বলিয়াছি—জীব-জগৎ মহামায়ারই অঙ্কস্থিত সন্তান মাত্র।

এইশক্তি বা মায়া মিথ্যা নহে, ভ্রান্তি নহে,—সত্য। ব্রহ্মের আবরক নহে—প্রকাশক। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রকাশই—শক্তি বা মায়া। আমরা জানি—মায়া সগুণব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই মহামায়া মা আমার যখন আর বহুত্বের স্পন্দনে অভিস্পন্দিত না হইয়া বহুভাবে বিরাজিত প্রকাশশক্তিকে উপসংহৃত করিয়া, স্থিরত্বে উপনীত হয়েন, তখনই তিনি ব্রহ্ম নিরঞ্জন নির্গুণ নির্ব্বিকল্প ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। উহা বাক্য এবং মনের অতীত। যতক্ষণ জীবজগৎ, যতক্ষণ উপাসনা সাধনা, ততক্ষণ তিনি মহামায়া। যতক্ষণ মাতৃ-লাভ, ততক্ষণ মহামায়ারূপেই তিনি প্রকটিতা। এই মহামায়ার স্বেচ্ছাকল্পিত শিশু-চৈতন্যই জীব। ব্যোমপরমাণু হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত সকলেই মহামায়ার অঙ্কস্থিত সন্তানমাত্র; অথবা মহামায়াই জীবজগৎ-আকারে নিত্য প্রকাশিত। আমি ফুলে ফুল দেখি না, দেখি মা; ফলে ফল দেখি না, দেখি মা; জলে জল দেখি না, দেখি রসময়ী মা; বায়ু বায়ু নহে, স্পর্শময়ী মা; চন্দ্রসূর্য্য চন্দ্রসূর্য্য নহে, মাতৃ-চক্ষু বা মা; বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ নহে, মায়ের কটাক্ষ বা মা; নির্ম্মল আকাশ আকাশ নহে, প্রশান্ত উদার মাতৃ-বক্ষ; মেঘমালা মায়ের কেশজাল; এই পরিদৃশ্যমানজগৎই মায়ের প্রকট মূর্ত্তি! জগৎ দেখিয়া যার মাকে মনে না পড়ে, সে কিরূপে জগদতীতা ভাবাতীতা মাকে ধরিবে! মা আমার দয়া করিয়া গুরুরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া যাহার অজ্ঞানান্ধ চক্ষু জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা উন্মীলিত করিয়া

দিয়াছেন, সে-ই—মাত্র সে-ই বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে মাতৃ-মূর্ত্তি দেখিতে পায় ও নিয়ত আনন্দে আত্মহারা থাকে। চৈতন্যদেব বলিতেন —"চারদিকে হেরি আমি রাইহেমরূপ।" যতদিন যাহা দেখে, তাহাতেই ইষ্টস্ফুরণ না হয়, ততদিন তপস্যা তপস্যামাত্র। একটি শ্লোকেও আছে—'যাহার অন্তর বাহিরে হরি, তাহার আর তপস্যার প্রয়োজন কি? যাহার অন্তর বাহিরে হরি নাই, তাহার তপস্যায় কি ফল?' কিন্তু সে অন্য কথা—

অনুভাব—এই মায়ার অনুভাবে অর্থাৎ অনুকূল ইচ্ছায়—কৃপায় স্নেহের উপলব্ধিতে জীব মন্বন্তরের আধিপত্য লাভ করিতে পারে। অনুভাব কি? অনু পশ্চাৎ ভূয়ত ইতি অনুভাবঃ। মহামায়া চৈতন্য-ময়ী শক্তিস্বরূপা; সুতরাং দুর্বিজ্ঞেয়া; কিন্তু অনু অর্থাৎ অব্যবহিত পরেই তিনি ভাব আকারে প্রকটিতা হইয়া থাকেন। প্রতিক্ষণে আমাদের অন্তরে যে ভাবরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে, উহাই মহামায়ার অনুভাব। কাম ক্রোধাদি বৃত্তি, রূপ রসাদি বিষয়, দয়া ক্ষমাদি গুণ, এ সকল মহামায়ারই অনুভাব। এই ভাবরাশি মহামায়ারই অঙ্কে সঞ্জাত এবং মহামায়াতেই বিলীন হয়। যখন মা আমার অব্যক্ত অবস্থা হইতে প্রথম ব্যক্ত অবস্থায় আবির্ভূতা হয়েন, তখনই তিনি ভাবের আকারে প্রকটিতা হইয়া পড়েন। ঐ ভাবরাশি ঘনীভূত হইয়াই এই স্থূল জগৎ-আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ভাবের ঘনীভূত অবস্থাই স্থূল। যতক্ষণ মহামায়া অনুভাবের আকারে থাকেন ততক্ষণ উহা মাত্র মানসগ্রাহ্য; উহা ঘন হইলেই স্থূল ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যায়। ভাবই মহামায়ার-অনু অর্থাৎ পশ্চাদবর্ত্তী দ্বিতীয় স্বরূপ। মহামায়ার স্বকীয় নির্ব্বিশেষ স্বরূপটি জীবের নিকট অব্যক্তপ্রায় হইলেও, ভাবময়ী অনুভাব স্বরূপিণী মহামায়া মা প্রতি জীবের নিকট প্রতিমুহূর্ত্তেই প্রকটিতা। তিনি প্রতিক্ষণে আমাদের নিকট ভাবের আকারে প্রকটিতা হইতে-ছেন। ভাবই মা! ভাবে ভাবে ভাবিনী মা আমার সর্ব্বদাই আসিতেছেন; ইহা যদি আমরা বুঝিতাম, তবে যথার্থ মহামায়ার

অনুকূল ইচ্ছা বা মাতৃ-স্নেহ উপলব্ধি করিয়া আত্মহারা হইতে পারিতাম। সাধক! তুমি যাহাকে ভাব বলিয়া কল্পনামাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিতেছ, উহাই যে ভাবিনী অনুভাবরূপিণী মা আমার; ইহা যদি বুঝিতে পার, তাহা হইলে তোমার সাধনমার্গ সুগম হইবে। যদি মহামায়াকে চাও, তবে ভাবে ভাবে অগ্রসর হও। ভাবকে মা বল, ভাবের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দাও, ভাবের চরণে প্রণত হও। ভাব উপেক্ষার জিনিষ নহে; এই জগৎ ভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

এক স্থানে চৈত্র নামক কোন ব্যক্তি তাহার পিতা পুত্র ভৃত্য ও জনৈক কামুক বন্ধু সহ উপবিষ্ট; সম্মুখে একটি সত্যধৃত ব্যাঘ্র শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় শায়িত আছে। এই সময়ে চৈত্রের পত্নী কার্য্যব্যপদেশে তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র চৈত্রের মনে পত্নীভাব, তাহার পিতার মনে পুত্রবধূভাব, পুত্রের মনে মাতৃ-ভাব, ভৃত্যের মনে প্রভুপত্নীভাব, বন্ধুর মনে কামভাব এবং ব্যাঘ্রটির মনে খাদ্যভাব উপস্থিত হইল। একটি নারীমূর্ত্তি এতগুলি বিভিন্ন ভাবের উদ্দীপনা করিয়া দিল। একটু ভাব দেখি ব্যাপারটা কি? বাস্তবিকই এতগুলি ভাব কি নারীমূর্ত্তিতেই ছিল? না—উহা প্রত্যেকের স্বগতভাব।

তোমার পায়ে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইল, তুমি ব্যথা পাইলে। ঐ ভাবটী কোথায় ছিল? কণ্টকে, না তোমারি অন্তরে? এইরূপ বুঝিয়া লও—তুমি আম খাইলে। মিষ্ট রস আমের মধ্যে ছিল, না উহা তোমার অন্তরস্থিত একপ্রকার ভাব বা অনুভূতি। এইরূপ জগতের সর্ব্বত্র। আমরা দিবারাত্র যে জগদ্ভোগ করি, ঐ জগৎ ভাব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই ভাবসমূহ আমাদের অন্তরে অবস্থিত। বাহিরে জগৎ বলিয়া কিছু আছে কি না, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। সর্ব্বত্র একমাত্র পরমপদ অবস্থিত। উহারই অর্থরাশি বা ভাবসমূহ প্রতিনিয়ত আমার অন্তররাজ্যে একটির পর একটি ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার প্রয়োজন শেষ হইলে মিলাইয়া যাইতেছে। ঐ পরমপদই মহামায়া এবং ঐ পদের যাহা অর্থ বা পদার্থ তাহাই ভাব; তাই ইহাকে মহামায়ার অনুভাব বলা যায়। মহামায়া

মহাশক্তিরূপিণী চিন্ময়ী পরা প্রকৃতি মা আমার আমাকে পূর্ণত্বে—ব্রহ্মত্বে উপনীত করিবার জন্য—পরিচ্ছিন্ন বা বিষয়জ্ঞান বা অজ্ঞান হইতে বিশুদ্ধ অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানে উপনীত করিবার জন্য যখন যেভাবে ভাবুক করা প্রয়োজন মনে করেন, তখন সেইরূপ অনুভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম রোগ শোক পরিতাপ ব্যসন হাসি কান্না প্রভৃতি যখন যে ভাবটি আমার পক্ষে অনুকূল—যখন যেভাবে ভাবুক হইলে আমার আধ্যাত্মিক গতি খরতর হইবে, যখন যেভাবে ভাবিত হইলে ভাবাতীতা মহামায়াকে মা বলিয়া সহজে চিনিতে পারিব, মা আমার তখন সেইভাবেই প্রকাশ পান। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়—ঐ ভাবরাশি যেন কোন্ অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতে অপর কাহারও ইচ্ছায় আবির্ভূত হয়, আবার কোন্ অব্যক্ত ক্ষেত্রে অন্তর্হিত হইয়া যায়। উহার আবির্ভাব-তিরোভাব যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ জীবভাবীয় জ্ঞানগণ্ডীর সম্পূর্ণ বাহিরে অবস্থিত। যে সাধক এই ভাবরাশির কেন্দ্র অন্বেষণের জন্য লালায়িত হয়—ভাবে ভাবে মহামায়ার অনুভাব লক্ষ্য করে—ভাবকে মা বলিয়া—আত্মা বলিয়া ভাবের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, সেই সাধক পুত্রই মহামায়াকে চিনিতে পারে।

আমরা দেখিতে পাই,—জগতে অনেক সাধক আপন আপন ইষ্টমূর্ত্তিকে ধ্যান করিতে গিয়া—হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে ইষ্টদেবকে ফুটাইতে যাইয়া, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর যখন দেখিতে পায় যে, ইষ্টমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কোন জাগতিক ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে—শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া ফেলিয়াছে, রাজরাজেশ্বরের আসনে জগতের ধূলি—ধনজন স্ত্রী পুত্র যশ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কোন একটিকে বসাইয়া ফেলিয়াছে, তখনই চমকিয়া উঠে ও একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে করে—"হায়! আমার কিছুই হইল না, মাকে ভাবিতে বসিলেই ছাইভস্ম কত কি ভাবনা পুঞ্জীভূত হইয়া যেন হৃদয়ক্ষেত্র তোলপাড় করিয়া তোলে। আমাদের পক্ষে ভগবৎ লাভ একান্ত অসম্ভব। এত চঞ্চল মন নিয়া কি ভগবানের সাধনা হয়! সাধনা ব্যাপারটি শুধু

সংসারত্যাগী অরণ্যবাসী সাধু মহাপুরুষদের জন্যই; উহা আমাদের মত চঞ্চল সংসারী গৃহস্থ লোকের জন্য নহে।" কিন্তু হায়! যদি সে জানিতে পারিত যে, ঐ চঞ্চলতারূপে—ঐ জগতের ধনজনাদিরূপে মা-ই আসিয়াছেন—ভাবমাত্রেই যে মা, ইহা যদি বুঝিতে পারিত—যদি সে দেখিতে পাইত—ছলনাময়ী রঙ্গপ্রিয়া লীলা-বিলাসিনী মা আমার যতদিন আনন্দ লীলা করিবেন, ততদিন মুহুর্মুহুঃ তাঁহার ভাবময়ী মূর্ত্তি রূপান্তরিত হইবেই, তবে আর হতাশের কারণ কিছুই থাকিত না। ওরে, পুত্র যখন মা বলিয়া ডাকে, পুত্র যখন হৃদয়-সিংহাসনে মাতৃ-চরণ প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হয়, তখন অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেহ নাই যে, সে সিংহাসন স্পর্শ করিতে পারে। পুত্র মা বলিয়া ডাকিলে—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর-প্রমুখ দেবতাবৃন্দ শশব্যস্তে পথ ছাড়িয়া দাঁড়ায়। আর জগতের ভাবরাশি ত কোন্ তুচ্ছ। মা ছাড়া, মায়ের সিংহাসন স্পর্শ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

সাধক! ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত হইয়া যদি দেখিতে পাও, জাগতিক ভাবরাশি আসিয়া তোমার ইষ্টচিন্তায় ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, তবে, সেই ভাবগুলিকে লক্ষ্য করিয়া সত্যপ্রতিষ্ঠা করিও। প্রত্যেক ভাবকে তাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া, উহাকে ছদ্মবেশী ইষ্টমূর্ত্তিজ্ঞানে আদর করিও; উহাকেই মা বলিয়া প্রণাম করিও। ঐ চঞ্চলা ভাবময়ী মায়ের আমার চরণ লক্ষ্য করিয়া তোমার সাধনার শাণিত শরসন্ধান করিও। ভাবচঞ্চলা মা আমার অচিরে স্থির হাস্যময়ীমূর্ত্তিতে প্রকটিতা হইবেন, চিত্ত স্থির হইবে, মাকে পাইবে, তোমার জন্ম-জীবন সার্থক হইবে।

একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি—চিত্ত চঞ্চল বলিয়া সাধনা হইল না, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক কথা। চিত্ত স্থির হইলে ত সাধনার পরিসমাপ্তি হয়! মাকে পাইবার পূর্ব্বে চিত্ত স্থির কাহারও হয় না; হইতে পারে না। মা আসিলে চিত্ত আপনি স্থির হয়—সূর্য্যের উদয় হইলে অন্ধকার আপনি পলায়ন করে। মাতৃ-লাভের পূর্ব্বে কোনরূপ হঠক্রিয়া কিংবা বহিঃ প্রাণায়ামাদিদ্বারা চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, বিশেষ ফল কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না। উহা এক প্রকার

নিদ্রাবিশেষ—জড়-সমাধিমাত্র। বাস্তবিক প্রজ্ঞার উন্মেষ হইলে চিত্ত আপনি স্থির হয়; কোন প্রযত্নের অপেক্ষা করে না। আর যদিই বা তাদৃশ প্রজ্ঞালাভের পূর্ব্বে চিত্ত দৃঢ়ভূমিক হয়, অর্থাৎ বৃত্তিপ্রবাহ যদি কোন একটি বিষয় অবলম্বনে দীর্ঘকাল চলিতে থাকে, তবে সংসারী জীবের পক্ষে উহা মহা-অমঙ্গলই আনয়ন করে। কাম ক্রোধাদির উদ্দীপনা কিংবা শোক-দুঃখাদির আবির্ভাব হইলে, উহারা মানুষকে যতই অভিভূত করুক না কেন, চিত্তের চাঞ্চল্য বশতঃ অচিরকাল মধ্যে আবার তিরোহিত হয়; কিন্তু সাধারণ অবস্থায় চিত্ত স্থিরভূমি হইলে, উহাদিগের উৎপীড়নে মানুষের কি দুর্দ্দশা হইত, একবার ভাব দেখি! তাই ত বলি—চিত্ত-চাঞ্চল্য মায়ের আশীর্ব্বাদ।

সে যাহা হউক, মহামায়ার অনুভাব অথবা অনুভাবরূপিণী মহামায়াই মনুজবৃন্দকে মনুত্বে উপনীত করেন। তখন সাধক এই মনুষ্যদেহে অবস্থান করিয়াই উপনিষদের ঋষির ন্যায় মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকে—"অহং মনুরভবম্ সূর্য্যশ্চ" আমি মনু হইলাম, আমি সূর্য্য হইলাম। ভাবিও না ইহা শব্দের ঝঙ্কার মাত্র। ভাবিও না ইহা ভাষার উচ্ছ্বাসমাত্র। ইহা সম্পূর্ণ সত্য—মনুষ্যের সম্পূর্ণ আয়ত্তযোগ্য। হৃদয়ের অন্তররাজ্যে অহর্নিশ যে ভাবসমূহ একটির পর একটি উঠিতেছে, কু সু বিচার না করিয়া, ক্ষুদ্র মহান্ বিচার না করিয়া, প্রত্যেক ভাবটিকে মা বল। ঐ ভাবগুলি কোথায় মিলাইয়া যায়, সেই স্থানে যাইবার জন্য ঐ ভাবরূপিণী মায়ের চরণ ধরিয়া কাঁদ। কাতর ক্রন্দনে আকুল হও, অশ্রুধারায় হৃদয় প্লাবিত হউক। পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইবে, পুনঃ পুনঃ বিফলতা আসিবে; কিন্তু কাতর প্রার্থনা—মা বলিয়া ডাকা যেন ক্ষান্ত না হয়। ভাবগুলি তোমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে; কিন্তু তুমি বিফলতায় হতাশ হইও না; পুনঃ পুনঃ বিফলতাই সফলতাকে লইয়া আসে। কিছুদিন এরূপ করিতে থাক, দেখিবে—বুঝিতে পারিবে—তুমি মহামায়া মায়ের অঙ্কে নিত্য অবস্থিত। ভাবরূপিণী মা-ই তোমায় ভাবাতীত ক্ষেত্রে লইয়া যাইবেন। যাহা হইতে ভাবরাশির আবির্ভাব

ও তিরোভাব ; উহা সেই স্থান। হায় জীব! কবে তুমি সে মহান্ উদার শান্ত পূর্ণপ্রকাশময় উদাসীন ভাবাতীত মাতৃ-স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইবে! কিন্তু সে অন্য কথা—

এইবার আমরা সংক্ষেপে একবার মন্ত্রের স্থূল মর্ম্ম আলোচনা করিয়া লইতেছি—ব্রহ্মা অবধি ব্যোম পরমাণু পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রই মহামায়ার প্রকাশ। সচ্চিদানন্দময়ী মহামায়ার অভাব কোথাও নাই। তাঁহার অনুভাব অবলম্বনে অগ্রসর হইলে অর্থাৎ জাগতিক ভাবসমূহকে মহামায়া বলিয়া বুঝিতে পারিলে, জীব মন্বন্তরের আধিপত্য লাভ করিতে পারে—শুদ্ধবোধরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। তখন সে বরণীয় ভর্গশক্তির অঙ্কস্থিত আত্মজ বলিয়া আপনাকে উপলব্ধি করে। তাহার মত সৌভাগ্যবান্ জীব আর কে আছে? তাই, মন্ত্রে মহাভাগশব্দ উল্লিখিত হইয়াছে। (মহান্ ভাগঃ বীর্য্যং যস্য স ইতি মহাভাগঃ)। তখন সে অনন্তবীর্য্য ও অমিতবিক্রম হয়। অষ্টম অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধীশ্বর ও অষ্টপাশ-বিমুক্ত হইয়া ভগবৎ-সারূপ্য লাভ করে। সমগ্র মানবমণ্ডলীর বোধশক্তি তাহারই ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়।

এইরূপে চণ্ডীর প্রারম্ভেই মা আমার মহাফলের সূচনা করিয়া—পুত্রদিগের চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশের বল পরিবর্দ্ধিত করিয়া, আত্মহারা হইয়া আকুল স্নেহে আকর্ষণ করিতেছেন। যে এই আকর্ষণের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িবে, সে-ই ধন্য হইবে। অনিচ্ছায়ও তাহাকে যেন অবশ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ মাতৃক্রোড়াভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। অনেক সময় যেরূপ আমরা অনিচ্ছায়ও জগতে এক একটা ভাল কাজ করিয়া ফেলি ; এই মাতৃ আকর্ষণগণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িলেও—সেইরূপ যেন অনিচ্ছায়ই মাতৃমুখী গতি আরম্ভ হয়। মানুষ যখন এই গতি মৃদু মৃদু ভাবে উপলব্ধি করে, তখন হইতেই তাহার অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত হইতে থাকে। নিত্য নবীন উৎসাহে, নিত্য নবীন অনুভূতিতে প্রাণ পরিপূর্ণ হইতে থাকে। তখন জীব পূর্ণ উৎসাহে সাধন-সমরে অবতীর্ণ হয়।

স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং চৈত্রবংশ-সমুদ্ভবঃ।
সুরথো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥৩॥

অনুবাদ। পূর্ব্বকালে স্বারোচিষ্-মন্বন্তরে চৈত্রবংশ-সমুদ্ভূত, সমগ্র ক্ষিতি মণ্ডলের অধিপতি সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রটি চণ্ডীর উপাখ্যানভাগের বীজস্বরূপ। কিরূপ ক্ষেত্রে উপনীত হইলে—কিরূপ আধ্যাত্মিক বল লাভ করিলে সাধক-হৃদয়ে চণ্ডীতত্ত্বের সূচনা হয়, তাহাই এস্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এস প্রিয় সাধক! আমরা মাতৃ-চরণ স্মরণ করিয়া—বিজ্ঞানময় গুরুর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, উপাখ্যানভাগের আধ্যাত্মিক রহস্য অবগত হইতে চেষ্টা করি।

স্বারোচিষেঽন্তরে। স্বর্—স্বর্গ, রোচিস্—দীপ্তি, জ্যোতি। স্বারোচিষ্ শব্দের অর্থ স্বর্গীয় জ্যোতি। অন্তর দেশ দিব্যজ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত হইলেই জীব সুরথ হইতে পারে। সুরথ কে তাহা পরে বলিতেছি। কি উপায়ে অন্তরদেশ স্বারোচিষ্ হয় বা ঈশ্বরীয় জ্যোতি দ্বারা উদ্ভাসিত হয়, প্রথমে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। সাধক যখন জগতের যাবতীয় পদার্থকে স্নেহময়ী মহামায়াজ্ঞানে সরল প্রাণে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হয়, যখন সত্য বলিয়া—মা বলিয়া প্রত্যেক ভাবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মাতৃ-অন্বেষণের লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত করে, যখন ভাবময়ী, নাম ও রূপময়ী মহামায়াকে বুকে ধরিয়া যথার্থ মাতৃ-লাভের সত্য সম্বেদনে জীব উদ্বুদ্ধ হইতে থাকে, সরলপ্রাণ শিশুর ন্যায় মা মা বলিয়া যখন আকুল হইয়া পড়ে, যখন একটু একটু করিয়া প্রাণে প্রাণে মাতৃ-স্নেহ উপলব্ধি করিয়া, কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে গিয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে, তখন সে দেখিতে পায়, তাহার অন্তর রাজ্য স্নিগ্ধ শান্ত নির্ম্মল শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে। কেবল অন্তরে নহে—অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া সে জ্যোতির সাগর উথলিয়া উঠিতেছে। জাগতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব সমূহ মায়ের আমার সে অঙ্গজ্যোতিতে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। সেই অন্তরবাহ্যভেদী

দিগন্তব্যাপি জ্যোতির্মণ্ডলে অবস্থান করিয়া জীব আপনাকে পরম আনন্দময় পুরুষ বলিয়া উপলব্ধি করে। একমাত্র সত্য-প্রতিষ্ঠাই এইরূপ অনুভূতিলাভের সরল অব্যয় পন্থা। যাহারা গুরূপদিষ্ট উপায়ে বুদ্ধিযোগের সাহায্যে সর্ব্বত্র মাতৃ-দর্শনে অভ্যস্ত হয়, অচিরে তাহাদের অন্তর স্বারোচিষ হইয়া থাকে।

যোগশাস্ত্র ইহাকে সুষুম্না-নাড়ীভেদ বলে, তন্ত্র ইহাকে কুল-কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলে, পাতঞ্জল ইহাকে বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী বৃত্তি কহে, আর বেদান্ত ইহাকে চিদাভাস কহে, ইহার প্রত্যেকটি সত্য। যোগিগণ কঠোর যোগচর্য্যায় যে চিদাভাস মাত্র লাভ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়, সন্ন্যাসিগণ কঠোর বৈরাগ্যব্রত অবলম্বনে দুঃসাধ্য নিদিধ্যাসনের ফলে, যে জ্যোতির আভাস দেখিয়া ধন্য হয়, তান্ত্রিকগণ যে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ এক প্রকার কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন, যে সুষুম্না প্রবাহের উন্মেষ করিতে গিয়া রাজযোগিগণ যম নিয়ম আসন প্রাণায়ামাদির অনুশীলন করিয়াই জীবনপাত করিয়া থাকেন, সেই স্বারোচিষত্বলাভ সত্যপ্রতিষ্ঠার সাহায্যে অতি সহজে ও অনায়াসে হইয়া থাকে। ইহাতে কোনরূপ কঠোরতার আবশ্যক হয় না, দৃঢ় সংযমের প্রয়োজন হয় না, সন্ন্যাসের দুঃসাধ্য ত্যাগমার্গের আবশ্যক নাই, জ্ঞানীর নীরস বিচারপূর্ণ গভীর গবেষণার আবশ্যক নাই, কোনরূপ কল কৌশলের প্রয়োজন হয় না, শুধু সরল বিশ্বাসে বৈদিক যুগের ঋষির ন্যায় জগৎময় ব্রহ্মসত্তা দর্শনে অভ্যস্ত হইলেই—মাতৃহারা শিশুর ন্যায় সর্ব্বত্র মাতৃ-দর্শনে অভ্যস্ত হইলেই নির্ম্মল চিদাকাশ উদ্ভাসিত হয়। সেই শুভ্র শান্ত মাতৃ-অঙ্গের জ্যোতি এত প্রত্যক্ষ, এত ঘন যে, তাহার ঘনীভূত সত্তায় জগৎসত্তা বিলুপ্ত-প্রায় হয়। ইহাই যথার্থ কুণ্ডলিনী-জাগরণ। এবং ইহাই যথার্থ সুষুম্না প্রবেশ। মেরু-দণ্ডের মধ্যে একটী সর্প কল্পনা করিলে কুণ্ডলিনীজাগরণ হয় না। মেরুদণ্ড মধ্যে একটী সূক্ষ্ম স্নায়ু কল্পনা করিয়া তাহার মধ্যে কল্পনায় প্রবেশ করিলে সুষুম্না-প্রবাহের উন্মেষ হয় না। বাস্তবিক, এই বিশোকা-জ্যোতি-দর্শনে জীবের সর্ব্ববিধ শোক মোহাদির মূল

উন্মূলিত হয়। তখন জীব প্রকৃত আনন্দের আভাস পাইয়া উন্মত্তের ন্যায়—বংশীলুব্ধ মৃগের ন্যায় পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই জগতে থাকিয়া সাধারণের অদৃশ্য অন্তর্জগতে প্রবেশজনিত পরিতৃপ্তি ভোগ করিতে থাকে। সত্য সত্যই তখন ঘনান্ধকারময়ী নিয়ত পরিবর্ত্তনশীলা জীবন-নিশার সুপ্রভাত হয়। সেই চৈতন্যময় জ্যোতিঃ-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া জীব কৃতার্থ হয়। হায় জীব! কবে তুমি সে জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃ-মূর্ত্তি দর্শনে ধন্য হইবে? কিন্তু সে অন্য কথা—

কেহ বলেন—সর্ব্বদা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির ধ্যান করিলে, অন্তর দিব্য জ্যোতিতে আলোকিত হয়। কেহ বলেন, মন হৃদয়ে উঠিলেই ঈশ্বরীয় জ্যোতিদর্শন হয়। কেহ বলেন—মণিপুরে নাভিপদ্মে সূর্য্যের ধ্যান করিলে, জ্যোতি-দর্শন হয়। ইহার সকল কথাই সত্য। যাঁহারা মাত্র একটি জড়জ্যোতি দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়েন, তাঁহারা উহার কোন না কোন উপায় অবলম্বন করিলেই সফলকাম হইতে পারেন; কিন্তু উহা মুক্তিপ্রদ হইবে কি? প্রজ্ঞা উন্মেষিত না হইলে—জ্যোতি প্রাণময়, চৈতন্যময় না হইলে কি অজ্ঞান দূর হয়? অন্তরে জ্যোতি-দর্শন করিতে হয়; সেই অন্তর জিনিষটা না বুঝিলে যথার্থ স্বারোচিষত্ব-লাভ হয় কি? এই অন্তর দর্শন করিবার শক্তি লাভ হইলে, মানুষের বহুজন্মসঞ্চিত একটি অজ্ঞান বা ধাঁধা তিরোহিত হয়। ঐ অজ্ঞানটি হইতেছে—অন্তর-বাহির ভেদপ্রতীতি। সাধারণতঃ অন্তর বলিলে—দেহ অবধি এই পরিদৃশ্যমান বাহ্য জগতের প্রতি লক্ষ্য হয়; ইহাই একটী মারাত্মক অজ্ঞান। বাস্তবিক, অন্তর বাহির বলিয়া কোন স্থান-ভেদ নাই, বরং 'সকলই অন্তর' ইহা বলা যায়। আমরা যে জগৎ ভোগ করি, উহা আমাদের অন্তরমাত্র। ঐ সুদূরবর্ত্তী আকাশ, ঐ জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহমালা, ঐ বিশাল বারিধি, ঐ সুতুঙ্গ পর্ব্বত, সকলই আমার অন্তর মাত্র। ধন জন স্ত্রী পুত্র সকলই আমার অন্তর মাত্র। এই রক্তমাংসনির্ম্মিত স্থূল দেহ আমারই অন্তর। ওঃ! আমি কি মহান্! এত বড় আমি! এত বিশালতা—এতদূর ব্যাপ্তি আমার—'আ—মা'র চরণে কোটি প্রণাম!

কথাটা আর একটু পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক,— দেহের মধ্যে মন নাই—মনের মধ্যে দেহ আছে। মনেরই কতকটা অংশ ঘনীভূত হইয়া এই স্থূল দেহের আকার ধরিয়াছে। যেমন জলের কতক অংশ জমাট বাঁধিয়া বরফ হয়, ঠিক সেইরূপ। দর্শন-শাস্ত্রেও বলে—মনোময় কোষের মধ্যে প্রাণময় কোষ এবং তাহারই অভ্যন্তরে অন্নময় কোষ বা স্থূল দেহ। উহা শুধু পড়িয়া মুখস্থ রাখিলে বিশেষ কিছুই ফল হয় না; বুঝিতে হয়, অনুভব করিতে হয়, উপলব্ধি করিতে হয়, তবে অজ্ঞান দূর হয়, প্রাণে শান্তি আসে, অমরত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। পূর্ব্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি—ভাবই এই জগৎ। দিবারাত্র আমরা যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করি, ভোগ করি, সকলই ভাবমাত্র। ভাব মনের ধর্ম্ম; সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সকলই আমার মন বা অন্তরমাত্র। একটি ফুল দেখিলে, উহা বস্তুতঃ বাহিরে নাই, তোমারই মন ফুলের আকারে আকারিত হইয়াছে বলিয়া, তোমার পুষ্পদর্শনরূপ ব্যাপারটি সংঘটিত হইল। এইরূপ সর্ব্বত্র। স্ত্রী পুত্রই বল, আর ধন রত্নই বল, কিংবা দূরবর্ত্তী চন্দ্র সূর্য্যই বল, সকলই তোমার অন্তর বা মন মাত্র। বেদান্ত-দর্শনও ঠিক এই কথাই বলেন। বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং প্রমাতৃচৈতন্যের একত্ব দ্বারাই বিষয়জ্ঞান হয়। যাহা হউক, আমরা দার্শনিক ভাষায় অবগাহন করিয়া জিনিষটা কঠোর করিব না। তবে যাঁহারা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে একটি সংশয় হইতে পারে। তাঁহারা বলেন—মনের পরিমাণ অণুমাত্র। এত বড় জগৎটাই যদি মন হয়, তবে তাহার অণুত্ব সিদ্ধ হয় না। কথাটা সত্য,—"অযৌগপদ্যাজ্ জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহোচ্যতে"। এক সময়ে দুইটি জ্ঞান ধরিয়া রাখিতে পারে না বলিয়াই মনকে অণু বলা হয়। বস্তুতঃ মন অণু হইতেও অণু অথচ মহৎ হইতেও মহান্। অণু-পরিমাণ হইলেও উহার বিশালত্ব ব্যাপ্তিত্ব সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ অনুভূত। প্রত্যক্ষ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন।

"এই যাহা কিছু দেখিতেছি, যাহা কিছু ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ

করিতেছি, যাহাকে আমরা বাহির বলিয়া বুঝি, বস্তুতঃ উহা আমারই অন্তরে অবস্থিত। আমারই অন্তররাজ্যে আমি দিবারাত্র বিচরণ করি।” এইরূপ অনুভূতি যতদিন প্রকাশ না পায়, ততদিন জীবের মৃত্যুভয় বিদূরিত হয় না। সাধকগণ ঐরূপ অনুভূতি লাভ করিবার জন্য এই জগৎকে মায়ের অন্তর বলিয়া ধারণা করিতে চেষ্টা করিবেন। ‘এই জগৎ—আমারই অন্তর’ এইরূপ ধারণা করিতে গেলে, প্রথম প্রথম জীবভাবীয় আমিটির স্মরণ হওয়ায়, ‘উহা অসম্ভব’, এইরূপ প্রতীতি হয়; এই জন্য সাধনারাজ্যে ‘আমি’ শব্দের সর্ব্বত্র পরিহার পূর্ব্বক, ‘মা’ শব্দ অথবা ভগবানের যে কোন নাম ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে সাধনমার্গ সুগম হয়।

শ্রুতি আছে—‘যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ’। এ জগৎ মায়ের কল্পনামাত্র। কল্পনা অন্তরেই থাকে, কারণ, উহা মনের ধর্ম্ম; সুতরাং জগৎ দেখিতেছি বলিলেই বুঝিতে হইবে—মায়ের মনটি দেখিতেছি। সূর্য্য সূর্য্য নহে; মায়ের মনের একটি ভাবমাত্র, মা ভাবিতেছেন আমি সূর্য্য। চন্দ্র চন্দ্র নহে; মা ভাবিতেছেন আমি চন্দ্র। বৃক্ষ বৃক্ষ নহে; মা ভাবিতেছেন আমি বৃক্ষ। ভূমি ভূমি নহে; মা ভাবিতেছেন আমি ভূমি। বায়ু বায়ু নহে; মা ভাবিতেছেন আমি বায়ু। কামিনী কামিনী নহে; মা ভাবিতেছেন আমি কামিনী। কাঞ্চন কাঞ্চন নহে; মা ভাবিতেছেন আমি কাঞ্চন। পুত্র পুত্র নহে; মা ভাবিতেছেন আমি পুত্র। এইরূপ সর্ব্বত্র। জগৎটা মায়ের মনের ভাব বা মন। আমাদের মনের ভাবগুলি বড় অল্পক্ষণস্থায়ী; কিন্তু মায়ের মন অসীম ও অনন্তবীর্য্য। তাই, তাঁর ভাবগুলি এত ঘন, এত বেশী সময় স্থায়ী যে, আমরা উহাকে আর ভাব বলিয়া সহসা ধারণা করিতে পারি না। বস্তুতঃ আমরা মায়েরই অন্তরে জন্মগ্রহণ করি, মায়েরই অন্তরে বিচরণ করি, আবার মায়েরই অন্তরে মরিয়া যাই। আমরা সর্ব্বাবস্থায় মায়েরই অন্তরে অবস্থিত। যেরূপ কোন সুসজ্জিত অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বহুবিধ দ্রব্য দেখিয়াও একটি গৃহমাত্রের প্রতীতি হয়; সেইরূপ এই জগতের অসংখ্য ভেদ

অসংখ্য নাম রূপ, অসংখ্য পদার্থ দেখিয়াও, সবগুলি যেন একমাত্র মায়ের অন্তররূপ একখানি গৃহে অবস্থিত রহিয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইরূপ ধারণার ফলে বহুত্ববুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি ধীরে ধীরে একত্বের দিকে অগ্রসর হয় এবং অন্তর বলিয়া জিনিষটা ঠিক বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে যে মহামায়ার অনুভাব কথাটি বলা হইয়াছে, তাহা এই অন্তরজ্ঞানসাপেক্ষ।

এখানে আর একটি রহস্য আছে,—যে যাহার অন্তর' সে তাহার আশ্রিত। এই জগৎ মায়ের অন্তর; সুতরাং মায়ের আশ্রিত। আমরা মায়ের অন্তর; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে মায়ের আশ্রিত। মা আশ্রয়—একমাত্র আশ্রয়—একান্ত আশ্রয়। এইরূপ আশ্রয়-আশ্রিত ভাব সাধনাপথের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। আমরা অনেক সময় মনে করি, ভগবান্‌কে না পাইলে—মাকে না দেখিলে, আমাদের কি ক্ষতি আছে; ভগবান্ ব্যতীতও আমাদের ত বেশ চলিয়া যাইতেছে। উহা আমাদের অজ্ঞানতামাত্র। বৃক্ষস্থিত ফল যদি মনে করে,—বৃক্ষ না থাকিলে আমার কি ক্ষতি আছে, বায়ু যদি মনে করে,—আকাশ না থাকিলে আমার কি ক্ষতি আছে, জল যদি মনে করে,—মৃত্তিকা না থাকিলে আমার কি ক্ষতি আছে, দেহ যদি মনে করে,—প্রাণ না থাকিলে আমার কি ক্ষতি আছে; তাহা হইলে এইরূপ মনে করাকে যেমন অজ্ঞান-মূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়, ঠিক সেইরূপ যাহারা ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া আপন-অস্তিত্ব উদ্বুদ্ধ রাখিতে সচেষ্ট, তাহাদিগকে অজ্ঞান শিশু ব্যতীত অধিক আর কি বলা যাইতে পারে। অন্তর বাহির ভেদজ্ঞান দূরীভূত হইলে, সর্ব্বত্র আমারই অন্তর—এইরূপ অনুভূতি লাভ করিলে, এই আশ্রয়-আশ্রিত-জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী।

যাহা হউক, যখন অন্তরদেশ সর্ব্বত্র স্বর্গীয় জ্যোতিতে—মায়ের লাবণ্যময়ী অঙ্গপ্রভায় সমুদ্ভাসিত বলিয়া প্রতীতি হয়, তখনই অন্তর স্বারোচিষ হয়, তখনই জীব সুরথ নামে সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের অধিপতি হয়। সুরথ এইরূপ স্বারোচিষ-অন্তর-বিশিষ্ট সাধক—জীবাত্মা। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি দেহন্তু

রথমেব চ।" আত্মা—রথী ; এবং দেহ—রথ। জীবাত্মার এই দেহ-রথখানি যখন সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়, তখনই জীব সুরথ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যতদিন এই স্বারোচিষত্ব-লাভ না হয় ; যতদিন স্বর্গীয় জ্যোতিতে হৃদয় আলোকিত না হয় ; যতদিন জীব মহামায়ার জগন্মুর্ত্তি বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিতে না পারে ; যতদিন পূর্ণ অস্তিত্ব জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে অজ্ঞানান্ধ জীবের হৃদয়রাজ্য উদ্ভাসিত না হয় ; ততদিন জীব সুরথ হইতে পারে না। সুরথ না হইতে পারিলে মনু হইবার আশা থাকে না। কি ভাবে মা তাঁহার স্নেহের সন্তান জীবগণকে এই সুরথ-স্বরূপে সমানীত করেন, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বলিলেন—"চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ।" (চিত্র+ষ্ণ=চৈত্র)। বিচিত্র নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া—জড় পরমাণু হইতে ক্রমে গুল্ম লতা বৃক্ষ কীট পতঙ্গ পক্ষী পশু বন্য অসভ্য অর্দ্ধসভ্য প্রভৃতি অসংখ্য যোনি, অসংখ্য বংশ ভ্রমণ করিয়া জীব সুরথ হয়—মানুষ হয়।

মহামায়া মা আমার জীব-সন্তানকে স্নেহময় অঙ্কে ধারণ করিয়া এইরূপ অসংখ্য চিত্র-বিচিত্র বংশের ভিতর দিয়া, যখন শ্রেষ্ঠবংশ মানবকুলে আনিয়া উপস্থিত করেন ; যখন মানুষ সম্যক্ জ্ঞানের সমীপবর্ত্তী হয় ; যখন অসংখ্য জন্মমৃত্যুর ঘাতপ্রতিঘাতে ত্রিবিধ দুঃখে পুনঃ পুনঃ প্রতিহত হইয়া মাতৃ-অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হয় ; যখন আধ্যাত্মিকাদি দুঃখত্রয়ের একান্ত নিবৃত্তি এবং অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায়-বিষয়ক যথার্থ জিজ্ঞাসা আরম্ভ হয় তখনই জীব সুরথ হয়। পক্ষান্তরে, জীব যতদিন ভগবৎসত্তায় বিশ্বাসবান্ হইতে না পারে—যতদিন এই জগন্মূর্ত্তিকে মহামায়া বলিয়া বুঝিতে না পারে ; ততদিন তাহার দেহ রথমাত্র থাকে ; সুরথ হয় না।

মানব! একবার স্বকীয় অতীত জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। দেখ—যেদিন তুমি প্রথম আনন্দের উচ্ছ্বাসে ক্ষুদ্রত্বের অভিনয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, যেদিন তুমি অসীম আনন্দময় একত্ব হইতে বহুত্বের আনন্দে লুব্ধ হইয়াছিলে, সেই দিন—সেই মুহূর্ত্ত হইতে মহামায়া মা

তোমার প্রকৃতিরূপে অবস্থান করিয়া, তোমাকে বক্ষে ধরিয়া, বিচিত্র নানা যোনিসম্ভূত বিভিন্ন লীলা সম্পাদন করাইয়া, জীবশ্রেষ্ঠ মানবকুলে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। তোমাকে সুরথ করিবেন বলিয়া—তোমার দেহরথখানি সর্ব্বেন্দ্রিয়-সামঞ্জস্যপূর্ণ অসীম জ্ঞানের আধার করিবেন বলিয়া, প্রতিমুহূর্ত্তে গতিরূপে উন্মাদিনীর ন্যায় তোমাকে অঙ্কে ধরিয়া ছুটিয়াছেন। যতদিন তুমি তির্য্যক্‌জাতিতে প্রবৃত্তিমাত্র-পরিচালিত হইয়া অগ্রসর হইতেছিলে, ততদিন মাকে চিনিতে পার নাই, ক্ষতি নাই। এখন মা তোমাকে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয় হস্তদ্বারা আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তোমার দেহরথখানি সুসজ্জিত করিয়াছেন, অন্নময় কোষের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, তুমি সুরথ হইয়াছ! সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছ—জড়ের উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকার পাইয়াছ, এখনও মাকে ভুলিয়া থাকিবে? এখনও মাকে দেখিবে না?

যিনি আমাকে জড় পরমাণু হইতে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশক্ষেত্রে মানবকুলে উপনীত করিয়াছেন, যিনি আমার অন্তরদেশ স্বারোচিষ করিয়া দিয়াছেন, যাঁহার স্বর্গীয় অঙ্গজ্যোতিতে আমার হৃদয়রাজ্য আলোকিত হইয়াছে, পাছে আমার অহং-কর্ত্তৃত্বাভিমানে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে; তাই, যিনি আমার সকল কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিয়াও, তাঁহার নিজ কর্ত্তৃত্ব আমার নিকট লুক্কায়িত রাখিতেছেন; যিনি অন্তরাল হইতে অসীম স্নেহ-প্রকাশে ধন্য করিতেছেন অথচ আমি ভালবাসিতে গেলেই অন্তর্হিত হন; হায়! একদিনের জন্যও তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারিলাম না! একদিনের জন্যও সরলতাপূর্ণ হৃদয়ে পুত্রের মত তাঁহার স্নেহ, তাঁহার আদর অনুভব করিতে পারিলাম না! যিনি আমার জন্মমরণের সাথী, যিনি আমার সুখদুঃখের সখা, যিনি আমার অনন্তযাত্রার অদ্বিতীয় সহচর, যিনি আমার দেহরথের একমাত্র সারথি, যাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় আমরা মানুষ হইয়াছি, সুরথ হইয়াছি, সেই স্নেহময়ী মহামায়া মায়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া একটিমাত্র কৃতজ্ঞতার দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ

করিতে পারিলাম না। ধিক্ আমাদের মানবজীবনে! ধিক্ আমাদের কৃতঘ্নতায়! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ত দূরের কথা! যিনি ছাড়া আর কিছুই নাই, যাঁহার অস্তিত্বে আমার অস্তিত্ব, তাঁহার অস্তিত্বে আজ পর্য্যন্ত সম্যক্ বিশ্বাসবান্ হইতে পারিলাম না! সরল প্রাণে তাঁহার সত্তা চাহিয়া দেখিলাম না! হায়! তবু মা আমায় কত আদর, কত স্নেহ করেন! জানি, তিনি যে মা, তিনি তাঁহার অনুপম স্নেহের প্রতিদান-আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁহার কার্য্য—স্নেহস্তন্যদান। তাহা তিনি প্রতিনিয়ত করিতেছেন, করিবেন। আমি কৃতঘ্ন, আমি অকৃতজ্ঞ সন্তান বলিয়া, তিনি আমায় ঘৃণার চক্ষুতে দেখিতে পারেন না, বরং অমৃতময় সঞ্জীবনী ধারায় সর্ব্বদাই অভিষিক্ত করিতেছেন, করিবেন। হায়! এ স্নেহ, এ মাতৃত্ব কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়! কিন্তু সে অন্য কথা—

যাহা হউক, জীব যখন চৈত্রবংশ সমুদ্ভূত হয়, অর্থাৎ বিচিত্র নানা যোনি—নানা বংশ ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যকুলে অবতীর্ণ হয়, যখন অন্তররাজ্য স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়—জ্ঞানের নির্ম্মল আলোকে আলোকিত হয়, তখন জীব সুরথ হইয়া থাকে; এবং সুরথ হইলেই সমস্ত ক্ষিতিমণ্ডলের অধিপতি হয়। ক্ষিতিমণ্ডল-শব্দে পার্থিব বস্তুসমূহ বুঝা যায়। সুরথ হইলেই পার্থিব পদার্থের উপর আধিপত্য করিবার ক্ষমতা জন্মে। অন্নময় কোষ বা স্থূল দেহ তখন অনন্ত জ্ঞানবিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়। সকল ইন্দ্রিয় সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, বুদ্ধির বিকাশ-কেন্দ্র উন্মেষিত হয়, স্থূল সূক্ষ্মের ভেদ প্রতীতিযোগ্য হয়, সর্ব্ব প্রধান কথা—ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়।

এস্থলে সাধনার আভাস দিয়া রাখিতেছি—ক্ষিতিমণ্ডল-শব্দের অর্থ মূলাধার-চক্র। গাঢ় রক্তবর্ণ ত্রিপুরক্ষেত্রের বহির্দেশে অষ্টশূলে আবৃত চতুষ্কোণ ধরা বা ক্ষিতিমণ্ডল অবস্থিত। ইহা অব্যক্তা প্রকৃতির চরম পরিণতি। গন্ধ ইহার তত্ত্ব। মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে ইহার স্থান। ঐ চক্রের মধ্যভাগে 'লং' এই ক্ষিতিবীজ অবস্থিত, মন্ত্রচৈতন্য করিয়া গুরূপদিষ্ট উপায়ে উক্ত বীজের ধ্যান করিলে অথব ঐ কেন্দ্রে

সত্যপ্রতিষ্ঠা এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলে, বিশিষ্ট বিশিষ্ট দর্শন বা অনুভূতি লাভ হয়। কিছুদিন এইরূপ অভ্যাসের ফলে ইচ্ছা মাত্র মনকে এই ক্ষিতিমণ্ডলে লইয়া গিয়া নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়। যোগে আরোহণকারী সাধকগণের প্রথম প্রথম যে 'অঙ্গমেজয়ত্ব' বা অঙ্গবিক্ষেপ স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়, তাহা এই মূলাধারের বিশিষ্ট ক্রিয়ায় দূরীভূত হয়। পার্থিব দেহ স্থিরভাবে অবস্থান করে। এতদ্ভিন্ন তুই একটি সিদ্ধিও লাভ হয়। ইহাই ক্ষিতিমণ্ডলের আধিপত্য।

তস্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥৪॥

অনুবাদ। তিনি ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রজাবৃন্দকে পালন করিতেন। কিন্তু তাহারাই তাঁহার শত্রু হইয়া, স্বাধীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক কোলা নামক রাজধানী বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা। প্রকর্ষেণ জায়ন্তে আবির্ভবন্তি বা ইতি প্রজাঃ ভাবাঃ। প্রজা শব্দের অর্থ—বৃত্তি বা ভাব। নানাবিধ যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব যখন সুরথ হয়, যখন পার্থিব দেহ বা স্থূল পদার্থসমূহের উপর আধিপত্য লাভ করে, অর্থাৎ যখন জীবভাবীয় অহংজ্ঞানের শেষ সীমায় উপনীত হয়, তখন সে সমুদয় মনোবৃত্তি বা ভাবসমূহকে ঔরস পুত্রের ন্যায় আত্মজবোধে প্রতিপালন করিতে থাকে। কি অন্তরে কি বাহিরে যত রকম ভাব ফুটিয়া উঠে 'সবই ত' আমার ভাব, 'সবই ত' আমার আত্মজ, 'সবই ত' আমা হইতে উদ্ভূত ; সুতরাং ইহাদিগকে আমারই পোষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য" এইরূপ কর্ত্তব্যবোধে পুরুষকারের—অহংকারের সুদৃঢ় কার্ম্মুকহস্তে, ভাববৃন্দের পরিপোষণে যত্নবান্ হয় ; কারণ জীব তখনও বুঝিতে পারে না যে, ভাবমাত্রই মহামায়ার অনুভাব। যখন বুঝিতে পারিবে, তখন ত' সে মনু হইবে।

সাধারণতঃ এই ভাবসমষ্টির নামই আমি। যেরূপ বৃক্ষ বলিলে—

তাহার শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প ফল ও তদধিষ্ঠিত পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত নিয়া একটি বৃক্ষ বুঝায়, সেইরূপ আমি বলিলে—আমিত্বের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু দাঁড়ায়, সে সকলই ভাবমাত্র। সাধারণতঃ আমি বলিলে—অনাদিজন্মসঞ্চিত সংস্কাররাশিবিশিষ্ট একটি আমিকে বুঝিতে পারি। প্রথমতঃ মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, সপ্তধাতুবিশিষ্ট স্থূল দেহ, অতঃপর—স্ত্রী পুত্র ধন বিদ্যা যশ ইত্যাদি, তারপর—সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য দয়া ক্ষমা হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি; এরূপ যত কিছু সবই যেন আমার সহিত জড়াইয়া গিয়াছে, অথবা এখন আমরা এই সকলকেই আমি বলিয়া বুঝিয়া থাকি। এই সকল ভাব পরিত্যাগ করিলেও যে "আমি" থাকিতে পারে, ইহা আমরা প্রথমতঃ বুঝিতেই পারি না; সুতরাং 'আমি'র তৃপ্তিবিধান করিতে গিয়া ভাববৃন্দের পরিপোষণ করিয়া থাকি। ইহাই সুরথের ঔরস পুত্রের ন্যায় অর্থাৎ অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন।

ঔরস পুত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। উরস্ শব্দের অর্থ বক্ষঃস্থল অর্থাৎ হৃদয়। হৃদয় হইতে—আত্মা হইতে সঞ্জাত হয় বলিয়াই পুত্রকে ঔরস বলা হয়। আত্মার—পরম প্রেমাস্পদ প্রিয়তমের অংশ বলিয়াই জগতের সর্ব্ববস্তু অপেক্ষা আত্মজ এত প্রিয় হয়। জাগতিক ভাবসমূহও ঠিক এইরূপ প্রিয়তমের সহিত—আত্মার সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া পড়ে; তাই, বাধ্য হইয়াই ইহাদিগকে ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে হয়; কিন্তু অবশেষে ইহারাই শত্রু হইয়া পড়ে। কিরূপে আমরা ভাবসমূহের পরিপোষণ করি, এবং কিরূপে ইহারা শত্রু হয়, তাহা আর একটু খুলিয়া বলিতেছি—দেখ, অধিকাংশ মানুষই স্ত্রী পুত্র ধন যশ এবং দেহাদির পরিপোষণে বিব্রত। (ঐগুলিও যে ভাবমাত্র, তাহা পূর্ব্বে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে) উহাদের জন্য জীব আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়। "কিরূপে আমার পরিজন সুখে থাকিবে, কিরূপে আমার প্রচুর ধন হইবে, কিরূপে আমার দেহটি সুন্দর ও সুস্থ হইবে, কিরূপে আমি যশস্বী হইব, কিরূপে আমি জগতের উপকার করিব," ইত্যাদি ভাবরাশিকে

বহু দিবস ধরিয়া পরিপুষ্ট করিয়াও যখন প্রাণের যথার্থ পরিতৃপ্তি হয় না, তখন দেখিতে পায়,—সেইদিন জীবজীবনের প্রথম শুভদিন—যেদিন দেখিতে পায়,—আমি যাহাদের পরিপোষণে নিয়ত বিব্রত, বস্তুতঃ তাহারা আমার আত্মীয় নহে—শত্রু। এবং তাহারাই ত দেখিতেছি 'ভূপ:' অর্থাৎ রাজা হইয়া বসিয়াছে; কারণ এখন ত' ভাবসমূহদ্বারাই আমি পরিচালিত হইতেছি। তাহাদের ইঙ্গিতে—তাহাদের ইচ্ছায় আমি চলিতেছি, তাহাদের আদেশ ব্যতীত আমার একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এইরূপে যত চক্ষু খুলিতে থাকে ততই দেখিতে পায়, কি সর্ব্বনাশ! ভাবসমূহ যে আমাকে আত্মরাজ্য হইতে বিচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি ভাবের প্রতিপালক—রাজা ছিলাম। এখন দেখিতেছি ভাবসমূহই আমার রাজা। উহারা কোলানামক রাজধানীতে—চিত্তক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, সমূলে বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হায়! যে প্রজাবৃন্দের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য আমি সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলাম, প্রাণপাত করিয়াও যাহাদের তৃপ্তিসাধনে রত থাকিতাম, যে জাগতিক ভাবরাশিকে পূর্ণত্বে উপনীত করিবার জন্য জীবন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছি, এখন তাহারাই আমার শত্রু! এখন তাহারাই আমার পরিচালক।

প্রভাত অবধি সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে পুনঃ প্রভাত পর্য্যন্ত এইরূপ আমরা ভাবরাশিদ্বারা পরিচালিত হইতেছি। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা প্রভৃতি দৈহিক, স্ত্রী পুত্রাদি সাংসারিক, ধন যশঃ প্রভৃতি জাগতিক এবং দয়া ক্ষমা সন্ধ্যা বন্দনা উপাসনা প্রভৃতি পারমার্থিক ভাবরাশি প্রতিনিয়ত আমাদিগকে বিচঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে। এ অবস্থাটি যাহার চক্ষুতে পড়ে, যে এই চিরপরাধীনতা প্রত্যক্ষ করে, সে কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? এই ভাবচাঞ্চল্য বা প্রজাবর্গের বিরোধিতা গুরুকৃপায় যাহার হৃদয়ে বিষজ্বালা বিস্তার করে, সেই প্রকৃত বিষাদযোগী। গীতার বিষাদযোগ দেবী মাহাত্ম্যে চরমে উপস্থিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্লোকে ইহা পরিব্যক্ত হইবে।

জীব! একবার চাহিয়া দেখ—তোমার চারিদিকে দশদিকে,

অন্তরে বাহিরে, একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ কর। তোমার সংসারসংস্কারশ্রেণী তোমায় কিভাবে পরিচালিত করিতেছে! কিভাবে তোমাকে দিবারাত্র গর্দ্দভের মতন ভার বহন করাইতেছে! তোমারই যত্নে, তোমারই আদরে প্রতিপালিত—পরিপুষ্ট, তোমারই স্বেচ্ছাকৃত অকিঞ্চিৎকর বিষয়বাসনা, তোমার আনন্দলীলার সহচর স্ত্রী পুত্রাদি, তোমায় কিরূপভাবে আয়ত্ত—শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। তোমায় উঠিতে বলিলে উঠিতে হয়, বসিতে বলিলে বসিতে হয়, মরিতে বলিলে মরিতে হয়, এমনি তুমি ভাবের অধীন হইয়া পড়িয়াছ। এই অবস্থাটি বেশ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। হও না কেন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, হও না কেন পার্থিব সর্ব্ববিধ সুখে সুখী, তুমি একবার আপনার চিত্তক্ষেত্রের—স্বীয় রাজধানীর দুরবস্থা দেখ—একটীর পর একটি ভাব আসিয়া বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সাগর-তরঙ্গের ন্যায় তোমার শান্তির উপকূলকে নিয়ত আহত করিতেছে। বড় আদরে—বড় সোহাগে প্রিয়তম শিশু পুত্রকে বুকে ধরিয়া চুম্বন দিতেছ, স্নেহের অমিয়ধারায় আত্মহারা হইতেছ, কিন্তু ঐ এক মুহূর্ত্তেই আবার অন্য ভাব আসিয়া তোমার চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিল, তোমাকে সে আনন্দ হইতে বিচ্যুত করিয়া দিল। আহার করিতে বসিলে—ভাল, তাই কর! জগতের সর্ব্বপ্রধান ভোগ—আহার। মা তোমায় খাইবার সুযোগ দিয়াছেন, নানাবিধ ভোজ্যসম্ভার তোমার সম্মুখে, উদরেও তীব্র ক্ষুধা, বেশ স্থির হইয়া আহারজনিত তৃপ্তি ভোগ কর; কিন্তু হায়! তাহাও ত' পার না, দুইবার মুখে না দিতে, কত চিন্তা, কত ব্যস্ততা, কত উৎকণ্ঠা আসিয়া তোমার ভোগের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, তখন আর আহার নাই, তৃপ্তি নাই, একটা নিত্য অভ্যস্ত কাজ করিতে হয়, তাই কর। এইরূপ সর্ব্বত্র—একটি পূর্ণ হইতে না হইতে আর একটী আসিয়া উপস্থিত। ভাবরাশি প্রতিক্ষণে আমাদের কাণে ধরিয়া ওঠ্ বস্ করাইতেছে, কাণ ছিঁড়িয়া গেল—ক্ষতি নাই, তাহাদের আদেশ পালন করিতেই হইবে। না পারি উঠিতে, না পারি বসিতে। উঠিতে উঠিতেই বসিবার হুকুম,

আবার বসিবার উদ্যোগ করিতেই উঠিবার হুকুম ; ইহা অপেক্ষা জীবের আর কি দুরবস্থা হইতে পারে ?

আচ্ছা, দেখা যাউক—যাহারা এইরূপ করিয়া আমার স্থিরত্বের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, যাহারা আমার নিত্য শান্তিলাভের পথে অন্তরায়, তাহাদের সহিত আমার কি সম্বন্ধ ? অহো ! এ যে রাজা-প্রজা সম্বন্ধ ! আমিই ত' রাজা, আমিই ত' প্রতিপালক। আর আজ তাহারাই আমার শত্রবো ভূপাঃ। কেবল শত্রু ও স্বাধীন হইয়াই নিরস্ত হয় নাই, আমার রাজধানী কোলা-নগরী অর্থাৎ চিত্তক্ষেত্রটী পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত করিতেছে। হায় ! সুরথের কি দুর্দ্দশা ! সাধক ! যদি সুরথ হইয়া থাক, তবে তুমিও এইরূপ প্রজাবৃন্দের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইতেছ, সন্দেহ নাই।

তস্য তৈরভবদ্ যুদ্ধমতিপ্রবলদণ্ডিনঃ।
ন্যূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্জিতঃ ॥৫॥

অনুবাদ। তখন অতিপ্রবল দণ্ডধারী রাজা সুরথের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। সুরথ অপেক্ষা হীনবল হইলেও কোলাবিধ্বংসিগণ কর্ত্তৃক এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন।

ব্যাখ্যা। জীব যখন ভাবরাশিদ্বারা স্বকীয় চরণ পূর্ণভাবে শৃঙ্খলিত দেখিতে পায়, তখন স্বাধীনতা লাভের জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে। ভাববৃন্দের অত্যাচার হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিব, এই চিন্তা প্রবলভাবে আসিতে থাকে। তখন সে একবার উভয় পক্ষের বলাবল নিরূপণ করিতে প্রয়াস পায়। প্রথমতঃ আত্মবল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আপনাকে অতি প্রবল দণ্ডধারী বলিয়া মনে হয় ; কারণ প্রজাবৃন্দ বা ভাবরাশি ত' আমার ইচ্ছায় সঞ্জাত, আমারই যত্নে পরিপুষ্ট, আমারই বলে বলীয়ান্ ! আমি যদি ইহাদের

বিরুদ্ধে দাঁড়াই, আমি যদি ইহাদিগকে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করি অর্থাৎ চিত্তক্ষেত্র হইতে ভাবরাশিকে বহিষ্কৃত করিয়া দেই, অথবা বৃত্তিসমূহের নিরোধপূর্ব্বক, ভাববিকাশের সুযোগ না দিয়া একেবারে উন্মূলিত করিয়া ফেলি; তাহা হইলে অল্পায়াসেই ত' আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। তারপর, বিপক্ষের বল পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া দেখিতে পায়, ভাবপক্ষ আমা-অপেক্ষা ন্যূন—হীনবল; কারণ আমারই সত্তায় সত্তাবান্, উহারা আমাকে যেরূপ পরিচালিত করে, আমি ইচ্ছা করিয়াই ত' সেইরূপ আচরণ করি। আমি যদি উহাদিগকে সে সুযোগ না দেই, তবে আর ভাবপক্ষের প্রবলতা কোথায় থাকে? এইরূপে উভয় পক্ষের বল পর্য্যালোচনা করিয়া যখন আত্মপক্ষ প্রবল এবং বিরুদ্ধপক্ষ দুর্ব্বল দেখিতে পায়, তখন বিপুল আয়োজনে সমর উদ্যম হইতে থাকে। নানারূপ যোগ, হঠক্রিয়া, জ্যোতির্ধারণা, নিরামিষাহার, ব্রহ্মচর্য্য, সংসারত্যাগ, সন্ন্যাস-অবলম্বন ইত্যাদি কত কি আয়োজন উদ্যোগে ভাববৃন্দকে নির্ম্মূল করিতে উদ্যত হয়; সকলই প্রায় বৃথা হয়। হায়! মুগ্ধ জীব তখনও বুঝিতে পারে না যে, ভাবরাশি মহামায়ারই অনুভাবমাত্র; মহামায়ার কৃপা ব্যতীত এই ভীষণ ভাব-সমরে বিজয়ী হওয়া যায় না।

আমিও একদিন এইরূপ আয়োজনে ভাব-সমরে বিজয়ী হইয়া, আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। কত চেষ্টা, কত উদ্যম, কত কি; কিন্তু সকলই নিষ্ফলপ্রায়। একবার মনে হয়—এইবার আমি ভাব-সমরে জয়ী হইলাম। আহা! পরক্ষণেই দেখিতে পাই—ভাববৃন্দকর্তৃক আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত। এই ভাবচাঞ্চল্য যে কি ভীষণ কষ্ট-শত্রু, তাহা যিনি অনুভব করিয়াছেন, মাত্র তিনি বুঝিতে পারেন। তাহা অন্যকে ভাষায় ঠিক বুঝান যায় না।

স্বকীয়জীবনের একটি ঘটনা সংক্ষেপে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তখন সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে। অধ্যয়ন-কাণ্ড শেষ করিয়া, অর্থোপার্জ্জন আরম্ভ করিয়া উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি। একদিন গভীর রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া দেখি—নবোঢ়া বধূ নিদ্রিতা।

তখনই স্বকীয় বন্ধনদশা-বিষয়ক একটু গভীর চিন্তা আসিল। জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম, কি তন্দ্রাগ্রস্ত হইলাম, কি জাগিয়া ছিলাম জানি না। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম—সম্মুখে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃ-মূর্ত্তি, ঈষৎ হাস্য-বিকশিতমুখে দণ্ডায়মানা। তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন—'দেখেছিস্ তোকে কেমন করে বেঁধে ফেলেছি'। সে হাসি ও কণ্ঠস্বর স্নেহকরুণাব্যঞ্জক, অথচ বিদ্রূপাত্মক। আমি দেখিলাম সত্য সত্যই আমি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, সে বন্ধনের অবস্থা কি ভীষণ! পদদ্বয়, জানুদ্বয়, কটিদেশ, উদর বক্ষ কণ্ঠ হস্তদ্বয় বাহুদ্বয় এবং মস্তক, প্রত্যেক অবয়ব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দৃঢ় রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ। শুধু তাহা নহে—সেই রজ্জু-সমূহের প্রত্যেক অপরপ্রান্ত দৃঢ় কীলকে আবদ্ধ হইয়া গভীরভাবে মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত। আমার একটুও নড়িবার উপায় নাই, কোনও অঙ্গ বিন্দুমাত্র সঞ্চালিত করিবার শক্তি নাই। এমনই ভাবে আমি আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আমার এরূপ অবস্থায়ও কিন্তু কোনরূপ ভীতি বা যন্ত্রণা উপস্থিত হয় নাই বরং একটু একটু হাসিতেছিলাম; কারণ, সম্মুখে করুণাময়ী দেবীমূর্ত্তি-দর্শনে এমন একটা আনন্দ হইয়াছিল যে, বন্ধন-যন্ত্রণাই বোধগম্য হইতেছিল না। আবার সেই কণ্ঠস্বর, সেই স্নেহ করুণা বিদ্রূপমাখা কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল—"দেখেছিস্ তোকে কেমন করে বেঁধে ফেলেছি"। আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—'হাঁ দেখেছি; কিন্তু এ আর বেশী বন্ধন কি! ইচ্ছা করিলে এখনই ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি'। সত্যই যেন আমার মনে হইতেছিল—আমি ইচ্ছা করিয়া বন্ধন লইয়াছি, একবার বল-প্রয়োগ করিলেই ইহা ছিন্ন করিতে পারি। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"ইঃএত ক্ষমতা! ছেঁড়ত' দেখি! আমি যদি ছিঁড়িয়া না দেই, তবে কিছুতেই পারিবে না"। আমি আবার বলিলাম—'এ আর বেশী কথা কি! এই দেখ—এখনই সব বাঁধন ছিঁড়িতেছি।' এই বলিয়া যেই মাত্র বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলাম, অমনি আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, শ্বাস বন্ধ হইয়া গেল। বন্ধন আরও সুদৃঢ় হইল, অব্যক্ত

যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম; বড় ভয় হইল। কাতরতাব্যঞ্জক গোঁ গোঁ শব্দ এত অধিক হইতে লাগিল যে, পার্শ্বস্থিত গৃহে নিদ্রিতা মাতাঠাকুরাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ধরিলেন। তখন আর কিছুই নাই, দেবীমূর্ত্তি হাসিতে হাসিতে অদৃশ্য হইলেন, বন্ধনের চিহ্নমাত্র নাই; কিন্তু ভয়ে ও যাতনায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল! অনেকক্ষণ পরে সুস্থ হইলাম।

এইরূপই হয়—আমরা প্রথমে আত্মবলের প্রাধান্য দেখিয়া অহংকর্ত্তৃত্বের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া ভাবরাশির সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করিতে উদ্যত হই; কিন্তু তখনও বুঝি না যে, ভাবিনী মা আমার স্বয়ং অসিহস্তে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ না হইলে, এই ভাবাসুরনিকর বিধ্বস্ত হয় না। যতদিন রোগ শোক দারিদ্র্য অত্যাচার উৎপীড়ন বিষয়চাঞ্চল্য জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভাবরাশির দিকে সাধকের দৃষ্টি থাকে, সাধক যতদিন সমুদ্র না দেখিয়া তরঙ্গশ্রেণীমাত্র নিরীক্ষণ করে, যতদিন ভাবিনীকে না দেখিয়া ভাবমাত্র দর্শন করে, ততদিন মা আমার ইচ্ছা করিয়াই এই ভাববিদ্রোহ উপস্থিত করাইয়া থাকেন। ভাব-রাজ্যে এরূপ বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বালিত না করিলে যে জীব চিরদিন ক্ষুদ্রত্বে—জগতের ধূলিতে মুগ্ধ থাকিত, আত্মশক্তি আত্মরাজ্য আত্ম-মহত্ত্ব অমৃতত্ব বিস্মৃত হইত। মহামায়া মা পুত্রকে কখনই অপূর্ণ থাকিতে দিবেন না, তিনি শুধু অপেক্ষায় আছেন—কিরূপে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছাগুলির মধ্য দিয়া—এই পরিচ্ছিন্ন ভাবাধীনতার মধ্য দিয়া তাঁহার মহতী আকর্ষণী শক্তি প্রবাহিত করিবেন। কি করিলে আমি সত্য সত্যই সরলপ্রাণ শিশুর মত মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিব। কিরূপে আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে—মুক্তির হিরণ্ময় মন্দিরে স্থান দিবেন, তাই ভাবরূপিণী মা আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্পষ্ট-ভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন—আমার হস্ত পদ অজস্র শৃঙ্খলাবদ্ধ। ইহা প্রজাবিদ্রোহ নহে—মায়ের মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছার পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রূর আয়োজনমাত্র।

মা সুরথকে—আমাদিগকে বিশেষ ভাবে ধরিয়া ধরিয়া বুঝাইয়া

দেন,—আমরা কিরূপ দুশ্ছেদ্য নিগড়ে চির আবদ্ধ রহিয়াছি। নিজেদের অস্বতন্ত্রতার যে পরিমাণে বোধ হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে আমরা জীবত্ব হইতে মুক্ত হইবার জন্য—স্বাধীন হইবার জন্য লালায়িত হইব। এ জগতে পূর্ণ স্বাধীনতা অসম্ভব। এমন আত্মীয়, এমন বন্ধু কেহ নাই, যাহার নিকট সবটা প্রাণ খুলিয়া দিয়া স্বাধীন ব্যবহারে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারি। স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা বন্ধু যে কেহ হউক না কেন, তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতে গিয়া, আমাদিগকে অনেকাংশে তাহাদেরই অভিপ্রায় অনুসারে চলিতে হয়! আমাদের প্রাণের একদিক সঙ্কুচিত রাখিয়া দিতে হয়। দেখ—স্ত্রীর সহিত মাতার মতন ব্যবহার চলে না। পিতার সহিত বন্ধুর মতন ব্যবহার চলে না। বন্ধুর সহিত পুত্রের ন্যায় ব্যবহার চলে না। এইরূপ জগতের সর্ব্বত্র। এমন কেহ নাই—যাহার সহিত আমি আমার সর্ব্বভাবের আদান প্রদান করিতে পারি; কিন্তু যেখানে আমি স্বাধীন, যেখানে আমার প্রাণের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ উপস্থিত হয় না, সেই একমাত্রস্থান—মা আমার। আমার পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্র। সে যে আমার পিতা, সে যে আমার মাতা, সে যে আমার সখা, সে যে আমার বন্ধু, সে যে আমার গুরু, সে যে আমার প্রভু, সে যে আমার পুত্র, সে যে আমার কন্যা, সে যে আমার ভার্য্যা, সে যে আমার পরিচারিকা, সে যে আমার সখী, সে যে আমার আত্মীয়, সে যে আমার প্রাণ, সে যে আমার আত্মা, আমার সর্ব্বস্ব সে, আমার সর্ব্ব সে। প্রাণের সমস্ত কবাট খুলিয়া অসঙ্কোচে কথা বলিবার, অসঙ্কোচ ব্যবহার করিবার একমাত্র স্থান—মহামায়া মা। আমি যেমনটি করিলে তৃপ্তিলাভ করি, মা আমার তৎক্ষণাৎ সেই ভাবে আমার সহিত ব্যবহার করেন। তাঁহার নিজের যে, কোনও বিশিষ্ট ভাব নাই। তিনি ভাবাতীতা। শুধু পুত্রস্নেহে আত্মহারা হইয়া, ভাবে ভাবে আমার পরিতৃপ্তি-সাধনে নিয়ত নিরতা থাকিয়া, ভাবাধীনতার হস্ত হইতে আমাকে চিরমুক্ত করিয়া লইবার জন্য ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে এই ভাব-বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছেন।

মা কেন আমায় মুক্ত করিবেন জান কি? মুক্ত না হইলে যে মা আমায় বুক ভরিয়া ভালবাসিতে পারেন না। মুক্ত না হইলে যে প্রাণ ভরিয়া আদর করিতে পারেন না। মুক্ত না হইলে আমিও যে অত স্নেহ ভোগ করিবার স্থান পাই না। আমার এতটুকু বুক; কি করিয়া সে উদার অসীম স্নেহ ভালবাসা ধরিয়া রাখিব। যে ভালবাসার অফুরন্ত প্রবাহের এক বিন্দু ধরিতে গিয়া, অনন্তদেব সহস্র শীর্ষ হইয়াছেন, যে ভালবাসার এক বিন্দু পাইয়া সূর্য্যদেব সহস্রকিরণে প্রাণশক্তি বিতরণ করিতেছেন, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া "আপোজ্যোতী-রসোঽমৃতম্"রূপ স্নেহধারা ঢালিয়া জীববৃন্দকে সঞ্জীবিত করিতেছেন, যে ভালবাসার এক বিন্দু পাইয়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অগণন জীববৃন্দের প্রাণে ভালবাসা নামে একটা অমর-সম্বেদন ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে ভালবাসার একবিন্দুর সহস্রাংশ পাইয়া আমাদের গর্ভধারিণী মাতা পুত্রস্নেহে আকুল হইয়া পড়েন, যিনি সেই ভালবাসার কেন্দ্র, যিনি এই সমষ্টি-ভালবাসার একমাত্র আধার, সেই মহামায়া মায়ের ভালবাসা ভোগ করিব, সে আধার কই! সে পাত্র কই! ওরে! আমার বুক যে এতটুকু! এক বিন্দুতেই ভরিয়া যায়; সে অনন্ত প্রেমসিন্ধু কিরূপে ধরিয়া রাখিব! তাই, মা আমায় মুক্ত করিবেন। আমায় বিশাল-অনন্ত করিয়া লইবেন। আমার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া অমৃতের স্নেহধারা অনন্তকাল পান করাইবেন বলিয়াই এই ভাব-বিদ্রোহ—এই কঠোর আয়োজন।

জানি মা—এই ভাববিদ্রোহরূপ মর্ম্মন্তুদ অশান্তির অন্তরালে অনন্ত শান্তি লুক্কায়িত, জানি মা—এমন করিয়া বন্ধন-যাতনা অনুভব করাইয়া মুক্তির দিকে টানিয়া লইতেছ; জানি মা—বন্ধনজ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ না পাইলে, মুক্তিরূপ সুবর্ণ-কমল প্রস্ফুটিত হয় না; জানি মা—আমারই মহামঙ্গলের জন্য তুমি আমার প্রজাবৃন্দকে আমারই বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া অসীম বীর্য্যবান্ করিয়াছ। সবই জানি মা—তবু আর মুহূর্ত্ত বিলম্বও যে যুগান্তর বলিয়া বোধ হয়। কবে এ দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কারের আধিপত্য হইতে চিরমুক্ত

হইয়া, চিরশান্তিময় অনন্ত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে—অপার স্নেহসমুদ্রে চিরতরে নিমগ্ন হইব ? কবে—মা কবে ? সে দিনের কত দেরী! কালাতীতা মা আমার ! কবে এ কালপ্রবাহের অগণিত তরঙ্গভঙ্গ হইতে দৃষ্টি অপসৃত হইয়া মহামুক্তিক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে ?

যাহা হউক, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী! যখন ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত প্রজাগণ সুরথকে রাজ্যচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন যুদ্ধ অনিবার্য্য। সুরথ একবার শেষ চেষ্টা দেখিল। ভাবরাশিকে চিরতরে বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইল ; কিন্তু সকলই নিষ্ফল ! ভাববৃন্দ জয়ী হইল। জীব ভাব-সমরে পরাজিত হইল। ভাবসমূহকে হীনবল মনে করিয়া জীব সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া বৃত্তিনিরোধের চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু "ন্যূনৈরপি স তৈর্জ্জিতঃ"। কেন এ পরাজয়-সংঘটন হইল—প্রবল-পরাক্রান্ত সুরথের সহিত সমরে তদধীনস্থ দুর্ব্বল ক্ষুদ্র ভাববৃন্দ কিরূপে জয়লাভ করিল, শ্লোকে "কোলাবিধ্বংসিভিঃ" এই হেতুগর্ভ বিশেষণ দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। ভাববৃন্দ যে পূর্ব্বেই কোলানগরী—সুরথের রাজধানী অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। যখন একটির পর একটি আসিয়া বহু জন্ম জন্মান্তর হইতে ভাবাঙ্কুর সমূহ চিত্তক্ষেত্রে উদ্‌গত হইতেছিল, তখন ত' তাহাদিগকে বিনাশ করা হয় নাই ! তখন বরং সলিল-সিঞ্চনে সে ক্ষুদ্র অঙ্কুরগুলিকে অপত্যনির্ব্বিশেষে পরিপোষণ করা হইয়াছে ! এখন তাহারা পরিপুষ্ট, বলবান্ ও বহুসংখ্যক হইয়া পড়িয়াছে, চিত্তক্ষেত্রে বাস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছে, আর কি তাহাদিগকে নির্জ্জিত করা সম্ভব ? সুতরাং সুরথ পরাজিত হইল।

ততঃ স্বপুরমায়াতো নিজদেশাধিপোঽভবৎ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥৬॥

অনুবাদ। অনন্তর (ভাবসমরে পরাজিত হইয়া) সুরথ স্বপুরে আগমন পূর্ব্বক মাত্র নিজদেশের অধিপতি হইলেন; কিন্তু তিনি মহা সৌভাগ্যবান্; সুতরাং তখনও পূর্ব্বোক্ত প্রবল শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে বলিয়াছি—ক্ষিতিমণ্ডলশব্দে মূলাধারচক্র বুঝা যায়। জীব এই মূলাধারচক্রে চিত্ত স্থির করিতে গিয়া শারীরিক চঞ্চলতার হাত হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতিলাভ করে বটে, কিন্তু ভাবচাঞ্চল্য বিদূরিত হয় না। তখন ক্রমে স্বাধিষ্ঠানে ও মণিপুরে চিত্ত স্থির রাখিতে যত্নবান্ হয়; কিন্তু এখানেও ভাবের সহিত বিরোধিতায় পরাজিত হইতে হয়, তখন অগত্যা স্বপুরে—হৃদয়ে—দহরপুণ্ডরীকে আশ্রয় লইতে হয়। হৃদয়ই জীবাত্মার বাসস্থান। বেদান্ত—হৃদয় শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"হৃদি অয়ং ইতি হৃদয়"! হৃদয়ই আত্মার বিশিষ্ট অনুভূতি-স্থান। এই হৃদয়ই সুরথের স্বপুর। পূর্ব্বে তিনি এখান হইতে রাজ্য-বিস্তার করিয়া, ক্রমে মণিপুর ও স্বাধিষ্ঠান অতিক্রম পূর্ব্বক ক্ষিতিমণ্ডল—মূলাধার পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। স্বভাবতঃ জীবের মন এই নিম্নস্থ তিন কেন্দ্রেই বিচরণ করে, এই স্থানেই জীবভাবের পূর্ণ বিকাশতার পর মহামায়ার কৃপায় ভাববিদ্রোহ উপস্থিত হয়; ভাবসমরে পরাজিত হইয়া, জীব পুনরায় স্বস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে; ক্রমে সর্ব্বত্র পরাজিত হয়; তখন অনন্যোপায় হইয়া স্বপুরে আশ্রয় লইয়া থাকে।

বহু সুকৃতির ফলে—মায়ের অসীম কৃপায় জীব এই স্বপুরের সন্ধান পায়। সাধারণতঃ জীব এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে যে, "স্ব" বলিয়া জিনিষটাই ভুলিয়া যায়। জগতের মোহ—বহুত্বের আনন্দ-ক্রীড়া জীবকে স্বপুর হইতে বিচ্যুত করিয়া বহু দূরে নিয়া

যায়। সংসার-সংস্কারশ্রেণী দস্যুরূপে—বিদ্রোহীরূপে যখন সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লয়—যখন আত্মশক্তি আত্মরাজ্য আত্মস্মৃতি পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়, তখন জীব আবার ধীরে ধীরে সেই লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্বোধনের জন্য যত্নবান্ হয়। সেই সময়ে একবার ভাববৃন্দের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য স্বপুরে আশ্রয় লয়—"আমি কে" তাহা স্মরণ করিবার জন্য একবার প্রাণপণ চেষ্টা করে।

সংসারক্ষেত্রেও দেখিতে পাই—পুনঃপুনঃ পুরুষকারের নিষ্ফলতা দেখিয়া, পুনঃপুনঃ আশাভঙ্গ ও অচিন্তিত ঘটনার উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া, পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর কশাঘাতে ব্যথিত হইয়া জীব ভগবৎমুখী হয়—ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ হওয়া ও আপনাকে অন্বেষণ করা একই কথা। আত্ম-স্মৃতি উদ্‌বোধিত হইলেই জীব স্বপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়—স্বকীয় মহান্ স্বরূপটি পুনরায় লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। সর্ব্ববিধ ভাবচাঞ্চল্যের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য লালায়িত হইয়া, জীব যখন স্বস্থানে—অনাহত-কেন্দ্রে আত্মসংস্থ হইতে উদ্যত হয়, তখনও দেখিতে পায়—প্রবল শত্রুগণ এখানে আসিয়াও আক্রমণ করিতেছে। দুস্ত্যাজ্য সংসার-সংস্কারশ্রেণীর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এতদূর আসিয়াও যখন আত্মসংস্থ হইতে পারে না, তখন জীব হতাশের নিম্নতম সোপানে অবতরণ করে। হায়! এইরূপ ক্ষেত্রে আসিয়া কত সাধক স্খলিতচরণ হইয়া পড়ে, কত সাধক অবসাদের গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, কত সাধক এইখানে আসিয়াই "ভগবৎ-লাভ" অতি দুরূহ ব্যাপার বলিয়া ঘোষণা করে।

অধিকাংশ সাধক স্বকীয় হৃদয়পদ্মে ইষ্টমূর্ত্তিকে ধ্যানের সাহায্যে বসাইতে গিয়া, চিত্তচাঞ্চল্য-বশতঃ অকৃতকার্য্য হইয়া পড়েন। যাঁহারা ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহারাও ক্ষণকালের মধ্যে বড় সাধের বড় আদরের শ্রীমূর্ত্তিটি হারাইয়া হতাশ হইয়া পড়েন। যাঁহারা বিশিষ্ট মূর্ত্তির ধাঁধা অতিক্রম করিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইবার প্রয়াসী, তাঁহারাও নির্ম্মল প্রাণজুড়ান বুদ্ধিজ্যোতির পরপারে

অবস্থিত সেই মহান্ চৈতন্যসমুদ্রে অবগাহন করিতে গিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে বিষয়াকারে আকারিত হইয়া পড়েন। যাঁহারা সে চিৎসমুদ্রে অবগাহন করিবার সামর্থ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইতে হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র ভাবরাশি বা প্রজাবৃন্দের অত্যাচারকাহিনী সাধকগণের মুখে বিঘোষিত হয়; এই অত্যাচার, এই ভাবচাঞ্চল্য নিবারণের জন্য আবার কতরূপ আয়োজন উদ্যোগের বিধান আছে। বৃত্তিনিরোধ হঠযোগ প্রাণায়াম প্রত্যাহার প্রভৃতি কত কি উপায় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন রুচির সাধকগণ এই পর্য্যন্ত আসিয়া—স্বপুরে আশ্রয় নিয়াও যখন সংস্কার-শ্রেণীদ্বারা উৎপীড়িত হইতে থাকেন, তখন স্ব স্ব রুচি অনুসারে এক একটি কৌশল অবলম্বন করিয়া, বাধানিবারণে উদ্যত হয়েন। হয়ত সেই কৌশলটি শিক্ষা করিতে—ভাববৃন্দের অত্যাচার প্রতিহত করিতে—দুই তিনটি জন্ম অতিবাহিত হইয়া যায়। উদ্যানের বেড়া দিতেই জীবন অতিবাহিত হইলে কুসুম-সুবাস কবে গ্রহণ করিবে? বাধা নিবারণ করিতে গিয়া যদি জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হয়, তবে আর মাতৃ-লাভ কবে করিবে!

কিন্তু—তুমি মাতৃ-অন্বেষি-শিশু! তুমি অমৃতপিপাসু জীব! তুমি ওসকল বাধাবিঘ্নের দিকে কেন দৃক্‌পাত করিবে? তীর্থযাত্রী যখন সুদূর পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া হিরণ্ময় তীর্থমন্দিরের উচ্চ পতাকা দূর হইতে দেখিতে পায়, তখন কি আর পথশ্রমের দিকে কিংবা পদে কণ্টকবেধ-জনিত যাতনার দিকে লক্ষ্য করে? যদি লক্ষ্য পড়ে এবং উহার প্রতিকার করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহার তীর্থদর্শনে বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী! যাঁহাদের ঐরূপ অত্যাচার আক্রমণ আসিতে থাকে, তাঁহারা যাহাতে হতাশ হইয়া না পড়েন, অথবা বাধা নিবারণের উদ্দেশ্যে সমস্ত অধ্যবসায় পরিব্যয়িত না করেন, তজ্জন্য মহর্ষি উচ্চকণ্ঠে আশার মোহনবাণী শুনাইতেছেন। ঐ শোন, "আক্রান্তঃ স মহাভাগঃ"—যেহেতু তিনি (সুরথ) মহাসৌভাগ্যবান্, সেইজন্যই স্বপুরেও শত্রুর আক্রমণ। এইরূপ ভাবে শত্রুকর্ত্তৃক স্বপুরে আক্রান্ত

জীব অতিশয় ভাগ্যবান্। সাধকমাত্রকেই এইরূপ ভাবরাশি দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইতেই হইবে এবং এই আক্রমণই সৌভাগ্যের সূচনা করিয়া দেয়। কই, ঋষি ত' মহারাজ সুরথকে দুর্ভাগ্য বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে কিন্তু দেখা যায়—সুরথ অতি ভাগ্যহীন; কারণ, রাজ্যভ্রষ্ট, শত্রুর অত্যাচারে উপদ্রুত; স্বপুরেও সুস্থ হইয়া থাকিবার উপায় নাই, সেখানেও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত প্রজাগণের অযথা আক্রমণ; ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি থাকিতে পারে? কিন্তু তথাপি সুরথকে "মহাভাগ" বলা হইয়াছে!

সাধকমাত্রেরই এইরূপ একটা অবস্থা আসে। একটু ভগবৎমুখী হইলে প্রাণে যথার্থই মাতৃ-অন্বেষণের ভাব একটু ফুটিয়া উঠিলে, তাহার নানা দিক্ হইতে নানারূপ উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগ শোক দারিদ্র্য বন্ধুবিচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটনারাশি আসিয়া সাধককে চঞ্চল করিয়া তোলে। ঐ সকল চঞ্চলতা অতিক্রম করিয়া সাধক যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া একটু একটু করিয়া ভগবৎরসের আস্বাদ পাইতে থাকে, তখন আরও বিষম সমস্যা—একদিকে জগদ্ভাবগুলি আর ভাল লাগে না, কে যেন জগদ্ভোগের উপর তিক্ত ঔষধ মাখাইয়া দিয়াছে; সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছায় জগতের ভোগগুলি গ্রহণ করিতে হয়; অথচ অন্যদিকে ভগবৎমুখী গতিও বিশেষ খরতর মনে হয় না। একদিকে যেমন মাকে পায় না, অন্যদিকে তেমন সংসারও ভাল লাগে না। এই উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া সাধকের মর্ম্মস্থান যেন শতধা বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে উপনীত নিরাশ-হৃদয় সন্তানের প্রাণে পূর্ণ সাহস ও বিপুল আশা-সঞ্চারের জন্যই মন্ত্রে "মহাভাগ" শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে।

যাহারা মাতৃ-মুখী হইয়াছ, যাহারা মাতৃ-লাভকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছ, তাহারা এইরূপ সমস্যাপূর্ণ ক্ষেত্রে আসিয়া হতাশ হইও না। তুমি মহাসৌভাগ্যবান্ বলিয়াই মা তোমার প্রতিকূল বেদনরূপে ভাবরাশির আক্রমণ উপস্থিত করিয়াছেন। আর একটি কথা—ঐ আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য মাতৃ-চরণ সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা

ব্যতীত অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়া, নিজের আধ্যাত্মিক গতি শ্লথ করিও না। বাধা বিঘ্ন অত্যাচার উৎপীড়ন ওসকল আসিবেই; যে যাহার কার্য্য করিবে। চির-বিদ্রোহী প্রজা বিদ্রোহাচরণ করিবেই; সেজন্য তুমি মাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিও না। তুমি শাণিত অসিহস্তে বাধা-নিবারণে উদ্যত হইয়া মাকে ভুলিও না। উদ্দেশ্য মাতৃ-লাভ, বিঘ্ননিবারণ উপায় মাত্র। তুমি উদ্দেশ্য ভুলিয়া, উপায়কেই উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিও না। কোনরূপ হঠক্রিয়ার সাহায্যে চিত্তের বৃত্তিনিরোধের চেষ্টায় জীবনের যে অংশটা অতিবাহিত করিবে, সেই সময়টা মাতৃ-উদ্দেশ্যে কাতরপ্রাণে কাঁদিতে থাক। অত্যাচারে বিব্রত হইয়া তুমি ইষ্টস্মরণ হইতে—মাতৃ-চিন্তা হইতে বিমুখ হইয়া পড়িয়াছ বলিয়া, মাকে জানাও। আমাদের সকল আবেদন, সকল দুঃখ জানাইবার এমন বিশ্বস্ত স্থান আর কোথায় আছে! আপনাকে অশক্ত দুর্ব্বল উৎপীড়িত জানিয়া নিত্য-আশ্রয় মাতৃ-চরণে শরণ লও। প্রত্যেক বিঘ্নকে মায়ের মঙ্গলময় আহ্বান বলিয়া গ্রহণ কর। প্রত্যেক ভাবকে ছদ্মবেশিনী মা বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। বিভিন্ন মনোভাবগুলিকে মহামায়ারই অনুভাব বলিয়া আদর কর। উহার চরণে মা বলিয়া অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর। মায়ের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসার-ভাবময়ী মূর্ত্তি সংহরণ করিয়া মহতী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইবার জন্য প্রার্থনা কর। দেখিবে, অচিরকাল মধ্যে তোমার ভাববিদ্রোহ প্রশমিত হইয়াছে। সাধক! হাতের হাওয়া দিয়া প্রজ্বলিত বহ্নিশিখাকে নির্ব্বাপিত করিতে যাইও না। হাত পুড়িয়া যাইবে, আগুন নিভিবে না; বৃত্তিনিরোধে সমস্ত অধ্যবসায় নিযুক্ত করিলে বৃত্তিনিরোধ হইতে পারে; কিন্তু মাতৃ-লাভ হইবে না; কারণ, তুমি মাকে চাওনা, চাও —চিত্তচাঞ্চল্য দূর করা। যাহা চাইবে, তাহাই পাইবে; মনের চঞ্চলতা-নিবৃত্তি জীবনের উদ্দেশ্য নহে। নিদ্রিত অবস্থায় ত' উহা অনায়াস লভ্য হয়; কিন্তু মাতৃ-লাভ হয় কি? চিত্তকে চিৎসমুদ্র দেখাও, মনকে মা দেখাও, ভাববৃন্দকে ভাবিনীমূর্ত্তি দেখাও, উহা আপনি শান্ত হইবে; তুমি ধন্য হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি জীব ভগবৎমুখী হইলে নানাবিধ বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হয়। কেন হয়? এরূপ প্রশ্ন অনেকেরই মনে আসিয়া থাকে। কেহ বলেন—মায়ের পরীক্ষা। আমরা কতটা প্রাণ দিয়া মাকে চাই, তাহা দেখাইবার জন্য মা আমাদিগকে নানারূপ উৎপীড়িত করেন। কেহ বলেন—কর্ম্মফল-ভোগ। আমরা কিন্তু বুঝিয়াছি, জীব মাতৃ-মুখী হইলেই, তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসঞ্চিত সংস্কারগুলি পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। যে সকল সংস্কার ক্ষয় করিবার জন্য বহুজন্ম স্বীকার করিতে হইত, মা আমার দয়া করিয়া সেই সংস্কারগুলি দুই এক জন্মেই ক্ষয় করিয়া দিয়া থাকেন। তাই, অনেক জন্ম-বিনাশ্য কর্ম্মগুলি একেবারে ফলোন্মুখ হইয়া পড়ে। লক্ষ জীবনের কর্ম্মফল এক জীবনে ভোগ করিতে গেলে, যুগপৎ বহু বাধাবিঘ্ন সহ্য করিতেই হইবে। মাকে ডাকিলে—মাতৃ-স্নেহ অনুভব করিলে জন্মস্রোত হ্রাস অথবা বন্ধ হইয়া যায়। ইহাই সাধকের প্রতি মায়ের অনুগ্রহ।

অমাত্যৈর্ব্বলিভির্দুষ্টৈর্দুর্ব্বলস্য দুরাত্মভিঃ।
কোষোবলং চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ততঃ ॥৭॥

অনুবাদ। অনন্তর সেই স্বপুরেও বলশালী দুষ্ট ও অসৎপ্রকৃতি মন্ত্রিবর্গ সেই হৃতরাজ্য দুর্ব্বল সুরথের কোষ এবং বল অপহরণ করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা। জীব যখন ভাব-সমরে সম্যক্ নির্জ্জিত হইয়া স্বপুরে আশ্রয় গ্রহণ করে, যখন সমস্ত জগৎসংস্কারশ্রেণীকে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়া দিয়া, নিত্যশান্তিময় সর্ব্বগুহাশয় গহ্বরেষ্ঠ পুরাণ পরমপদের সন্ধানে হৃদয়গুহায় প্রবেশ করে; তখন সেখানেও দেখিতে পায়—অত্যাচারের বিরাম নাই। এখানেও প্রবল বিরোধী অমাত্যবর্গ। এই অমাত্যবর্গ কাহারা? শাস্ত্রীয় আদেশসমূহ। যে বিধিনিষেধ-বাক্যসমূহের অনুপালন করিয়া স্ব স্ব বর্ণোচিত আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান

করিয়া জীব হৃদয়গুহার সন্ধান পায়; ঐ কর্ম্মকাণ্ড—ঐ আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মই জীবের আত্মলাভের প্রবল এবং চরম অন্তরায়। কত জন্ম ধরিয়া, জপ পূজা ব্রত উপবাসাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট আদেশসমূহের অনুপালন করিবার ফলে, ভাববিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কত প্রাণপাত তপস্যা, কত কঠোর যোগাভ্যাস প্রভৃতির ফলে আত্মরূপিণী মায়ের অনুসন্ধান জাগিয়া উঠে, সাধক স্বপুরের সন্ধান পায়, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? যে শাস্ত্রীয় আদেশসমূহ ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার সময়ে অনুকূল ধীমান্ মন্ত্রীর ন্যায় প্রধান সহায় ও মন্ত্রণাদাতা হয়; যাহারা অধর্ম্মগতি হইতে রক্ষা করিয়া জীবকে শান্তির সুনির্ম্মল সলিলে অভিষিক্ত করে; যাহাদের সহায়তায় সুরথ সুবিশাল ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়া শুভ্র সত্ত্বগুণরূপ নির্ম্মল যশ লাভ করে; ভাব-বিদ্রোহে নির্জ্জিত হইয়া, স্বপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় সেই সুরথই দেখিতে পায়—তাহারাই প্রতিকূলাচারী প্রবল শত্রু। পূর্ব্বে যাহারা সৎ-হিতাচারী ছিল, এখন স্বপুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া বুঝিতে পারে—উহারাও দুষ্ট এবং দুরাত্মা।

বাস্তবিক পক্ষে, জীবের অধর্ম্মগতি রুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মপথে আনয়ন পক্ষে, কণ্টকের দ্বারা কণ্টক-উদ্ধারের ন্যায় বৈধকর্ম্মাদিই প্রধান সহায়। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলি প্রতিপালন করিতে করিতেই মানুষের প্রাণে মাতৃ-লাভের—আত্মলাভের প্রবল বাসনা জাগে। মা যে আমার ধর্ম্মের অতীত, অধর্ম্মের অতীত, কর্ম্মের অতীত, অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দময় অদ্বিতীয় বস্তু; ইহা বুঝিতে পারে জীব—বহুদিন শাস্ত্রীয় আদেশগুলি অনুষ্ঠান করিতে করিতে তবে। যদি কখনও কাহাকে দেখিতে পাও—সে বৈধকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান না করিয়াও যথার্থ মাতৃ-অন্বেষী হইয়াছে, তবে বুঝিবে—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে তাহার কর্ম্মকাণ্ডাদির সম্যক্ অনুষ্ঠান শেষ হইয়াছে। আগে ধর্ম্মরাজ্য। পরে আত্মরাজ্য। আগে ধর্ম্ম পরে মা। তাই, ধর্ম্মকে মুক্তির সোপান বলা হয়। জীব যে অপরিচ্ছিন্ন, পূর্ণ ও আনন্দময়! সে কতদিন পরিচ্ছিন্ন অপূর্ব্ব ক্ষণিক আনন্দদায়ক ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতরে অবস্থান করিবে? জীব যে

নিত্যমুক্ত! সে কতদিন ধর্ম্মের স্বুবর্ণ শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া অধীন থাকিবে? একদিন তাহাকে শাস্ত্রগণ্ডীর বাহিরে—উন্মুক্ত ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মহাপ্রাঙ্গণে—মধুময় মাতৃ-অঙ্কে উপস্থিত হইতেই হইবে। জীব যে 'স্ব' সুতরাং স্বৈর বিচরণ ভিন্ন জীবের স্বস্তিলাভ হয় না। তাই 'স্ব'কে লাভ করিবার জন্য একবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়া স্বপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিবেই। মাকে—আপনাকে পাইবার জন্য একবার হৃদয়ানুভূত চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবেই। ভগবদ্‌গীতার সেই মহাবাক্য—'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি' 'তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত' এই শান্তিময় অভয় বাণী জীবের প্রাণে প্রাণে ধ্বনিত হইবেই। কিন্তু স্বপুরে প্রবেশ করিতে গিয়া জীব দেখিতে পায়, অমাত্যবর্গ—বৈধকর্ম্মজনিত সংস্কারসমূহ, অতি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহারা অতি বলী। অধর্ম্মসংস্কার দূর করা তত কষ্টসাধ্য নহে, কিন্তু শাস্ত্রবিধির সংস্কারগুলি দূর করিতে, জীবের সমধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। মদ্যপানকারীর মদ্যপানজনিত সংস্কার যত শীঘ্র দূরীভূত করা যায়, একজন ত্রিসন্ধ্যান্বিত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাদির সংস্কার দূরীভূত করা তদপেক্ষা অধিক কষ্টকর। এইরূপ অধর্ম্মসংস্কার অপেক্ষা ধর্ম্মসংস্কার প্রবল ও কষ্টশত্রু; ইহাদের গতি অনেক উচ্চে। কিন্তু এমন একটি দিন আসে, মাতৃ-করুণার এমন একটা প্রবাহ আসে যে, ঐ সকল সংস্কার প্রবল প্লাবনে তৃণরাশির ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়। সেইদিন—জীবজীবনের শুভদিন, সেই দিনই রামপ্রসাদের সুরে সুর মিলাইয়া সাধক বলে—"ধর্ম্মাধর্ম্ম দুইটা অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে রাখ্‌বি, যদি না মানে বারণ (ওরে মন) জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি।"

যাহা হউক মন্ত্রে—বলিভিঃ, দুষ্টৈঃ এবং দুরাত্মভিঃ এই তিনটি বিশেষণপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম-কর্ম্মের সংস্কার বড় প্রবল, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। দুষ্ট কেন?—'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি', এই ভগবদ্বাক্য যখন জীবহৃদয়ে যথার্থ প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তখন কি আর জীব কাম্যকর্ম্মগুলিকে বা ধর্ম্মসংস্কারগুলিকে

দুষ্ট না বলিয়া থাকিতে পারে? তারপর দুরাত্মা—অসৎ-প্রকৃতি। ইহারা ছাড়িয়াও ছাড়ে না। জানি—ধর্ম্মে আমার আত্মরাজ্য নাই, জানি—ধর্ম্মে আমার মোক্ষ নাই, জানি—ধর্ম্মে আমার মায়ের কোল নিরবচ্ছিন্ন নাই; কিন্তু জানিলে কি হয়! আমি ছাড়িলে কি হয়! ধর্ম্ম যে আমায় ছাড়ে না! জীবের স্বপুরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে—ঐ দেখ ধর্ম্মসংস্কার। কেবল কি তাই—"কোষোবলঞ্চাপহৃতম্" জীবের কোষ এবং বল পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়া লইয়াছে—ঐ দেখ ধর্ম্মসংস্কার। আমার আনন্দময় কোষ—মায়ের হিরণ্ময় মন্দির, আমার চির-বিশ্রামের শান্তিনিকেতন বিলুণ্ঠিত করিয়াছে—ঐ ধর্ম্মসংস্কার। বৈধকর্ম্মের সংস্কারসমূহ আমার পরিচ্ছিন্ন নশ্বর আনন্দের সহায়মাত্র; কিন্তু আমার যে নিত্যানন্দ ধাম—যেখানে আরোহণ করিতে পারিলে, মায়ের প্রসারিত বাহুদ্বয় স্বতঃই আসিয়া আমায় টানিয়া কোলে তুলিয়া লইবে; যেখানে গেলে আমি চিরতরে মাতৃবক্ষে মিলাইয়া যাইতে পারিব; যেখানে গেলে—আমার সর্ব্ববিধ সন্তাপ—সকল দুঃখ, সকল জ্বালা চিরতরে বিধ্বস্ত হইবে, হায়! আমাদের সেই শান্তিনিকেতন—সেই আনন্দময় কোষ যে বৈধকর্ম্ম-সংস্কাররূপ মন্ত্রিবর্গদ্বারা বিলুণ্ঠিত।

এস্থলে আধুনিক বেদান্তবাদিগণ বলিতে পারেন—আত্মা যখন আনন্দময় কোষেরও অতীত, তখন আনন্দময় কোষ বিলুণ্ঠিত হইলেই বা ক্ষতি কি? একটু স্থিরভাবে আলোচনা করিলে এ সংশয় অপনীত হইবে। আত্মা যদিও আনন্দময় কোষেরও অতীত—এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত—কিন্তু উপাসনা বা সাধনা বলিয়া একটা ব্যাপার যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আনন্দময়কোষেই তাঁহার বিশিষ্ট সাক্ষাৎকার লাভ হয়; আনন্দময়কোষে আত্মবোধ লইয়া যাওয়াই সাধনা। অন্নময় প্রাণময় প্রভৃতি স্থূলতর কোষগুলিতে যে আত্মবোধ ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে উপসংহৃত করিয়া আত্মবোধটিকে আনন্দময়-কোষে উপনীত করাই সাধনার শেষ। সাধনার সূত্রপাতেই অন্নময়-কোষ বা স্থূলদেহ হইতে জীবের আত্মবোধ-উপসংহরণ আরম্ভ হয়।

ক্রমে প্রাণ মন এবং বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া, আনন্দময় কোষে উপনীত হয়। "আমি নিত্যানন্দময় মহান্ চৈতন্যমাত্র-স্বরূপ" এই বোধে উপস্থিত হইলেই সাধনার পরিসমাপ্তি হয়। উপাসনা দ্বারা ঐ পর্য্যন্তই যাওয়া যায়। ইহাই হিরণ্যগর্ভ পরমেশ্বর প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত। উহাই অক্ষর পুরুষ—যেখানে জগৎসংস্কার বীজবৎ অবস্থিত। 'বটকণিকায়াং বৃক্ষ ইব'। এই স্থলে উপনীত হইতে পারিলে আর জগদ্বীজ বা সংস্কাররাশি জীবকে বদ্ধ করিতে পারে না। সে নিত্যমুক্ততার আভাস পায়। যেরূপ পরমেশ্বরে অনন্ত কোটি ভুবনের সংস্কার বা বীজ থাকা সত্বেও তিনি বদ্ধ নহেন, যেরূপ এই সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কার্য্যে নিয়ত নিরত থাকিয়াও তিনি নিত্যমুক্ত; ঠিক সেইরূপই জীব আনন্দময় কোষে অবস্থান করিতে পারিলে, জগদ্ভাবে আর বদ্ধ হয় না; সংসার তাহার স্বাধীন লীলামাত্র হয়। এ অবস্থায় নিয়ত নিত্যানন্দ রসের উপভোগ হইতে থাকে। ইহাই জীবের সাধনালভ্য—ইহাই জীবের প্রকৃত শান্তিনিকেতন। বৈষ্ণব শাস্ত্রের নিত্য রাসমণ্ডল বা গোলোকধাম এই স্থান। ইহার পরপারে যিনি অবস্থিত, তিনি "অবাঙ্মনসোগোচর" বাক্যের অতীত, মনের অতীত, সাধনার অতীত, স্ব-সংবেদ্যমাত্র। আনন্দময়কোষে আরোহণ করিতে পারিলে, ইহার পরবর্ত্তী অবস্থায় অনায়াসে যাওয়া যায়। উহা স্বয়মাগত একটি অবস্থাবিশেষ। (অবস্থা বলিলে ঠিক বলা হয় না)। ব্রহ্মলীলার অবসান বা বেদান্তপ্রতিপাদ্য "পরান্তকাল" উপস্থিত হইলেই উহার লাভ হয়; সুতরাং বেদান্তবাদের সহিত আমাদের কোনওরূপ বিপ্রতিপত্তি নাই।

যাহা হউক, জীব স্বপুরে প্রবেশ করিয়াই বুঝিতে পারে, আনন্দময় কোষটি পর্য্যন্ত ধর্ম্মসংস্কারের পরিচ্ছিন্নতায় সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আরে! মনে কর—শাস্ত্রে আছে—রক্তজবা দ্বারা বিষ্ণুপূজা করিও না, শিবকে বিল্বপত্রটি বিপরীত ভাবে দিও, দক্ষিণ নাসাপুট শক্ত করিয়া ধরিও, যেন বায়ু-নির্গম না হয়, বাম পদের উপরে দক্ষিণ পদ স্থির ভাবে স্থাপন করিবে, ইত্যাদি সহস্র সহস্র আদেশ প্রতিপালনেই

জীবন অতিবাহিত হইয়া গেল, মন্ত্রিবর্গের হুকুম তামিল করিতেই সমস্ত অধ্যবসায় পরিব্যয়িত হইল ; আত্মসম্ভোগ বা আনন্দময় কোষের সে স্বাধীন লীলা আর কবে ভোগ করিবে ? হায়! কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে জীবন কাটিয়া গেল, মায়ের কোলে কবে উঠিবে ? এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মাতৃলাভের পক্ষে প্রথম প্রথম হিতকর হইলেও ইহাও ত' বন্ধন! ইহাও ত' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবের অধীনতা! স্বাধীনতাপ্রয়াসী জীব—মাতৃ-বক্ষোরূপ উন্মুক্তক্ষেত্রে বিচরণশীল সন্তান কি আর অত ভাবিয়া—অত বিচার করিয়া অগ্রসর হইতে ভালবাসে! না পারে! অথচ ওগুলিকে উপেক্ষা করিতেও সাহস হয় না। যতদিন জীব মাতৃ-স্নেহবিমুগ্ধ হইতে না পারে, ততদিন বৈধকর্ম্মের সংস্কার জীবকে বড়ই উৎপীড়িত করে। উহার অনুষ্ঠান করিয়াও যথার্থ আনন্দ পায় না, অথচ ছাড়িতেও পারে না। তাই ইহারাই প্রবল শত্রু—নিত্যানন্দের বিঘাতক।

কেবল তাহাই নহে ; জীবের যাহা "বল"—নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু সামর্থ্য, সকলই অমাত্যগণ কর্তৃক লুণ্ঠিত ; কারণ উহারাই জীবকে অনিত্য অশুদ্ধ অজ্ঞান এবং বদ্ধ বলিয়া প্রতীতি করাইয়া দেয়। প্রজাগণ রাজ্যমাত্র নিয়াছে ; কিন্তু সুরথের সর্ব্বপ্রধান সহায় মন্ত্রিগণ কোষ ও বল পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়া লইয়াছে। জীব যখন বুঝিতে পারে—তাহার প্রকৃত স্বরূপটি কতকগুলি পৌরাণিক উপাখ্যানের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত, তখন উহাদিগকেই প্রবল শত্রু বলিয়া মনে করে। পাতঞ্জল দর্শনেও ঠিক এই কথাটিই আছে—"স্বল্পপ্রতিপক্ষাঃ স্থূলাবৃত্তয়ঃ ক্লেশানাং সূক্ষ্মাস্তু মহাপ্রতিপক্ষাঃ"। স্থূল-বৃত্তিগুলি সাধারণ শত্রু এবং সূক্ষ্মবৃত্তিগুলি প্রবল শত্রু। কাম ক্রোধাদি বৃত্তিগুলি আত্মরাজ্যলাভের পক্ষে তত অন্তরায় বলিয়া মনে হয় না, যত অন্তরায় এই সূক্ষ্মবৃত্তিগুলি—এই ধর্ম্মসংস্কারগুলি! এই ধর্ম্মশত্রুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার ; সর্ব্বত্রই নির্জ্জিত হইতে হয়। এই স্থানেই জীবের চরম বিষাদযোগ উপস্থিত হয় ; ইহার পর আর বিষণ্ণ হইতে হয় না। গীতায় কুরুক্ষেত্র-সমরে

অনাত্মীয়কে আত্মীয়বোধে বিমূঢ় যুদ্ধবিমুখ অর্জ্জুনের বিষাদযোগের পরিসমাপ্তি এইখানে! স্বপুরপ্রবেশে অমাত্য-বিদ্রোহ সুরথের প্রাণে যে বিষাদ উপস্থিত করিয়াছিল তাহার তীব্রতা অনেক বেশী; কারণ, সে যুদ্ধ এবং বিষণ্ণতা মনোময় ক্ষেত্রে; কিন্তু এই অমাত্য-বিদ্রোহ বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে—অধিক উচ্চে।

জাগতিক সাধারণ দুঃখের সহিত—সাধন-জগতের দুঃখের যে কত প্রভেদ, তাহা মাত্র সাধকগণের বোধগম্য। বহুদিনব্যাপী দুরারোগ্য নিয়ত-যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিনিপীড়িত ব্যক্তির দুঃখ কিংবা গুণবদ্ যুবক-পুত্র-বিয়োগবিধুরা মাতার দুঃখ অথবা সদ্যঃ পতিবিরহিতা পতিপ্রাণা বালবিধবার দুঃখ অথবা অনশনক্লিষ্ট অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট মানুষের দুঃখ দেখিলে মনে হয়, ইহাই দুঃখের চরম; কিন্তু এ সকল দুঃখ সেই দুঃখের সহিত তুলনায় অকিঞ্চিৎকর—যে দুঃখ আনন্দময় কোষে আরুরুক্ষু সাধকের প্রাণে অনুভূত হয়। এবিষয়ে একটি আত্ম-সম্বেদন আছে যথা—"অনৌপম্যমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং নিশ্চলং মহৎ। যথা ব্রহ্ম তথা তস্য বিরহবেদনং ভৃশম্॥" ভগবান্ যেরূপ অতুলনীয় অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত নিশ্চল এবং মহান্, তাঁহার বিরহ-বেদনাও ঠিক তেমনই অতুলনীয় অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত নিশ্চল এবং মহান্। বৈষ্ণব-গ্রন্থে কৃষ্ণবিয়োগবিধুরা শ্রীরাধার যে সকল বাহ্য লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, উহার একটি বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে; সত্যই ঐ সকল অবস্থা হয়। যে শ্রীমতী হইয়াছে—আরাধিকা বা রাধিকা হইয়াছে, সেই মাত্র কৃষ্ণপ্রেম উপলব্ধি করিতে পারে। যে একবার কৃষ্ণপ্রেমের উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার পক্ষে আবার জগদ্ভাবে বিচরণ বা শ্রীকৃষ্ণবিরহ যে কত তীব্র, কত দুঃখদায়ক তাহা সেই শ্রীমতীই মাত্র জানেন; অন্যে তাহা কিরূপে বুঝিবে; ভাষায় সে বিরহবেদন পরিব্যক্ত হয় না। যদিও প্রতিপত্রে, প্রতিবৃক্ষে, প্রতিধূলি-পরমাণুতে, জগতের সর্ব্বত্র আমার প্রাণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিরাজিত, তবু তাহাতে কি পিপাসা মেটে! ওরে! অপরিচ্ছিন্ন কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুনীরে যে একবার অবগাহন করিয়াছে, সে কি আর এই পরিচ্ছিন্ন প্রেমবিন্দুতে—নামরূপবিশিষ্ট চৈতন্যে পরিতৃপ্ত হইতে

পারে? হায়! জীব কবে সেই অগাধ কৃষ্ণপ্রেমসাগরে অবগাহন করিবে! কবে শ্রীরাধিকা হইয়া ধন্য হইবে। কিন্তু সে অন্য কথা—

ততো মৃগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্যঃ স ভূপতিঃ।
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্ ॥৮॥

অনুবাদ। অনন্তর হৃতরাজ্য সেই ভূপতি মৃগয়াচ্ছলে একাকী অশ্বারোহণপূর্ব্বক গহন বনে গমন করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। ভাব-সমরে পরাজিত জীব স্বপুরে প্রবেশ করিয়াও যখন স্থিরত্ব ও শান্তি লাভ করিতে পারে না, যখন সে দেখিতে পায় —কেবল সংসার-সংস্কার-শ্রেণী তাহার প্রতিকূল নহে, বৈধকর্ম্মজন্য দুরপনেয় সংস্কারগুলিও প্রধান শত্রু; উহারা তাহার আনন্দময় কোষ এবং নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধত্বাদিরূপ বল পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়াছে; যখন জীব আপনাকে হৃতস্বাম্য বলিয়া বুঝিতে পারে—কি দেহরাজ্যে, কি মনোরাজ্যে, কি জ্ঞানময় ক্ষেত্রে, কি আনন্দের কেন্দ্রে, কোথাও আর আমার বলিয়া প্রভুত্ব করিবার বিন্দুমাত্র সামর্থ্য নাই; কারণ, দেহ আমার অনিচ্ছায় রুগ্ন হয়, বৃদ্ধ হয়, অকর্ম্মণ্য হয়, মন আমার অনিচ্ছায় প্রতিনিয়ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, জ্ঞান আমার জ্ঞেয় বস্তুকে সম্যক প্রকাশিত করে না; আর আনন্দ—তাহার অস্তিত্বই ত' খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সকলই আমার, অথচ সকলই বিপক্ষ—স্বাধীন; আমার ইচ্ছায়—আমার আদেশে দেহের একবিন্দু শোণিত পর্য্যন্ত পরিচালিত হয় না—সকলেই স্বাধীনতা অবলম্বনপূর্ব্বক আমার আত্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলে প্রবলভাবে দণ্ডায়মান—আমার মাতৃ-অঙ্কলাভের প্রবল বিরোধী, তখন এইরূপ নিজের শোচনীয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সে একান্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

যদিও মন্ত্রে বিষাদ শব্দটির উল্লেখ নাই, তথাপি 'একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্' এই কথাটীই সুরথের চরম বিষাদযোগের সূচনা করিতেছে। এ বিষাদ বাহিরে দেখাইবার নহে; এরূপ

অবস্থাপন্ন জীব ত' মহাসৌভাগ্যবান্; তাই পূর্ব্বেই সুরথকে মহাভাগ বলা হইয়াছে। কিন্তু সুরথের প্রাণে যে কি অব্যক্ত যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ লোকে কিরূপে বুঝিবে ? যে ব্যক্তি স্বপুরের সন্ধান পাইয়াছে, সাধারণ লোক তাহাকে দেখিলে, তাহার একবিন্দু চরণধূলার জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। বাস্তবিক সে একদিকে মহাসৌভাগ্যবান্ হইলেও অন্যদিকে সে অত্যন্ত দুঃখী; কারণ, জীবভাব এবং জীবত্বের গ্রন্থিগুলি তাহার পক্ষে তখন অসহনীয় যন্ত্রণাময় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। যতদিন মাকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে না পারা যায়, যতদিন সবটা প্রাণ দিয়া মাতৃ-স্নেহ ভোগ করা না যায়, যতদিন যথার্থ গ্রন্থিভেদ না হয় অথচ গ্রন্থির যাতনা বেশ বোধে আসিতে থাকে, ততদিন জীবের যে কি কষ্ট, তাহা যাহার গ্রন্থি-বোধই হয় নাই, তাহারা কিরূপে বুঝিবে ? তাই এস্থলে বিষাদ শব্দটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। গীতায় বিষাদযোগের বহির্লক্ষণগুলি বেশ উক্ত হইয়াছে—"গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ, ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে, মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি, বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি শব্দে ধনুঃস্খলন, গাত্রদাহ, মুখশোষ, হৃৎকম্প প্রভৃতি বিষাদের চিহ্নগুলি অর্জ্জুনের অন্নময় কোষে প্রকাশ পাইয়াছিল; কিন্তু সুরথের বিষাদলক্ষণ সূক্ষ্ম ও কারণদেহে প্রকটিত হওয়ায় বাহিরে বিশেষভাবে প্রকাশ পায় নাই। প্রজাবিদ্রোহ বা ভাববিরোধিতা বিজ্ঞানময় কোষে এবং অমাত্যবিদ্রোহ বা ধর্ম্ম-কর্ম্মের সংস্কারজন্য পরিচ্ছিন্নতা আনন্দময় কোষেই প্রকাশ পায়। যাহার জ্ঞান বা অধিকার যত উচ্চে, তাহার বিষাদও তত উচ্চস্তরের হয়। পুতুলটি ভাঙ্গিয়া গেলে শিশু কাঁদে; কিন্তু জ্ঞানবান্ ব্যক্তি উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতেও বিচলিত হয় না; কিন্তু তাই বলিয়া কি বুঝিতে হইবে—তাহার দুঃখ হয় না ! একাকী অশ্বারোহণে বনে গমন করাই সুরথের মহাবিষাদের সূচনা করিলেও আমরা কিন্তু দেখিতে পাই—উহা একটী সাধনাবিশেষ; বিষাদের বহির্লক্ষণমাত্র নহে।

একাকী বনে গমন করার মধ্যে কিরূপ সাধনরহস্য লুক্কায়িত আছে, এইবার আমরা তাহার আলোচনা করিব। প্রথমে মন্ত্রস্থ

শব্দগুলির অর্থ বুঝিয়া লইতে হইবে। 'মৃগয়া' শব্দের অর্থ—অন্বেষণ অর্থাৎ আত্মানুসন্ধান! অন্বেষণার্থক মৃগ্ ধাতু হইতে মৃগয়াশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'হয়' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়রূপ অশ্ব। কঠোপনিষদে উক্ত আছে—"ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ।" 'গহন বন' শব্দের অর্থ—বিষয়ারণ্য। রূপ রসাদি বিষয়সমূহের সহিত গহন বনের সাদৃশ্য ভাগবতাদি বহু প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব সমুদয় মন্ত্রটির অর্থ এই যে ভাবসমরে পরাজিত হইয়া, জীব আত্মানুসন্ধানের ছলে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বে আরোহণ করিয়া, অতি গহন বিষয়ারণ্যে গমন করিল।

জীব প্রথমতঃ আত্মলাভের জন্য উদ্যত হইয়া, চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধ করিতে যত্নবান্ হয়। বাহ্যবিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া, নানাবিধ যোগ-কৌশলাদি উপায়ের অনুষ্ঠান করিতে থাকে, কিন্তু যথার্থ অমরত্বের সন্ধান পায় না; যথার্থ শান্তির—আনন্দের কেন্দ্র খুঁজিয়া পায় না; সর্ব্বত্রই সংস্কার বা ভাবরাশির দ্বারা উৎপীড়িত হইতে থাকে। তখন স্নেহময়ী মা আমার আদরের সন্তানকে এক সরল পন্থায় লইয়া যান। এতদিন সে মাকে চাহে নাই, চাহিয়াছে সংযম, চাহিয়াছে যোগধ্যান, চাহিয়াছে সিদ্ধি শক্তি; কাজেই এতদিন এই ঋষিজনসেবিত সরল পন্থাটি চক্ষুতে পড়ে নাই। বার বার প্রতিহত হইয়া, বহুবার বিফলপ্রযত্ন হইয়া, যথার্থ মাতৃ-অন্বেষণ প্রাণে ফুটিয়াছে; তাই, এইবার ইন্দ্রিয় অশ্বে আরোহণ-পূর্ব্বক বিষয়ারণ্যে গমন ও মায়ের সন্ধান আরম্ভ হইয়াছে।

ইহাই বুদ্ধিযোগ। গীতায় এই বুদ্ধিযোগের সূচনা হইয়াছে—"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।" যাহা দ্বারা আমাকে—আত্মাকে পাওয়া যায়, সেই বুদ্ধিযোগ জীবকে প্রদান করি। ইহা ভগবানের স্বমুখনির্গত অভয়বাণী। গীতায় যে মোক্ষফলপ্রদ কল্পতরুর বীজ-বপন হইয়াছে, দেবীমাহাত্ম্যে তাহা ফলপুষ্প-সমৃদ্ধ বনস্পতিরূপে পরিণত হইয়া, জীবকে ধন্য করিতেছে। জীব যখন গুরুকৃপায় বুদ্ধিযোগে অধিকার লাভ করে, তখন তাহার অধ্যবসায় কিরূপভাবে কার্য্যকরী হয়, তাহাই বলিতে গিয়া মহর্ষি বলিলেন—মৃগয়াচ্ছলে অরণ্যে প্রবেশ।

জীব যখন অন্তররাজ্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও মায়ের সন্ধান পায় না, (কারণ, তখনও অন্তর জিনিষটা ঠিক বুঝিতে পারে না) তখন অগত্যা আবার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়রাশির সমীপে উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ এই বিষয়কে—এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি ভোগ্য বস্তুকে নশ্বর ও মিথ্যা বলিয়া বিষবৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর-রাজ্যে প্রবেশ করে। (বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ সাধক এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই সাধনাপথে অগ্রসর হয়)। তারপর অনেক ঘুরিয়া আবার সেই বিষয়-অরণ্যে প্রবেশ করে; তবে একটু পরিবর্ত্তন হয়,—পূর্ব্বে বিষয়মাত্র বোধে বিষয়ভোগ করিত, এইবার মৃগয়াচ্ছলে—আত্মানুসন্ধানের ছলে। প্রথমে ছল করিয়া বা নকল করিয়াই বিষয়ে বিষয়ে মাতৃ-অনুসন্ধান জাগিয়া উঠে; কারণ, বুদ্ধিযোগের প্রথম অবস্থায় সাধক মনে করে, বিষয় ত' আর যথার্থ মা নহে। বিষয়সমূহ ক্ষুদ্র, মা আমার অনন্ত; বিষয় ভাবের ঘনীভূত অবস্থা; মা আমার ভাবাতীতা! বিষয় অজ্ঞান-মাত্র; মা আমার জ্ঞানময়ী। সুতরাং বিষয়ে বিচরণ করিয়া কি বিষয় হইতে অত্যন্ত বিরুদ্ধ মায়ের সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা আছে? তবে কি করা যায়! অন্তর রাজ্যে যখন অমৃতের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন অগত্যা বহিঃরাজ্যে বিষয়ে বিষয়ে অনুসন্ধান করা ক্ষতি কি? তাই, যেন ছল করিয়া, নকল করিয়া ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ে বিষয়ে মাতৃ-অনুসন্ধান আরম্ভ করে; কিন্তু কিছুদিন পরে দেখিতে পায়—ইহা ছল নহে, যথার্থই অনুসন্ধান। আর একটি কথা এই স্থানে বলিয়া রাখিতেছি—মৃগয়া আত্মানুসন্ধান। ইহা বাহিরে অনুসন্ধানের আকারে প্রকাশ পাইলেও ফলতঃ এই স্থান হইতেই আত্মলাভ সংসূচিত হয়। যেহেতু স্থূল বিষয়ে মাতৃ-বোধ হইলেই, যথার্থ মাতৃ-লাভের আরম্ভ হয়।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ে বিচরণ করিলে, কিরূপে মাতৃ-অনুসন্ধান বা মাতৃলাভ সংঘটিত হয়, এইবার তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। যে কোন পদার্থ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হউক—ইন্দ্রিয়-অশ্ব স্বেচ্ছায় পরিচালিত হইয়া, যে কোনও পদার্থের সম্মুখে তোমায় উপস্থিত

করুক, উহাকেই মা বলিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। চক্ষু রূপ আনিয়া উপস্থিত করিল, তুমি তাহা মায়েরই রূপ বলিয়া গ্রহণ কর। কর্ণ শব্দের নিকট উপস্থিত করিল, তুমি উহাকে মাতৃ-আহ্বান বা মায়েরই কণ্ঠস্বররূপে গ্রহণ কর। নাসিকা সৌরভ-সমীপে সমুপনীত করিল, তুমি মাতৃ-অঙ্গ-নিসৃত সুগন্ধরূপে গ্রহণ কর। রসনা বিচিত্র রসের নিকট উপস্থিত করিল, তুমি 'রসো বৈ সঃ' বলিয়া মাতৃ-আস্বাদনে অমৃতায়মান হও। ত্বক্ তোমায় কমনীয় স্পর্শে কণ্টকিত করিল, তুমি স্নেহময় মাতৃকর-স্পর্শে পুলকিত হও। এইরূপ এক সূর্য্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যাহা কিছু কর, সকলই যেন মাতৃ-পূজারূপে পর্য্যবসিত হয়। "যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্" ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর। শুধু মুখে বলিলে যথার্থ ফললাভ হইবে না। ভাবের বিরুদ্ধে, বিষয়ের বিরুদ্ধে, সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়াছ, ক্ষত বিক্ষত হইয়াছ; এইবার অনুকূলে পরিচালিত হও, অথচ তাহারই মধ্যে মাতৃ-সম্বেদনে পুনঃ পুনঃ সম্বেদিত হইতে থাক। বহুদিন, বহুজন্ম বহুযুগ ধরিয়া জগদ্ভাবে অভ্যস্ত, জগদ্ভাবে পরিচালিত, জগদ্ভাবেই বিমুগ্ধ; তাই, জগদ্ভোগই কর; কিন্তু মা বলিয়া কর। যাহা কিছু দেখিবে, যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু ভাবিবে, সবই যে মহামায়ার বিভিন্ন মূর্ত্তি, এই বুদ্ধিতে উদ্‌বুদ্ধ হও! এই সুকৌশল কর্ম্মই বুদ্ধিযোগ, ইহাই মোক্ষপন্থার আবিষ্কারক। সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত বেদ, সমস্ত দর্শন এই একটি কথাই বলিয়াছে। "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং; স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যং; আত্মৈবেদং সর্ব্বম্; সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি সহস্র সহস্র শাস্ত্রপ্রমাণও আছে। "ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী" এ কথাটি মানুষ মাত্রেই জানেন, বহুবার শুনিয়াছেন, কিন্তু অতি অল্প লোকেই উহা অনুভব করেন। শিখিবার কিছুই নাই, শিখাইবার কিছুই নাই, জানিবার বাকী কিছু নাই, শুনিবার বাকী কিছু নাই; শুধু যাহা শিখিয়াছ, যাহা জানিয়াছ, যাহা শুনিয়াছ, তাহা কার্য্যে পরিণত কর। উহাই যথার্থ সাধনা।

এই বুদ্ধিযোগই তোমার চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত করিবার অব্যর্থ অস্ত্র। তোমার মন বলিবে—সম্মুখে যাহা দেখিতেছ, উহা একটি বৃক্ষমাত্র; তোমার বুদ্ধি যেন জোর করিয়া বলে—না, উহা বৃক্ষরূপিণী মা; মা আমার বৃক্ষের ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। প্রথম প্রথম ইহা নকল করা মাত্র মনে হইতে পারে। তাই ঋষি বলিলেন—'মৃগয়াব্যাজেন' বাস্তবিক কিন্তু উহা ছল বা নকল নহে। আমাদের অবিশ্বাসী মন প্রথমতঃ বুঝিতে পারে না, অথবা স্বীকার করিতে চায় না যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎরূপে একমাত্র মহামায়াই নিত্য বিরাজিত। মনের চাতুরীতে, ইন্দ্রিয়ের ধূর্ত্ততায় তুমি প্রতারিত হইও না। উহাদেরই কুটিল প্ররোচনায় এই বুদ্ধিযোগের উপক্রমটি তোমার নিকট নকল করা রূপে প্রতীয়মান হইলেও ইহার অনুষ্ঠানে বিমুখ হইও না। বুদ্ধি দ্বারা সর্ব্বত্র সত্যের প্রতিষ্ঠা কর—সর্ব্বব্যাপী মাতৃ-সত্তায় বিশ্বাসবান্ হও; দেখিবে—ইহার পরিণাম কত মধুময়। গীতা বলেন—"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।" সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে সত্যদর্শন করিলে সত্যলাভ হয়।

মাকে তুমি যেমনভাবে চাও—যে মূর্ত্তিতে মাকে দর্শন করিবার জন্য তোমার প্রাণ লালায়িত, মনে কর—তোমার সম্মুখেই মা আমার সেইরূপ ভাবে উপস্থিত হইলেন; তখন তুমি মাকে পাইয়া যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাক, ঠিক সেইরূপ ব্যবহার প্রত্যেক জড় পদার্থের নিকট করিতে থাক। মিথ্যাবাদী রাখাল বালকের ন্যায় মিথ্যা করিয়া বল—"মা! এই আমি তোমায় পাইয়াছি। মা! এই আমি তোমায় ধরিয়াছি," বলিয়া হয়ত গাছটা মাটিটা পাথরটাকে জড়াইয়া ধরিবে, তাহাতেই আত্মহারা হইতে চেষ্টা করিবে, মা বলিয়া প্রত্যক্ষ মায়ের নিকট সন্তপ্ত হৃদয়ের যত কিছু আবেদন নিবেদন নির্ব্বিচারে করিতে থাকিবে। এইরূপ নকল ভক্তি, নকল মাতৃ-লাভ, নকল মৃগয়া আরম্ভ কর, অচিরে যথার্থ ভক্তিতে উপনীত হইতে পারিবে। যদি তোমার প্রাণে যথার্থ মাতৃ-লাভের ইচ্ছা জাগিয়া থাকে, তবে আর বিচার বিতর্ক

বিজ্ঞানের যুক্তি প্রভৃতির মধ্যে না যাইয়া, সরল প্রাণে এই সত্য পথটি অবলম্বন কর। এইখান হইতে এইরূপ ভাবে মাতৃ-লাভ আরম্ভ হউক। আগে জগদ্‌রূপিণী মাকে দেখ—জগদ্‌রূপিণী মায়ের উপভোগ কর; তারপর জগদতীতা মায়ের সন্ধান পাইবে। জগৎ ছাড়িয়া—পঞ্চভূত ছাড়িয়া, ভাবরাশি পরিত্যাগ করিয়া, মাকে বুঝিবার দিন—অনেক দূরে। আগে স্থূলে—প্রত্যক্ষ মাকে ধর, তারপর সূক্ষ্মে—অব্যক্ত ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে। দেখ, ভগবান বস্তুটি দুর্ল্লভ নহে, পরন্তু অতি সুলভ; দুর্ল্লভ আমরা। কারণ আমরাই তাঁহাকে চাই না। জগতে অর্থোপার্জ্জন কিংবা কোন একটা বিষয়ের আহরণ করিতে মানুষ যতটা চেষ্টা করে, ভগবান্‌কে লাভ করিতে ততটা চেষ্টারও আবশ্যক হয় না; এত নিকটে তিনি, এত প্রত্যক্ষ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ জিনিষ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা মা। বিনা প্রযত্নে লাভ হয়। যাঁহারা বলেন—কঠোর যোগ ধ্যান সন্ন্যাস ইত্যাদি ব্যতীত তাঁহার দর্শন-লাভ ঘটে না, তাঁহারা পুস্তক পড়িয়া বা পরের মুখের উপদেশ শুনিয়া উহা বলিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্র সুপ্রকট—শুধু যিনিই আছেন, আর কিছুই নাই—তাঁহাকে দর্শন করা দুর্ল্লভ হইবে কেন? দুর্ল্লভ—ঐ বিশ্বাসটী; তিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত—এই বিশ্বাসই দুর্ল্লভ। যত কিছু আয়োজন, যত কিছু কঠোরতা, ঐ বিশ্বাসটুকু লাভ করিবার জন্য। "এই তিনি প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন" এই বিশ্বাস হইলেই যে বিগতশ্বাস হওয়া যায়। সেই মুহূর্ত্তে (অতি অল্প সময়ের জন্য হইলেও) শ্বাসরোধ হইয়া যায়—বিনা চেষ্টায় কুম্ভক সিদ্ধ হয়। বিশ্বাস হইলেই যে বি-শ্বাস হয়, ইহা বুঝিতে না পারিয়া, কত সাধক কত কৌশলের সাহায্যে শ্বাসরোধ করিয়া, চিত্ত স্থির করিতে চেষ্টা করেন। প্রাণপাত তপস্যা, কঠোর বৈরাগ্য প্রভৃতি অবলম্বনেও যে, মায়ের সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহার কারণ—মাকে না চাওয়া। অনেকে তপস্বী হইবার জন্য তপস্যা করেন—মাকে চাহেন না। সাধু হইবার জন্য ত্যাগমার্গ অবলম্বন করেন—মাকে চাহেন না। মা যে আমার কল্পতরু। যাহা

চাহিবে, তাহাই পাইবে। যোগী তপস্বী বিরাগী হইবার জন্য সাধনা করিলে, তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিবে। কিন্তু সে অন্য কথা।

আমরা যে সত্যপ্রতিষ্ঠা বা বুদ্ধিযোগের কথা বলিয়াছি, উহাই বৈদিক যুগের ব্রহ্মর্ষিদিগের সরল সত্যসাধনা। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—"মনোব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" মনকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিবে। মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা এবং জগতের প্রত্যেক পদার্থে সত্যপ্রতিষ্ঠা করা ঠিক একই কথা। মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা কথাটি সরল ভাষায় সাধারণকে বুঝাইতে গেলে, ঠিক এই সত্যপ্রতিষ্ঠার কথাই বলিতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগৎটা মনের ভাব বা মন; সুতরাং জগতের প্রত্যেক পদার্থে ব্রহ্মদর্শন করিলে, বস্তুতঃ মনকেই ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা হয়। যাহা হউক, আমরা বহু প্রমাণ-প্রয়োগ ও যুক্তি উপস্থিত করিয়া, বিষয়টীকে আরও বিস্তৃত করিতে চাই না। পিপাসু সাধকগণের নিকট যুক্তি প্রমাণের অপেক্ষা থাকে না।

বুদ্ধিদ্বারা ভগবানে যুক্ত হওয়ার নামই বুদ্ধিযোগ। আমাদের অন্যান্য তত্ত্বগুলি অপেক্ষা বুদ্ধিতত্ত্ব সমধিক সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ। বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্বেই চৈতন্যের সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তি, সুতরাং বুদ্ধি দ্বারা যত সহজে ভগবানে যুক্ত হওয়া যায়, প্রাণ মন কিংবা ইন্দ্রিয় দ্বারা তত সহজে যুক্ত হওয়া যায় না; কারণ উহারা বুদ্ধি অপেক্ষা স্থূল ও সমধিক জড়ধর্ম্মী। সমধর্ম্ম পদার্থদ্বয়ের মিলন যত সহজে নিষ্পন্ন হয়, অসমানধর্ম্ম পদার্থদ্বয়ের মিলন তত সহজে হয় না। জল ও মাটির মিশ্রণে যতটুকু যত্ন আবশ্যক, জলের সহিত জলের মিশ্রণ তদপেক্ষা অল্প প্রযত্নসাধ্য। জলের সহিত বায়ুর যোগ যত আয়াসসাধ্য, কিন্তু বায়ুর সহিত বায়ুর মিলন তদপেক্ষা অনেক অল্পায়াসসাধ্য। এইরূপ, আকাশের সহিত আকাশের মিলনে কোনরূপ প্রযত্নেরই প্রয়োজন হয় না। ঠিক এইরূপ বুদ্ধি দ্বারা আত্মায় যুক্ত হইয়া থাকা অতি অল্পায়াসেই সম্পন্ন হয়। আত্মা—মা আমার, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম; সুতরাং তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে হইলে, আমাদিগের যে অংশটী

সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহা দ্বারাই যুক্ত হইতে হইবে। প্রথমেই যদি মন কিংবা ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা মায়ের সহিত যুক্ত হইতে যাই, তবে বিফলমনোরথ হইতে হইবে; কারণ, মা নিত্য-স্থিরা নির্ব্বিকল্পা, আর মন অতিশয় চঞ্চল ও সঙ্কল্পবিকল্পময়। কিন্তু প্রথমতঃ স্থিরবুদ্ধি দ্বারাই মাতৃ-যুক্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। এইরূপ বুদ্ধি-যোগে অভ্যস্ত হইলে কিছুদিন পরে ধীরে ধীরে প্রাণ মন ইন্দ্রিয় দ্বারাও ক্রমে যুক্ত হওয়া যায়। সাধারণতঃ আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর রূপরসাদি বাহ্য বিষয়গুলির চাপ পড়ে; পরে ঐ বিষয়-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের চাপ পড়ে মনের উপর এবং বিষয়াবচ্ছিন্ন মনের চাপ পড়ে বুদ্ধির উপর। তাই, বুদ্ধি অনবরত বিষয়াকারেই প্রকাশিত হইতে থাকে; কিন্তু ভিতরের দিক হইতে যদি বুদ্ধিটি মাতৃ-যুক্ত করিয়া রাখা যায়, তবে সেই ভগবদ্‌ভাবান্বিতা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির চাপ মনের উপর পড়ে, তাহারই ফলে মনোযোগ আরম্ভ হয় অর্থাৎ মন দ্বারাও ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া যায়। মনোযোগ আরম্ভ হইলে, ইন্দ্রিয় দ্বারা যুক্ত হওয়া আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হয়। কিছুদিন চেষ্টা করিলেই ইহা সুসিদ্ধ হইতে পারে। এই বুদ্ধিযোগের ফল অতি চমৎকার! ইহা ঠিক হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ন্যায় সূক্ষ্মমাত্রায় প্রযুক্ত হইয়া, জীবনী শক্তির উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে; ক্রমে স্থূলে আসিয়া শক্তিপ্রকাশ-পূর্ব্বক ভবব্যাধি চিরদিনের জন্য উন্মূলিত করিয়া দেয়।

সে যাহা হউক, এই মন্ত্রে আর একটী শব্দ আছে—একাকী। বুদ্ধিযোগের অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। বাহিরে কোনরূপ আয়োজন কিংবা অনুষ্ঠান না করিয়া, মানুষমাত্রেই উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় আপন মনে একাকী এই সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। যাঁহারা সাধক, তাঁহারা মৃগয়াচ্ছলে আত্মানুসন্ধান ব্যপদেশে, একাকীই এই বিষয়ারণ্যে বিচরণ করে। একা না হইলে যে একক-সখাকে পাওয়া যায় না। মা আমার একা। তাই আমাদেরও একা হইতে হইবে; নতুবা মাকে পাইব কিরূপে? সাধক! যে মুহূর্ত্তে তুমি একাকী হইতে পারিবে, সেই মুহূর্ত্তেই মাকে

লাভ করিবে। এক—অদ্বিতীয় বস্তুকে পাইতে হইলে, একাকী হইতেই হইবে। মা যে আমার বড় স্বার্থপরা। একা না হইলে আসেন না। মায়ের ইচ্ছা, একা আমাকে আদর করিবেন, একা আমাকে স্নেহধারায় অভিষিক্ত করিবেন; কিন্তু আমরা যে একমুহূর্ত্তের জন্যও একা হইতে পারি না; সংসারত্যাগই করি, আর অরণ্যে পর্ব্বতে কিংবা গিরিগুহায়ই বাস করি, যথার্থ একা কিছুতেই হইতে পারি না। আমার সবটা প্রাণ মাকে দিবার জন্য এক মুহূর্ত্তও একা হইয়া বসিতে পারি না।

সুরথ কিন্তু একাকী হইয়াও হইতে পারে নাই; ঐ হয়টি—ইন্দ্রিয়-অশ্বটী সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। যখন একা হইতে পারিবে, তখন ত' সে মনু হইবে! এইমাত্র তাহার সূচনা। একা হওয়ার জন্যই ত' সাধনা। সংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বাস করিলেই একা হওয়া যায় না। যতদিন মন আছে, ততদিন একা হইবার উপায় নাই। অথবা কেন হওয়া যাইবে না! যখন মাকে পাওয়া যায়, যখন মাতে আত্মহারা হওয়া যায়; যখন আমি ও মা, দুইটি পৃথক বোধ থাকে না, এক অখণ্ড ঘন সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবস্থান করা যায়, তখনই একা হওয়া যায়। না, সে অবস্থায় একত্ববোধও থাকে না। একত্বজ্ঞানও দ্বিত্বাদি বোধকে অপেক্ষা করে, দ্বিতীয় বোধের অভাবে একত্ববোধও থাকে না। সে যাহা হউক, ও সব বড় কথায় আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা জানিব—মা! একা আসিয়াছি, একা চলিয়া যাইব। জন্মিবার সময় কেহ সঙ্গে আসে নাই, মৃত্যুর দিনেও কেহ সঙ্গে যাইবে না; তবে কেন মধ্য সময়টায় কতকগুলি উপসর্গ যোগাড় করিয়া দিয়া, আমাকে বহু করিয়া দিলি। মা! প্রতিনিয়ত এই বহুত্বের জ্বালায় জ্বলিয়া মরি, অথচ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। মা! তুমি যে একা অদ্বিতীয়া! আমাকেও একা কর। এই বহুত্বের মধ্যে—এই সর্ব্বভাবের মধ্যেও যে তুমি এক অখণ্ড স্বরূপে বিদ্যমান! আমায়ও এই বহুত্বের মধ্যে একত্বে—মহাসত্যে প্রতিষ্ঠিত কর। আমিও বহুর মধ্যে একের সন্ধান পাইয়া একা হই।

যাহারা সত্যলাভের জন্য লালায়িত, তাহারা মধ্যে মধ্যে নিজেকে

একাকী—নিতান্ত অসহায় বলিয়া মনে করিবে, শত শত বন্ধুজনে পরিবেষ্টিত হইয়া, শত শত আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অবস্থান করিয়াও নিজেকে প্রতিমুহূর্ত্তে একাকী বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে। যখন ভুলিয়া থাক, ক্ষতি নাই ; কিন্তু যখন মায়ের কথা মনে পড়িবে, অমনি সেই মুহূর্ত্তে মন হইতে সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবে। আমার বলিতে কেহ নাই—আমি একা। "একমাত্র একক-সখা—চিরজীবনের অদ্বিতীয় সহচর তুমি মা আমার।" সাধ্যানুসারে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজে একা হইতে চেষ্টা করিবে। একা হইতে হয়—মনে। মনে মনে নিজে সর্ব্বদা একা ভাবিতে অভ্যস্ত হইলেই বিষয়াসক্তি কমিয়া আইসে। পুনঃপুনঃ মৃত্যু চিন্তা ইহার বিশেষ সহায়তা করে। বৃন্দাবনে গোপীগণ যথাসাধ্য একা হইতে পারিয়াছিল বলিয়াই, একক-সখা শ্রীকৃষ্ণকে একাকী সম্ভোগ করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছিল। আর এখানেও দেখিতে পাই—সুরথ অনেকটা একাকী হইয়াছিল বলিয়াই, মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া জীবন ধন্য করিয়াছিল। এস সাধক! আমরাও একা হইতে যথাশক্তি সচেষ্ট হই।

স তত্রাশ্রমমদ্রাক্ষীদ্দ্বিজবর্য্যস্য মেধসঃ।
প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্ ॥৪৯॥

অনুবাদ। সুরথ সেখানে (অরণ্যমধ্যে) দ্বিজবর মেধসের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঐ আশ্রমটি প্রশান্ত শ্বাপদসমূহের দ্বারা আকীর্ণ, এবং মুনিশিষ্যগণ কর্ত্তৃক উপশোভিত।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মৃগয়াচ্ছলে গহন বনে বিচরণ করিতে করিতে, অর্থাৎ নকল করিয়া বিষয়ে বিষয়ে বুদ্ধিযোগের সাহায্যে আত্মানুসন্ধানরূপ সত্য-প্রতিষ্ঠা করিতে করিতে মাতৃ-কৃপায় একদিন সাধক দেখিতে পায়—তাহার সম্মুখে এক অভিনব অদৃষ্টপূর্ব্ব স্নিগ্ধ চৈতন্যময় আকাশ প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ আকাশ এত প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত যে, আর নকল বা কল্পনা বলিবার উপায় থাকে না। উহার

দর্শনমাত্র প্রাণ যেন অমৃতরসে নিমগ্ন হয়, অবিশ্বাসী চঞ্চল মন স্থির হয়, সে শুভ্র সত্য-জ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। হৃদয়ে চিরসঞ্চিত সন্তাপসমূহ যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। প্রথমে ঐ চিদাকাশ মলিন ভাবাপন্ন, চঞ্চল ও অতি অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। ক্রমে সত্য-প্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত হইলে, উহা শুভ্র, নির্ম্মল ও বহুক্ষণ স্থায়ী হয়, ইচ্ছামাত্রেই দর্শন করা যায়। তখন সাধক বড় আনন্দ লাভ করিতে থাকে। সুরালুব্ধ মদ্যপায়ীর ন্যায় আকুল আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইতে থাকে। সমস্ত জগৎ ভুলিয়া শুধু ঐ জিনিষটা নিয়াই যেন অনায়াসে অবস্থান করা যায়, এইরূপ মনে হইতে থাকে। ক্রমে মায়ের কৃপায় ঐ আকাশ নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া সাধকের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে থাকে। কখনও পীত, কখনও বা রক্তবর্ণের অত্যুজ্জ্বল স্নিগ্ধজ্যোতি নয়ন পথে সমুদ্ভাসিত হইতে থাকে। ক্রমে ঐ জ্যোতি অতিশয় শুভ্র শান্ত ও নির্ম্মল হইয়া অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে ও জগৎসত্তা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। ইহারই নাম অরণ্যমধ্যে সুরথের মেধসাশ্রম দর্শন।

মেধস শব্দের অর্থ মেধা বা স্মৃতিশক্তি। যাহাতে আত্ম-স্মৃতি উদ্বুদ্ধ করে, তাহাই মেধস্-পদ-বাচ্য। বুদ্ধিতত্ত্বে আরোহণ করিতে পারিলে, অর্থাৎ বুদ্ধিজ্যোতি উদ্ভাসিত হইলে—আত্ম-স্মৃতি উপস্থিত হয়; তাই, ইহাকে বুদ্ধির স্থান বলা হইয়া থাকে। দ্বিজবর্য্য শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, তিন বর্ণই দ্বিজশব্দ-প্রতিপাদ্য। এই তিন বর্ণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি দ্বিজবর্য্য। নীতিশাস্ত্রেও উক্ত আছে—'বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ'।

ধী বা বুদ্ধিতত্ত্বই ব্রাহ্মণ। ধী এবং মেধা প্রায় অভিন্ন। এই ধী যখন প্রথম উন্মেষিত হইতে থাকে, তখন উহা স্মৃতির আকারেই প্রকাশ পায়। তাই এস্থলে বুদ্ধি বা ধী না বলিয়া মেধস্ বলা হইয়াছে। বুদ্ধিতত্ত্বেই ব্রহ্মের বা নির্গুণ চৈতন্যের সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তি। জীব এই বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আত্মবোধ উপসংহৃত করিতে পারিলেই, ব্রহ্মস্বরূপ অবগত হইতে পারে। তাই, ধীকেই ব্রাহ্মণ বলা হয়। জগতের ব্রাহ্মণ-বর্ণও এই ধী-শক্তি লাভ করিয়াই জগৎপূজ্য। প্রতিদিন

ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীমন্ত্রে এই ধী-শক্তির প্রার্থনা করেন, এবং উহা জগৎময় ছড়াইয়া দিয়া, ধীরে ধীরে সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের বীজ বপন করিয়া, জীবসঙ্ঘকে মহাসত্যের দিকে আকর্ষণ করেন। তাই, ব্রাহ্মণ এত পূজ্য; তাই, কৌস্তুভ-লাঞ্ছিত বিষ্ণুবক্ষে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন সুশোভিত। ব্রাহ্মণ মাতৃ-অঙ্কস্থিত নগ্নশিশু। জগন্মঙ্গলই ব্রাহ্মণের ব্রত। ব্রাহ্মণের আসন যে কত উচ্চে, ব্রাহ্মণগণ যে আমাদের কি উপকার করেন, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। ব্রহ্ম অজ্ঞেয় অগম্য; কিন্তু ব্রাহ্মণ নিত্যাশ্রয়। ব্রাহ্মণরূপ মহাকেন্দ্র স্থির আছে বলিয়াই জীবসঙ্ঘ—সৃষ্টিচক্র স্থির আছে; নতুবা কক্ষচ্যুত গ্রহমালার ন্যায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত। আচার্য্যগণ যে ভক্তের আসন ভগবানেরও উচ্চে দিয়াছেন, ইহা স্তুতিবাদ নহে। ভক্ত-হৃদয়েই ভগবান্ নিত্য বিরাজিত। ভক্তই সাকার ভগবান্! ভক্ত-দর্শন হইলেই ভগবদ্দর্শন হয়। এই ভক্তই ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্মণই ভক্ত। ব্রহ্মজ্ঞান এবং পরাভক্তি বা প্রেম একই কথা। ব্রাহ্মণ—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই যথার্থ ভক্ত বা প্রেমিক। কিন্তু সে অন্য কথা :—

আমরা মেধার স্থান বা বুদ্ধিময় ক্ষেত্রকেই মেধসের আশ্রম বলিয়া বুঝিব। এই স্থানই ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মুক্ত দ্বার। সাধকের সুষুম্না-প্রবাহ উন্মেষিত হইলেই সে এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারে। সাংখ্যদর্শনের ভাষায় এই স্থানকে মহত্তত্ত্ব বলা যায়। এই মহত্তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, জীবের অজ্ঞান-গ্রন্থি সম্পূর্ণ শিথিল হইয়া যায়। তান্ত্রিকগণের কুলকুণ্ডলিনী-জাগরণেরও ইহাই লক্ষণ।

এই মেধসাশ্রমের দুইটি বিশেষণ আছে; একটী 'প্রশান্ত-শ্বাপদাকীর্ণ' এবং অপরটী 'মুনিশিষ্যোপশোভিত'। সেখানে শ্বাপদ জন্তুগণ পরস্পর হিংসা ভুলিয়া প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করিতেছে। শার্দ্দূল-মৃগ, ময়ূর-ভুজঙ্গ, অহি-নকুল প্রভৃতি প্রাণিগণ স্বভাব-বৈরতা পরিহারপূর্ব্বক মিত্রভাবে অবস্থান করিতেছে। চতুর্দ্দিকে মুনি—মৌনভাবাপন্ন শিষ্যগণ ব্রহ্মধ্যানে নিরত রহিয়াছেন। কখনও বা শিষ্যবৃন্দের মৌনভাব বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহাদের পুষ্কল স্তোত্র

দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছে। কখনও বা তাঁহাদের আহুতি-সকল অগ্নিতে অর্পিত হইয়া, পূত-হব্যগন্ধে সর্ব্বতঃ সৌরভ বিস্তারপূর্ব্বক দূরস্থিত জনগণের প্রাণেও পবিত্র সাত্ত্বিকভাব আনয়ন করিতেছে। হায়! এরূপ আশ্রম কি আর আমরা দেখিতে পাইব! যেখানে গেলে স্বর্গকেও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে! যেখানে প্রতিবৃক্ষ প্রাণময়—সত্যভাবে সম্বুদ্ধ! যেখানে মৃত্তিকা নিয়ত সত্যসম্বেদনে সঞ্জীবিত, যে আশ্রমে বায়ু সত্যভাবমাত্র বহন করে! যেখানে ব্যোমমণ্ডল সত্যনাদের সত্যকম্পনে নিত্য তরঙ্গায়িত! এরূপ ঋষির আশ্রম আবার দেখিতে পাইব কি? ভারত যাহাতে গৌরবান্বিত, দ্বাপরের শেষ হইতে সে গৌরবের চিহ্ন পর্য্যন্ত যেন ভারত-বক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে! পূতনামা ঋষিবৃন্দের পূতচরণরেণু-স্পর্শে পূত ভারতবক্ষে ভগবান্ আবার ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইবেন? যাঁহারা গৃহী কি সন্ন্যাসী, আশ্রমী কি দণ্ডী, কিছুই বলা যায় না; যাঁহাদের স্ত্রী পুত্র ধান্য পশু সবই ছিল; অথচ কিছুই ছিল না; যাঁহারা এই সকলের মধ্যে অবস্থান করিয়াও বিশ্বের কল্যাণ-সাধনে নিরত থাকিতেন। এখন চারিদিকে কত অবতারের নাম শুনিতে পাই, কত স্থানে মঠ দেখিতে পাই! কিন্তু কই, এরূপ ঋষির আশ্রম ত' একটীও দেখি না! মা কবে তুমি ব্রহ্মর্ষিরূপে আবার আবির্ভূত হইবে? কবে আবার সত্যধর্ম্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে?

সে যাহা হউক, আধ্যাত্মিক ভাবে ঐ দুইটী বিশেষণের রহস্য অবগত হইতে চেষ্টা করা যাউক। বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে বা মহত্তত্ত্বে উপনীত হইলে দেখিতে পাওয়া যায়—পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবসমূহ স্থিরীভাব অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব্বে ভাবরাশি একটীর পর একটী অনাহূত ভাবে উপস্থিত হইয়া, সাধককে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, এখন সাক্ষিমাত্রস্বরূপ উদাসীন বুদ্ধি-জ্যোতির বিকাশে সাধক দেখিতে পায়, উহারা যেন সম্পূর্ণ স্থিরভাবে দর্পণ-দৃশ্যমান নগরীর ন্যায় অবস্থান করিতেছে। বৃত্তিগুলির সেই পাশবিক চঞ্চলতা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। যাহারা পূর্ব্বে প্রতিনিয়ত সাধককে চঞ্চল করিয়া

রাখিয়াছিল, এখন বুদ্ধিজ্যোতির তলদেশে পড়িয়া তাহারা স্থির ও প্রশান্তভাবে যেন ছায়ার ন্যায় অবস্থান করিতেছে ; এইরূপ উপলব্ধি হইতে থাকে। ইহাই প্রশান্ত শ্বাপদাকীর্ণ অবস্থা। কাম ক্রোধাদি বৃত্তিগুলি শ্বাপদ-স্থানীয়। বুদ্ধিতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে ইহারা প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করে।

কেবল ইহাই নহে, সেই স্থানটী মৌনভাবাপন্ন শাসনযোগ্য শিষ্যবৃন্দ দ্বারা উপশোভিত। পূর্ব্বে বলিয়াছি—বুদ্ধিজ্যোতির প্রকাশে ভাব বা বৃত্তিগুলি প্রশান্ত হয়। সেই ভাব সমূহের মূল কোথায় ? শব্দে ;—শব্দশূন্য ভাব হয় না। তুমি বৃক্ষ চিন্তা করিতেছ, একটু স্থির ভাবে মনের দিকে লক্ষ্য কর—দেখিবে, তোমার মনের মধ্যে "বৃক্ষ বৃক্ষ বৃক্ষ", এইরূপ একটী শব্দ হইতেছে। অথবা গান শুনিতেছ। সেই সময় ধীরভাবে আপন মনের দিকে লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে —তোমারই মনের ভিতরে গান হইতেছে। এইরূপ সর্ব্বত্র। বেদান্তের ভাষায় ভাবের সংজ্ঞা—নাম ও রূপ। শব্দ নাই অথচ নাম আছে ; ইহা হয় না। আমাদের মনে যখন যে কোন ভাবই জাগুক না কেন, উহা কতকগুলি শব্দ-সমষ্টিমাত্র। শব্দ হইতেই ভাবের উৎপত্তি। ঐ শব্দগুলি যদিও ধ্বনির আকারে বাহিরে আসে না, তথাপি উহা যে নীরবতার শব্দ তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। প্রত্যেকেই ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

যাহা হউক, ভাব স্থির হইলেই, তদুৎপাদক শব্দরাশি স্বতঃ স্থির হইয়া যায়। সেই জন্য মন্ত্রেও মুনি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদের মনটা দিবারাত্র যেন পাগলের মত কেবল বকে ; তাই, আমরা এত চঞ্চল। বুদ্ধিতত্ত্বের সাক্ষাৎকারে ঐ বকুনিটা থামিয়া যায়। মনে আর কোনরূপ শব্দ কিংবা চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয় না। শিষ্য শব্দের অর্থ শাসন-যোগ্য। ভাবসমূহ স্থির হওয়াতে তদুৎপাদক শব্দসমূহ আর শুনিতে পাওয়া যায় না, এবং উহারা যেন আমার সম্পূর্ণ শাসনযোগ্য অর্থাৎ আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, এমনই বোধ হয়। জীব পূর্ব্বে এই বৃত্তিসমূহদ্বারা—এই ভাবরাশিদ্বারা কতই না উৎপীড়িত

হইয়াছে! কিন্তু এখন ভাব-সমরে নির্জ্জিত হইয়া সে মৃগয়া-চ্ছলে গহনারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল—ভাববৃন্দ সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আমারই ইচ্ছায় যেন উহারা পরিচালিত হইবার মতন অবস্থায় আসিয়াছে। এমনই মনোরম সেই বুদ্ধিময় ক্ষেত্র বা মেধসাশ্রম। মরি! মরি! কি প্রাণ-জুড়ান, কি লোভনীয় সে চিন্ময় জ্যোতির্ম্মণ্ডল! সেখানে সর্ব্ববিধ চঞ্চলতা, সর্ব্ববিধ বহিঃশব্দ সম্পূর্ণ দূরীভূত। জীব! কবে তুমি সে মহতী ধীরূপিণী জ্যোতির্ম্ময়ী মায়ের স্নেহময় বক্ষে স্থান লাভ করিয়া সর্ব্ববিধ চঞ্চলতা হইতে মুক্ত হইবে?

আর একটু খুলিয়া বলি—নকল করিয়া জগৎময় সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে করিতে—প্রত্যেক পদার্থে সত্যবোধ ঘনীভূত হইয়া আসিবে। তারপর একদিন দেখিতে পাইবে—একটী শুভ্র প্রাণময় জীবন্ত জ্যোতি চারিদিকে প্রসৃত হইয়া রহিয়াছে। উহা এত স্থির যে, সেখানে যাবতীয় ভাব-চঞ্চলতার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না। এইটা অমুক, এইটা অমুক, এইরূপ বিশিষ্ট শব্দে আর ভাবসমূহ উদ্বেলিত হইতেছে না। একটা জীবন্ত স্থির সত্তার মধ্যে যেন জগৎটা ছায়ার মত অবস্থান করিতেছে। ইহা এত প্রত্যক্ষ, এত ঘন যে, আর কল্পনা বলিতে পারিবে না। জগতের অস্তিত্বে বরং সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু এ সত্তায় কোন সংশয় থাকিবে না। পুনঃ পুনঃ ইহাতে অবস্থান করা অভ্যাস করিয়া লইলে, শেষে ইচ্ছা মাত্রেই এই মহৎ তত্ত্ব পর্য্যন্ত একেবারে যাওয়া যায়। ইহাই সুরথের মেধসাশ্রমে অবস্থিতি।

এই দর্শনকে মেধসাশ্রম বলিবার তাৎপর্য্য কি? গীতাভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মাহমস্মি ইতি স্মৃতিরেব মেধা" "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ যে স্মৃতি, তাহারই নাম মেধা। বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপনীত হইলেই জীব-ব্রহ্মের অভেদ-বোধক স্মৃতি উদ্বুদ্ধ হয়। যাঁহারা পুস্তক পড়িয়া বা উপদেশ শুনিয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলেন, তাঁহারা মাত্র বাক্যেই উহা উচ্চারণ করেন—শিক্ষিত পক্ষীর মত শব্দ-আবৃত্তিমাত্র। মহত্তত্ত্বে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে জীবব্রহ্মের

অভেদ-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানও হয় না। এই পরোক্ষ-জ্ঞানই সাধন-সাপেক্ষ। অপরোক্ষানুভূতি সাধনার চরম ফলরূপে স্বয়ং উপনীত হয়। অথবা উহা সাধনার ফল নহে,—মা আমার দয়া করিয়া, স্নেহে মুগ্ধ হইয়া, আপনিই আসেন।

জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া, সত্যপ্রতিষ্ঠারূপ সরল পন্থা অবলম্বনে শ্রীগুরূপদিষ্ট উপায়ে অগ্রসর হইলে, অনায়াসে এই আশ্রমে উপস্থিত হওয়া যায়। এইখানে উপস্থিত হইয়া জীব বুঝিতে পারে—যাঁহার সাধনা করিতেছি, যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছি, সে যে আমি রে! এতদিন এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারি নাই। এ আমারই অনুসন্ধানে আমি ছুটিতেছি; এই যে বুঝা, এই যে অনুভব, ইহার নাম মেধা এবং যেখানে উপস্থিত হইলে এইরূপ স্মৃতি জাগিয়া উঠে, সেই স্থানের নাম মেধসাশ্রম। ইহাই বুদ্ধির ক্ষেত্র বা মহত্তত্ত্ব। বুদ্ধিযোগ-অবলম্বনের ইহাই অমৃতময় ফল! এই বুদ্ধি-যোগের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে গিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এইস্থানে উহার ফল আরম্ভ হইয়াছে। তাই, প্রথমেই বলিয়াছি—গীতা ভিত্তি, এবং চণ্ডী তদুপরি অতুলনীয় প্রাসাদ। গীতা —সাধনা, চণ্ডী—সিদ্ধি।

তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃতঃ।
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে॥
সোঽচিন্তয়ত্তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ ॥১০॥

অনুবাদ—হে মুনিবর! রাজা সুরথ সেই আশ্রমে মেধস্ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ পূর্ব্বক, কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি সেখানে মমতায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া (বক্ষ্যমান) নানাবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। জীব বুদ্ধিযোগের সাহায্যে সত্যপ্রতিষ্ঠার ফলে একবার বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে বা মেধসাশ্রমে উপনীত হইলে, কিছুকাল তথায় অবস্থান করিতে বাধ্য হয়, কারণ মেধস্ তাহাকে সংকৃত করে —সংস্বরূপের স্মৃতি উদ্‌বোধিত করিয়া দেয়। পূর্ব্বে এই "সং" বোধটি থাকিয়াও যেন ছিল না; কিন্তু এখানে বুদ্ধিজ্যোতির আলোকে—ধ্রুবাস্মৃতিরূপ মেধসের কৃপায় জীব বুঝিতে পারে "আমি তিন কালেই সং বা সত্য"! তাই, মন্ত্রস্থ "সংকৃতঃ" পদটীতে অভূততদ্ভাব অর্থে লুপ্ত চ্বি প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়াছে।

মা যখন জীবহৃদয়ে 'ব্রহ্মাহমস্মি' আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ ধ্রুবা স্মৃতির উদ্‌বোধ করিয়া দেন, তখন জীব এত আনন্দলাভ করে যে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মাত্র ঐ স্মরণটীও অত্যন্ত লোভনীয় —পরিহার করিতে ইচ্ছা হয় না। বহুজন্মব্যাপী জীবত্ব-ভারবহন এবং পরিচ্ছিন্ন বিষয়ানন্দ ভোগ করিবার পর যখন জীব এই আশ্রমে— এই ব্রহ্মত্ববোধরূপ স্মৃতির নিকটে উপস্থিত হয়, যেখানে বোধে জীবত্ব নাই, জ্ঞানে ক্ষুদ্রত্ব নাই, আনন্দে সীমা নাই, মৃত্যু নামে ভয় নাই, প্রিয়বিরহ নামে শোক নাই, অনিষ্টপ্রাপ্তি নামে দুঃখ নাই, আছে শুধু সত্তা, আছে শুধু জ্ঞান, আছে শুধু আনন্দ, আর আছে—অখণ্ড পূর্ণ আত্মবোধ। সেইখানে যদি জীব কোনও প্রকারে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তবে কি আর সে স্থান শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে তাহার ইচ্ছা হয়? সুরথের কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ঠিক এই অবস্থা উপস্থিত হয় নাই। এই অবস্থার একটা স্মৃতিমাত্র চিরান্ধকারাচ্ছন্ন চিত্তাকাশে মুহূর্ত্তের জন্য নক্ষত্রালোকের ন্যায় ফুটিয়াছে। সে যাহা হউক, এই সুখময়ী স্মৃতিটি জীবকে কিছুকাল আনন্দমুগ্ধ করিয়া রাখে। তাই, মন্ত্রে, 'কঞ্চিৎ কালং তস্থৌ' বলা হইয়াছে।

জীব এখানে আসিলে কেন এত মুগ্ধ হয়? কেন মেধসাশ্রম সহসা পরিত্যাগ করিতে পারে না? জীব যে এখানে সংকৃত হয়! এইখানে জীব বুঝিতে পারে—আমি 'সং' হইতে সঞ্জাত, 'সং' এ নিত্য অবস্থিত এবং 'সং'ই আমার অবসানস্থান। আমি তিন কালেই

নিত্য বর্ত্তমান সৎস্বরূপে অবস্থান করিতেছি। প্রথমে যে সত্যপ্রতিষ্ঠা বা সৎ-উপলব্ধির জন্য জীব চেষ্টা করে, (যাহা আমরা মৃগয়াচ্ছলে অশ্বারোহণে বনগমন কথাটীর মধ্যে পাইয়াছি) উহা সাধনার প্রথম সূত্রপাত—নকল করিয়া সৎএর অনুসন্ধানমাত্র। ঐ নকল সত্যানুসন্ধানই আজ সাধককে ধ্রুবাস্মৃতির নিকট উপস্থিত করিয়াছে। এইখানেই সাধকের এইরূপ উপলব্ধি হয় যে, "আমি যত জন্মমৃত্যু ও পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই যাতায়াত করি না কেন, আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ আমাকে যতই বিনাশশীলতার বিভীষিকা প্রদর্শন করাউক না কেন, আমি এক অখণ্ড নিত্য স্থির সত্তায় অধিষ্ঠিত"। সৎ-বস্তুটি যে সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তনের ভিতর নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় অনুস্যূত রহিয়াছে, ইহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষতা লাভ হয় জীবের এইখানে—এই মেধসাশ্রমে। এই সৎএর অভিজ্ঞানের নামই মায়ের কোল। পূর্ব্বে আমরা অনেক স্থানে 'মাতৃ-অঙ্কস্থিত শিশু' শব্দটির ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি; তাহার তাৎপর্য্য এইস্থানে সাধকগণ বুঝিতে পারিবেন। যতদিন "সংকৃতঃ" না হওয়া যায়, ততদিন অভয় মাতৃ-অঙ্কের সন্ধান পাওয়া যায় না।

সুরথের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—জীবত্ব-অবসানের সময় আসিয়াছে; তাই মাতৃ-লাভের আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রাণে জাগিয়াছে। ভাববিরোধিতা—প্রজাবিদ্রোহ ও অমাত্যবিরোধিতা সে আকাঙ্ক্ষাকে আরও তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে। সে আকুলপ্রাণে মাতৃ-লাভের আশায় ছুটিয়াছে! তাই, আজ মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, নিত্য-সত্যের সন্ধান লাভরূপ 'সংকৃত' হইয়া ধন্য হইয়াছে। মা আমার ধ্রুবাস্মৃতিরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া বলিয়া দিলেন—তুই যে সৎ, আমি সচ্চিদানন্দময়ী মা—আর তুই জীবরূপী আমারই স্নেহের তুলাল পুত্র। যখন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে একবার মা বলিয়া ডাকিয়াছ, আর কি তোমায় অসৎ রাখিতে পারি! পুত্র চাহিয়া দেখ—তুমি আমার অঙ্কে—নিত্য সত্যে চির অধিষ্ঠিত। তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বাল্য নাই, যৌবন নাই, বার্দ্ধক্য নাই, জাতি নাই, বর্ণ নাই, অধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম নাই,

কোনও পরিবর্ত্তন, কোনও বিবর্ত্ত, কোনও বিকার, কোনও ভ্রান্তি তোমাতে নাই। আমি সচ্চিদানন্দময়ী মা তোমার। তুমি সচ্চিদানন্দ-ময় পুত্র আমার! আজ আমার মাত্র সৎস্বরূপটির উপলব্ধি কর। ক্রমে তোমার পিপাসার তীব্রতা-অনুসারে চিৎ এবং আনন্দস্বরূপও তোমার প্রতীতিযোগ্য করিয়া দিব, আমাতে চিরতরে মিলাইয়া যাইবে, আমার স্নেহময় বক্ষে চিরতরে আশ্রয়লাভ করিবে, চিরতরে তোমার জীবত্ব-বোধ দূরীভূত হইবে, মুক্তিরূপ আমারই স্নেহাঞ্চলের অন্তরে চিরতরে নির্ব্বিশঙ্কে অবস্থান করিবে। আর আপনাদিগকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া, অসৎ মনে করিয়া, পরিণামী দেখিয়া অবসাদগ্রস্ত হইওনা। দেখ আমি—মা তোমার সকল অবসাদ দূর করিবার জন্য তোমাকে বক্ষে ধরিয়া রাখিয়াছি।

সত্যপ্রতিষ্ঠার প্রথম সূত্রপাতে যাহা কল্পনামাত্র বলিয়া প্রতীত হইত, এখান হইতে তাহা যথার্থ সত্যরূপেই অনুভূত হইতে থাকে। যেহেতু, এই সৎ-জিনিষটি প্রত্যক্ষ। ইহা কোনরূপ অনুমান বা কল্পনার সাহায্যে বুঝিতে হয় না। ইহা এত স্থূল, এত ঘন যে, জাগতিক পদার্থনিচয়ের স্থূলতা যেন এই নিশ্চল সত্তার নিকট ছায়ামাত্র বলিয়া বোধ হয়। সাধনাজগতে অনুমান বা অপ্রত্যক্ষ যতদিন থাকে, বুঝিতে হইবে—ততদিন যথার্থ সাধনার সূত্রপাত হয় নাই। ইহার প্রতিপদক্ষেপে কিছু না কিছু প্রত্যক্ষ কিছু না কিছু লাভ হইবেই। যখন এইরূপ প্রত্যক্ষতা আসিতে থাকে, তখনই সাধনা সরস ও মধুময় হয়। তখন হইতে আর ইহাকে নীরস ও কষ্টসাধ্য কর্ম্মবিশেষমাত্র মনে হয় না। তখন হইতে সাধকগণ দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইতে থাকে ও অচিরে আত্মলাভে ধন্য হয়।

যাহারা সাধনা করিতেছে, অথচ এ পর্য্যন্ত কিছু প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই, তাহারা বুঝিবে—মৃতকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে। কর্ম্মকে চৈতন্যময় করিয়া লও, দেখিবে—সকলই মধুময়, সকলই সরস। মৃত সাধনা যে একেবারেই ফলপ্রদ হয় না, এ কথা আমরা কখনই বলি না; কারণ জীবমাত্রই সাধক, কর্ম্মমাত্রই সাধনা এবং সাধনারূপ সিদ্ধিলাভও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সাধক! যদি তুমি অচিরে অর্থাৎ এই জীবনেই

অমৃতের সন্ধান বা আস্বাদ পাইতে চাও, তবে সাধনাকে সজীব করিতে হইবে—প্রাণময় করিতে হইবে। সৌর গাণপত্য বৈষ্ণব শৈব শাক্ত জৈন বৌদ্ধ যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সাধক-সম্প্রদায়ই যথার্থ অমৃতের সন্ধান পাইতে পারে। স্ব স্ব সাধনার প্রণালীগুলিকে যদি সত্যের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে অচিরকাল মধ্যেই উহা আশাতীত ফল আনয়ন করিয়া থাকে। যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন, সেই সাম্প্রদায়িক সাধনাই এক অদ্বিতীয় বস্তুলাভের পক্ষে পর্য্যাপ্ত, যদি তাহার মধ্যে সাধক প্রাণের সন্ধান করিয়া লইতে পারেন। প্রাণ না দিলে প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাণ না পাইলে মৃত্যুভয় বিদূরিত হয় না। যাঁহার সাধনা যত প্রাণময়, তাঁহার সাধনা তত শীঘ্র ফলপ্রসূ। প্রাণহীন সাধনা শবদেহমাত্র। শবদেহকে যতই বসন ভূষণদ্বারা সুসজ্জিত করা হউক না কেন, সে যেমন কিছুতেই সৌন্দর্য্য-বিকাশ করিতে পারে না, বরং একটা মলিন ছায়াকে আরও ঘন করিয়া তোলে; সেইরূপ প্রাণহীন কতকগুলি বাহ্য আচার অনুষ্ঠানরূপ সাধনা কখনও পরমাত্মপ্রকাশে সমর্থ হয় না; বরং অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারকে আরও যেন নিবিড়তর করিয়া তোলে। বৃক্ষের শাখা উপশাখা কাণ্ড মূল ফুল ফল পত্রাদিরূপ বহুবিধ ভেদ, বহুবিধ নাম ও রূপের বিভিন্নতা থাকিলেও যে রসপ্রবাহটি বৃক্ষকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, তাহা যেরূপ বৃক্ষের সর্ব্বাবয়বে তুল্যরূপে অনুস্যূত, সাধনাক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ বুঝিবে। সম্প্রদায়গত, নামগত, আকারগত, আচারগত, অনুষ্ঠানগত, অসংখ্যভেদ ও বহু বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, এবং থাকাও উচিত; (কেন, তাহা পরে বলিব) কিন্তু ঐ বহু বিভিন্নতার মধ্যে একটি অখণ্ড রসপ্রবাহ—সৎ, চিৎ এবং আনন্দস্বরূপ প্রাণ সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে। ঐ রসপ্রবাহটীর দিকে লক্ষ্য রাখিলে, সকল সাধনাই অভিন্ন ফলপ্রদ বলিয়া প্রতীত হয়। শুধু এই সত্য জিনিষটাকে বাদ দিয়াই সাধকগণের মধ্যে নানারূপ সাম্প্রদায়িকতা, স্বমতের প্রাধান্যস্থাপন, পরমত-খণ্ডনে প্রয়াস প্রভৃতি সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায়।

চারিটি বালক বিভিন্ন গ্রন্থকার-প্রণীত চারিখানি বর্ণপরিচয় পাঠ করিতেছে। কোন পুস্তকে "অ" বর্ণটির ধারে একটি অশ্ব চিত্রিত রহিয়াছে, কোন পুস্তকে অজগর সর্প চিত্রিত আছে, কোন পুস্তকে অলাবুর ছবি আছে, আবার কোন পুস্তকে একটি অজার ছবি আছে। বালকগণ ছবি দেখিয়া 'অ' বর্ণটি শিক্ষা করিবে, অকারের আকৃতিটি মনে রাখিবে,—ইহাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ; কিন্তু বালকগণ ঐ অকার বর্ণটি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে, অথবা কালী দিয়া অদৃশ্য করিয়া তুলিয়াছে। তারপর চারিজনে মহাঝগড়া। একজন বলে—আমার বই ভাল, ইহাতে ঘোড়ার ছবি আছে, দেখ ত' কেমন সুন্দর! আর একজন বলে—না না আমার বইখানা ভাল ; এই দেখ, কেমন অজগরের ছবি আছে। আর একজন বলে—ওরে তা নয়, আমার বইতে আছে অলাবু। অলাবু কি জান—লাউ! কেমন উৎকৃষ্ট তরকারি। আর একজন বলে—যা যা তোদের সবার চাইতে আমার বইখানা বেশী ভাল—কেমন ছবিটি। এই দেখ, অজার ছবি আছে। অজা কি তা জান? অজা মানে ছাগী। আমাদের ধর্ম্মবিষয়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধিতাও এইরূপ। যেটি উদ্দেশ্য—যাহা লক্ষ্য, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু বাহিরের আবরণ নিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পরিপুষ্ট হইতেছে।

সাধনার বা জীবের লক্ষ্য—সচ্চিদানন্দ-লাভ। সচ্চিদানন্দই জীবের স্বরূপ! যে কোন কারণেই হউক, আমরা অসৎ, অচিৎ এবং নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছি। সর্ব্বদা মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত,—পাছে আমার অস্তিত্বলোপ হয়, এই আশঙ্কা জীবমাত্রেরই আছে ; সুতরাং অসৎ। আমাদের জ্ঞান এত সঙ্কীর্ণ যে, সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে না ; সুতরাং অচিৎ। আমরা যে আনন্দভোগ করি, উহা দুঃখমিশ্রিত ; সুতরাং নিরানন্দ। জীবমাত্রেরই এই ত্রিবিধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপলব্ধিতে যাইতে হইবে, ইহাই সাধনার উদ্দেশ্য। ঐ স্বরূপটি অপর কোনও স্থান হইতে ধার করিয়া বা চাহিয়া আনিতে হয় না, উহা প্রত্যেকেরই অন্তরে যেন লুক্কায়িত

আছে। সেই অপ্রকট ব্রহ্মভাবকে প্রকাশিত করার নাম সাধনা। সকল জীবই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই সাধনাই করিতেছে। যেহেতু, সকলেই চায়—আমার অস্তিত্ব যেন লোপ না পায়—আমি যেন অনন্তকাল থাকি ; ইহারই নাম সৎএর উপাসনা। তারপর এমন অস্তিত্ব আমরা চাই না, যে অস্তিত্ব জানিতে পারিব না। যদি কেহ বলে—'তুমি চিরকাল থাকিবে ; কিন্তু তুমি বুঝিতে পারিবে না যে, তুমি আছ' ; তবে আমরা তেমন থাকাটি চাই না। আমরা চাই—"আমি চিরকাল থাকিব এবং বুঝিতে পারিব যে আমি আছি।" ইহার নাম চিৎএর সাধনা। তারপর সেই থাকাটি যদি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় হয়, তবে সেইরূপ থাকাও চাই না ; সুতরাং আমরা চাই—'আমি থাকিব', আমি বুঝিব যে, "আমি আছি", এবং আমার থাকাটি "আনন্দময়" হইবে। এইরূপে প্রত্যেক জীবই সচ্চিদানন্দের অন্বেষী। কেহ মদ্যপান করিয়া, কেহ দস্যুবৃত্তি করিয়া, কেহ নিষ্ঠুরতা করিয়া ঐ সচ্চিদানন্দের অন্বেষণ বা সেবা করিতেছে ; আবার কেহ বা দয়া ক্ষমা উদারতা ভগবৎপ্রীতি কিংবা সাধনভজন দ্বারা সচ্চিদানন্দের সেবা করিতেছে ; সুতরাং জীবমাত্রেই সাধক এবং কর্ম্মমাত্রই সাধনা। ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। যতদিন ইহা না জানিয়া কর্ম্ম করে, ততদিন মানুষ সাধারণ জীবমাত্র ; আর যখন ইহা বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে থাকে, তখন সে সাধক নামে অভিহিত হয়। সাধারণ জীবে ও সাধকে এই প্রভেদ। যে ব্যক্তি আপনাকে সাধক বলিয়া মনে করেন, অথচ জ্ঞানতঃ সচ্চিদানন্দের অন্বেষণ করেন না, তাঁহার সেই সাধনাকে জাগতিক কার্য্য অপেক্ষা উন্নত আসন দেওয়া যায় কি ? তাই বলিতেছিলাম—সর্ব্ববিধ সাধনার অন্তর্নিহিত ঐ সচ্চিদানন্দরূপ রসপ্রবাহটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। হয়ত কেহ কঠোর তপস্যাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন, অথচ এই সচ্চিদানন্দের সন্ধান পান নাই— আপন অমরত্ব, নিত্যত্ব, আনন্দময়ত্বের উপলব্ধি করিতে পারেন নাই; যদি এরূপ আমরা দেখিতে পাই, তবে বুঝিব—তিনি লক্ষ্যহীন হইয়া বা উদ্দেশ্য ভুলিয়া মাত্র তপস্যার জন্য বা সিদ্ধিলাভের জন্য তপস্যা করিতেছেন।

জীব যখন জানিয়া শুনিয়া সাধনার প্রাণ এই সচ্চিদানন্দস্বরূপের সন্ধানে আকুল হইয়া ছুটিতে থাকে, তখন সর্ব্বপ্রথম সৎস্বরূপটি প্রতীতিযোগ্য হইতে থাকে। এই প্রথম স্বরূপটির উপলব্ধিতে জীব একটি অখণ্ড নিত্য সত্তার সন্ধান পায়। ইহাই মন্ত্রে 'সৎকৃত' শব্দটি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যে কোন সম্প্রদায়ের সাধক তাহার সাধনার প্রণালীকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রাণময় বা রসময় করিয়া, এই অখণ্ড সৎ-বস্তুটির সন্ধান পাইতে পারেন। আচারভেদে ও অনুষ্ঠানভেদে সাধনার যে বিভিন্ন প্রকার ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে, উহা অজ্ঞানমূলক। এই স্থলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনার ক্রমগুলি উল্লেখ করিয়া, তাহার মধ্যে সত্যপ্রতিষ্ঠার উপায় দেখাইয়া দিতে গেলে পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে; তাই নিরস্ত হইতে হইল। অথবা পুস্তক পাঠ করিয়া কেহ কখনও সাধনার রহস্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না। বিনীতভাবে যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত গুরুমুখ হইতে উহা শ্রবণ করিতে হয়; এবং গুরু যদি কৃপাপরবশ হইয়া স্বকীয় আধ্যাত্মিক শক্তি শিষ্যহৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দেন, তবেই সাধনা আশানুরূপ ফলবতী হয়। নচেৎ মৌখিক জ্ঞানের আলোচনায় কেহ কোনদিন প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। সকল কথা পুস্তকে লিখিয়া প্রকাশ করায় কোন বিশেষ ফল হয়না বলিয়াই অনেক স্থলে নিরস্ত হইতে হয়।—কিঞ্চ—ফললাভ ত' হয়ই না, বরং অপাত্রে প্রযুক্ত হইয়া গুরু ও বেদান্তবাক্যের অবমাননা হয়। সেই জন্যই পূজ্যপাদ ঋষিগণ ভূয়োভূয়ঃ অধিকারভেদে সাধন-রহস্য আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। যিনি এই অধিকারগত বিভিন্নতা লক্ষ্য করিতে অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের সূক্ষ্ম দেহটি পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ উপদেষ্টা, তিনিই যথার্থ সদ্‌গুরু।

যাহা হউক, আমরা সাধনার অবান্তর কথা নিয়া বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি—পুনরায় প্রস্তাবিত বিষয়ের সমীপস্থ হওয়া যাউক। মেধসকর্তৃক সৎকৃত হইয়া, সুরথ কিছুকাল সেই আশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন। এইস্থলে ঐ "কঞ্চিৎকালম্" কথাটির মধ্যে একটু

জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বহু সৌভাগ্যের ফলে, বহু প্রাণপাত তপস্যার বলে, জীব মহত্তত্ত্বের সন্ধান পায়, সংকৃত হয়, অখণ্ডৈকরস-সত্তার সন্ধান পায়। তবে এমন ক্ষেত্রে আসিয়াও "কঞ্চিৎ কালং" কেন? চিরকাল এখানে কেন থাকে না? না—তাহা কেহই পারে না। যতদিন দেহ থাকে, ততদিন সে ক্ষেত্রে কেহই নিরবচ্ছিন্ন অবস্থান করিতে পারে না। বহু জন্মসঞ্চিত সংস্কারবশে আবার দেহাত্মবুদ্ধিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হয়; কিন্তু অতি অল্পক্ষণের জন্যও বুদ্ধিময়-ক্ষেত্রে আত্মবোধ উপসংহৃত হইলে, যে অমরত্বের স্মৃতি, যে অপরিসীম আনন্দের আভাস পাওয়া যায়, তাহাতেই জীব ধন্য হয়! সেই তিলার্দ্ধকাল-মাত্র-ভোগ্য সচ্চিদানন্দের সুখময়ী স্মৃতিটুকুও মানুষকে আনন্দে বিভোর করিয়া রাখে। তখন হইতেই সাধকের জীবন উৎসাহময় এবং কর্ম্মসমূহ মধুময় হয়। কিছুদিন অভ্যাসের ফলে, এই সূক্ষ্মতত্ত্বে অবস্থানকালের মাত্রা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। তখন ইচ্ছামাত্রেই অনতিপ্রযত্নে এই মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইতে পারে এবং 'ব্রহ্মাহমস্মি' এই স্মৃতি ঘনীভূত হওয়ায়, সাধক-জীবনে দেব-ভাবীয় লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে।

ইতশ্চেতশ্চ বিচরন্—মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়াও সুরথ এদিক্ ওদিক্ বিচরণ করিতেছেন। মহৎতত্ত্বে উপনীত হইয়া, সেই শুভ্র শান্ত নির্ম্মল উদাসীন বুদ্ধিজ্যোতিতে অবগাহন করিয়াও জীব প্রারব্ধবশে সে স্থান হইতে মনোময় ক্ষেত্রে কিংবা অন্নময় কোষে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। বেশী সময় অতি সূক্ষ্মক্ষেত্রে অবস্থান করিতে না পারার হেতু—স্থূলাভিমানিতা। বহু জন্মজন্মান্তর ধরিয়া আমরা স্থূল বিষয়ের অবলম্বনে আত্মবোধ উদ্দীপ্ত করিয়া রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। যদি কোনদিন এই নামরূপবিশিষ্ট স্থূলভাবগুলি পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর স্তরে আরোহণ করিতে হয়, তবে প্রথম প্রথম যেন একটা অস্বস্তিভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। যতক্ষণ না আবার স্থূলের আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, ততক্ষণ যেন দম আট্‌কাইয়া যায় বলিয়া মনে হয়। তাই, এক একবার সূক্ষ্মতত্ত্বে আরোহণ করিলেও

পুনঃপুনঃ স্থূল কোষগুলিতে বিচরণ করিতে হয়। ইহাই সুরথের ইতস্ততঃ বিচরণ।

বুদ্ধিযোগের সাহায্যে প্রত্যেক স্থূল পদার্থে মাতৃসত্তা-দর্শনের ফলে হঠাৎ একদিন বুদ্ধিময় জ্যোতির প্রকাশ হইয়া পড়ে। সাধক সে জ্যোতিতে প্রথম প্রথম দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে না পারিয়া, আবার দেহবুদ্ধিতে নামিয়া পড়ে; কারণ, নীচের দিকে যে এক মণ ভার বাঁধা রহিয়াছে। ভগবানের ওজন—একমন—সম্পূর্ণ মনটি ভগবানের চরণে অর্পণ করিতে পারিলেই জীবত্বের অবসান হয়। যতদিন উহা পরিসমাপ্ত না হয়, তত দিন একটু একটু করিয়া বিষয় হইতে মনকে তুলিয়া লইয়া তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিতে হয়। পূর্ণভাবে মনটিকে গ্রাস করিবার জন্যই মা আমার স্নেহের সন্তানকে লইয়া এইরূপ দোলখেলা করিয়া থাকেন। একবার বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আরোহণ, আবার পরক্ষণেই দেহাত্মবুদ্ধিতে অবরোহণ। যখন জীব এই আরোহণ-অবরোহণরূপ মায়ের আনন্দক্রীড়ার অনুভব করিতে থাকে, তখনই তাহার প্রকৃত সাধনা আরম্ভ হয়। সাধক মনে কর— তুমি এক একবার আকুল প্রাণে মা মা বলিয়া মায়ের কোলে উঠিতেছ, জীবভাবীয় সংকীর্ণতা বিস্মৃত হইয়া, অসীম আনন্দ-জলধি স্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছ; আবার পরক্ষণেই জীবত্ববোধে নামিয়া পড়িয়াছ। একবার মনে হইতেছে, তুমি স্বর্গেরও উচ্চে উঠিয়াছ, আবার হয়ত পরক্ষণেই নিজের নীচতা, হীনতা দেখিয়া, আপনাকে নরকের জীব বলিয়া মনে করিতেছ। এইরূপ সমস্যাপূর্ণ অবস্থার নামই মেধসের আশ্রমে সুরথের ইতস্ততঃ বিচরণ। পরবর্ত্তী মন্ত্রে ইহা আরও বিশদ ভাবে বলা হইবে। যাহা হউক, সাধক যখন এইরূপ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার মর্ম্মস্থান যেন শতধা বিদীর্ণ হইতে থাকে। যতদিন অন্ধকারে থাকে, ততদিন আলোকের আনন্দ বুঝিতে পারে না; কিন্তু একবার আলো দেখিয়া, আবার অন্ধকারে যাওয়া বড়ই কষ্টকর। আলো যত উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে, অন্ধকারও যেন ততই অধিক গাঢ় হয়। যত মাকে পাইতে থাকে,

ততই যেন না পাওয়াটা তীব্রভাবে বোধে আসিতে থাকে ; তখনই অসহ্য যাতনা উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় আসিয়া সাধকগণ কখন কখন একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন ; কিন্তু ইহাতে হতাশের কোন কারণ নাই ; ইহা মাতা পুত্রের আনন্দলীলা। একবার মা তোমার হাত ধরিয়া দাঁড়া করিয়া দিলেন। মা যে তোমাকে আপন পায়ে চলিতে শিখাইবেন ; তাই হঠাৎ হাতখানা সরাইয়া লইলেন, তুমি পড়িয়া গেলে ; আছাড় খাইলে, ব্যথা পাইলে। আবার মা আসিয়া হাসিতে হাসিতে হাত ধরিয়া তুলিলেন, তুমি আনন্দে বিভোর হইলে মা আবার হাতখানি সরাইয়া লইলেন। এইরূপ মাতা-পুত্রের আনন্দ-লীলা যে কত মধুময় এবং সমকালীন কত বিষাদময়, তাহা সাধক-মাত্রেই অবগত আছেন। মাকে যাহারা সর্ব্বভাবে সর্ব্বরূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের নিকট মা এইরূপ আনন্দ-লীলা করিবার জন্য প্রায়ই উপস্থিত হইয়া থাকেন। কি উপায়ে সহজে মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, এই মাতা-পুত্রের আনন্দ-ক্রীড়া সম্ভোগ করা যায়, তাহা মা-ই গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া, জীবকে বুঝাইয়া দেন।

সোঽহচিন্তয়ৎ—পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের বলে যখন জীবের এমন একটা অবস্থা আসে যে, কিছুকাল সেই বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিবার সামর্থ্য হয় ; তখনও আবার মমত্ববোধে আকৃষ্ট হইয়া—প্রারব্ধ সংস্কারের প্রবল আকর্ষণে বাধ্য হইয়া, নানারূপ স্থূল বিষয়ক চিন্তা আসিতে থাকে। বিষয়ের স্মৃতি দ্বারা উৎপীড়িত হইতে হয়। প্রথমে বুদ্ধিতত্ত্বে আরোহণ করিয়া, বিষয় ভুলিয়া, সেই মোহন বুদ্ধিজ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া পড়ে ; ক্রমে সূক্ষ্ম তত্ত্বে অবস্থানের কাল যত দীর্ঘ হইতে থাকে, ততই সেখানে থাকিয়াও স্থূল দেহাদি-বিষয়ক চিন্তা যেন আপনা হইতে উপস্থিত হইতে থাকে। বহুদিন পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম যদি সহসা মুক্ত আকাশমার্গে বিচরণ করিবার সুযোগ পায়, তথাপি যেরূপ সে বেশী দূরে না গিয়া, আবার সেই চিরাভ্যস্ত বাসস্থান—পিঞ্জরটিতে ফিরিয়া আসে, সেইরূপ বহু দিন দেহাত্মবোধে আবদ্ধ জীব যদি মাতৃ-কৃপায় সূক্ষ্ম-তত্ত্বসমূহের সন্ধান পায়, তথাপি তাহাতে

সে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। চিরচঞ্চল, চিরমলিন জীব বুদ্ধিময় ক্ষেত্রের সে বিশালতা, সে নির্ম্মলতা, সেই উদাসীনভাব, সেই বজ্রবৎ কঠোরতা, সেই পর্ব্বতবৎ স্থিরতা অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারে না। আবার দেহাদি-বিষয়ক স্মৃতি উদ্‌বোধিত হইতে থাকে। অথবা মা আমার দয়া করিয়াই এইরূপে একবার নীচের দিকে একবার উপরের দিকে গমনাগমন করাইয়া, প্রাণের সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত করিতে থাকেন এবং ক্রমে ক্রমে সাধকের বলবৃদ্ধি করিয়া, বিশালতার দিকে অগ্রসর হইবার সুযোগ করিয়া দেন।

মৎপূর্ব্বৈঃ পালিতং পূর্ব্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ।
মদ্‌ভৃত্যৈস্তৈরসদ্‌বৃত্তৈর্ধর্ম্মতঃ পাল্যতে ন বা ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আমার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যে পুরকে পূর্ব্বে যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতেন, সেই পুর অধুনা আমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। অসদ্‌বৃত্ত ভৃত্যগণ আমার সেই পুরকে ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করিতেছে কি না?

ব্যাখ্যা। মেধসাশ্রমে অবস্থানকালে সুরথ প্রারব্ধ সংস্কার বশতঃ দেহাদিতে মমত্ব-বুদ্ধির প্রবল আকর্ষণে বাধ্য হইয়া, যে সকল চিন্তা দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া থাকে, তাহাই চারিটি মন্ত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে। মানুষমাত্রেরই ঐরূপ চিন্তা করা একান্ত স্বাভাবিক। নির্ম্মল বুদ্ধি-জ্যোতিতে অবস্থানকাল অপেক্ষাকৃত একটু দীর্ঘ হইলেই সর্ব্বপ্রথমে পুর-বিষয়ক চিন্তা হয়। পুর শব্দের অর্থ দেহ। এই নবদ্বারবিশিষ্ট পুরে জীবাত্মা অবস্থান করেন বলিয়া, তাঁহাকে পুরুষ কহে। জীবাত্মা এই দেহপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। প্রশান্ত উদার বুদ্ধিজ্যোতি-দর্শনে সর্ব্ববিধ সঙ্কোচ কিছু কালের জন্য দূরীভূত হইয়াছে; কিন্তু বহুজন্মসঞ্চিত দেহাদির প্রতি মমত্ববোধ বিদূরিত হয় নাই। যতদিন চণ্ডীতত্ত্ব সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত না হয়—যত দিন শুম্ভ বধ পরিসমাপ্ত না হয়—যতদিন ত্রিবিধ কর্ম্ম-ফল সমূলে বিধ্বস্ত না হয়, তত দিন মমতার উচ্ছেদ পূর্ণভাবে হয় না।

যতদিন দেহ আছে, ততদিন বুঝিতে হইবে, মমতা নিশ্চয়ই আছে। জীবের যখন এই মমতার প্রতি দোষদর্শন উপস্থিত হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়—শীঘ্রই মমতার মূল বিধ্বস্ত হইবে। মানুষ যখন নিজের দোষ নিজে ঠিক ঠিক ধরিতে পারে, তখনই বুঝা যায়—তাহার দোষ সংশোধনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

জীব বুদ্ধিযোগের অব্যর্থ ফলে দেহ হইতে আত্মবোধ উপসংহৃত করিয়া বুদ্ধিতে বিন্যস্ত করিয়াও দেহাদিবিষয়ক স্মৃতিদ্বারা বিব্রত হয়। তাই, সুরথ মেধসাশ্রমে অবস্থান করিয়াও চিন্তা করিতেছেন—"মৎ-পূর্ব্বৈঃ পালিতং পূর্ব্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ"। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অসংখ্য জন্মকৃত দৃঢ়সঙ্কল্পের দ্বারা যে দেহপুরকে পরিপুষ্ট করা হইয়াছে, অধুনা আমার বড় সাধের সেই দেহপুরটি আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল! জানিনা—আমার সেই অসদ্‌বৃত্ত ভৃত্যগণ—ইন্দ্রিয়সমূহ এখন আমা-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই পুরকে ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করিতেছে কি না?

আমরা মৃত্যুর পরই যে, আবার একটি দেহ গঠন করিয়া লইতে পারি, তাহার একমাত্র কারণ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের দেহবিষয়ক দৃঢ়সঙ্কল্প। মৃত্যুকালে যেন অতি অনিচ্ছায় অতি প্রিয় এই দেহটি পরিত্যাগ করি এবং অপর একটি দেহলাভের জন্য তীব্র বাসনা লইয়া প্রয়াণ করি। তাই, অনায়াসে পূর্ব্বসঙ্কল্পবশে অভিনব দেহ রচিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের দেহাত্মবোধদ্বারাই দেহ গঠিত এবং পরিপুষ্ট হয়। তাই, 'মৎপূর্ব্বৈঃ পালিতম্' বলা হইয়াছে।

এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। আমাদের শাস্ত্রে যে আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, উহার কারণ—দেহবিষয়ক তীব্র বাসনার অভাব। আত্মঘাতীর মৃত্যুকালে দেহের প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষ উপস্থিত হয়; সেইজন্যই মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল যাবৎ আর সে দেহবিষয়ক বাসনা উদ্দীপ্ত করিতে পারে না। প্রেত-দেহ বা আতিবাহিক দেহ আশ্রয় করিয়া সুদীর্ঘকাল অবস্থান করে। জীবিতকালের সঞ্চিত সমগ্র আশা আকাঙ্ক্ষাদ্বারা উৎপীড়িত হইতে থাকে, অথচ স্থূল দেহের অভাবে একটি বাসনাও পূর্ণ করিতে

পারে না ; তীব্র যন্ত্রণায় তাহাকে কালাতিপাত করিতে হয়। শ্রাদ্ধাদি ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্যসমূহ পরলোকগত জীবাত্মার শীঘ্র ভোগদেহ-সম্পাদনের পক্ষে (অর্থাৎ প্রেতলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় ভোগ-ক্ষেত্র-লাভের) বিশেষ সহায় হয় ; কিন্তু আত্মঘাতীর পক্ষে ভোগ-দেহের প্রতি তীব্র বিদ্বেষবশতঃ তদুদ্দেশ্যে ক্রিয়মাণ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বিন্দুমাত্র উপকারক হয় না। সেইজন্যই শাস্ত্রে আত্মঘাতীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে যদি কোন সত্যদর্শী সাধক আত্মঘাতীর পাপক্ষয়-উদ্দেশ্যে অর্থাৎ পুনরায় যাহাতে ভোগদেহ লাভ করিতে পারে, সেইরূপ উদ্দেশ্য নিয়া দৃঢ়সঙ্কল্পে প্রায়শ্চিত্ত এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তবেই উহার প্রেতলোক হইতে নিষ্কৃতিলাভ সম্ভব। যাহারা স্বাভাবিকভাবে রোগাদির দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদের মৃত্যুকালে দেহবিষয়ক আসক্তি প্রবলভাবে চিত্তক্ষেত্রে ফুটিয়া উঠে, কিছুতেই যেন প্রিয়তম দেহটি ছাড়িয়া যাইতে চায় না ; এই প্রবল আসক্তিই মৃত্যুর পরে যথাসম্ভব শীঘ্র ভোগায়তনস্বরূপ একটি দেহের গঠন করিয়া লয়। ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি তাহার সেই ভোগদেহলাভের সহায়তা করে।

যাহা হউক, বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আরোহণ করিয়াও জীব অনাদিজন্ম-সঞ্চিত মমতায় বাধ্য হইয়া, অতি যত্নে প্রতিপালিত দেহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থায় কিছুকালের জন্য দেহ হইতে আত্মবোধ বিলুপ্তপ্রায় হয় বলিয়া, মনে করে—"ময়া হীনং পুরং হি তৎ" আমি সেই দেহপুর পরিত্যাগ করিলাম। আমার অসদ্বৃত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ এখন আমাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দেহপুরকে যথারীতি প্রতি-পালন করিতেছে কিনা ? ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি বিষয়সমূহ বহন করিয়া আনিয়া প্রতিনিয়ত দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের দ্বারা দেহের পরিপোষণ না হইয়া, মনেরই পরিপুষ্টি হয় ; তথাপি দেহাভিমান বশতঃ মনের যাবতীয় পুষ্টি স্থূল দেহের পরিপোষণেই পরিব্যয়িত হয়। সেইজন্য ইন্দ্রিয়গণকে দেহের প্রতিপালক বলা যায়। ইন্দ্রিয়গণ অসদ্বৃত্ত। অসৎ শব্দের

অর্থ—সৎ-বিরোধী কোনও বস্তু-বিশেষ নহে, কারণ, এক সৎবস্তু ব্যতীত অপর কোন সত্তাই নাই। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ"। অসৎ নামে কোন বস্তু নাই। এখানে নঞ্‌টি অল্পার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান এক অখণ্ড সৎবস্তু যখন ঈষৎভাবে বা অল্পভাবে প্রকাশিত হন, তখনই তাঁহাকে অসৎ বলা হয়। নাম ও রূপবিশিষ্ট হইয়া পরিচ্ছিন্নভাবে সৎএর যে একরূপ বিকাশ বা লীলা, তাহাই অসৎ-পদ-বাচ্য। ইন্দ্রিয়সমূহ নাম-রূপবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে বিমুগ্ধ; সুতরাং অসদ্বৃত্ত। আমাদের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ যে প্রতিনিয়ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিচরণ করে, উহাতে আমাদের অসৎভাবই পরিপুষ্ট হয়; কারণ বিষয়সমূহ অসৎ। যতদিন আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বিষয়কে বিষয়মাত্র-বোধে গ্রহণ করে, ততদিন এই দেহ ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালিত হয় না। অসৎকে 'সৎ' বলিয়া গ্রহণ না করিলে 'সৎ' এর সন্ধান পাওয়া যায় না। 'সৎ'এর সন্ধান না পাইলে, জীবের নশ্বরতাবোধ অপনীত হয় না, মৃত্যুভয় বিদূরিত হয় না।

সুরথ (জীব) মেধস্ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে, যথার্থ সৎবস্তুর সন্ধান পাইয়াছে; তাই এখন বিষয়াভিমুখী ইন্দ্রিয়সমূহকে অসদ্বৃত্ত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। যাহারা প্রতিনিয়ত অসদ্‌ভাবেই—পরিচ্ছিন্ন ভাবেই বর্ত্তমান থাকে, তাহারাই অসদ্‌বৃত্ত। সে যাহা হউক, এইখানে আসিয়াই জীব বুঝিতে পারে—যে চক্ষু বিশ্বরূপে ভগবৎরূপ দেখিতে না পায়, সে চক্ষুদুইটি ময়ুরপুচ্ছমাত্র; যে কর্ণ শব্দমাত্রকে মাতৃ-আহ্বান বলিয়া গ্রহণ না করে, সে কর্ণদুইটি ছিদ্রমাত্র; যে নাসিকা পুণ্য-গন্ধ-গ্রহণে মাতৃ-অঙ্গের সৌরভ গ্রহণ না করে, সে নাসিকা প্রতিনিয়ত ভস্ত্রার ন্যায় (কামারের হাপর) বৃথা শ্বাসপ্রশ্বাস বহন করে; যে জিহ্বা সর্ব্বদা মাতৃ-নাম উচ্চারণে বিমুখ, তাহা ভেকরসনার ন্যায় নিন্দনীয়; যে ত্বক্ সমীরণরূপ মাতৃ-স্পর্শে কণ্টকিত না হয়, সে ত্বক্ দেহের বৃথা আবরণমাত্র।

এইরূপ বিষয়মুগ্ধ ইন্দ্রিয়রূপী ভৃত্যগণ অসদ্‌বৃত্ত। তাহারা ধর্ম্মতঃ

দেহের পরিপোষণ করে না, প্রতিনিয়ত অসদ্‌ভাবের পোষণ করে; সুতরাং ঐ পোষণ শোষণেরই রূপান্তরমাত্র—প্রতিমুহূর্ত্তে ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে। বুদ্ধিতত্ত্বে আরূঢ় জীবের ইচ্ছা—আমি যেরূপ সৎবস্তুর সন্ধান পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি, আমার ইন্দ্রিয়গণও সেইরূপ হউক। কেন অসদ্‌বৃত্ত থাকিবে? তাহারা কেন আর বিষয়কে বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়া, আমার অতি প্রিয়তম ভোগায়তন ক্ষেত্রটিকে অসদ্‌ভাবে পরিপুষ্ট ও অপবিত্র করিবে? 'সৎ'এর সন্ধান পাইলেই এই সকল চিন্তা স্বভাবতঃ জীবের মানসক্ষেত্রে উদিত হয়।

ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ।
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে ॥১২॥

অনুবাদ। আমার সেই প্রসিদ্ধ সর্ব্বপ্রধান সর্ব্বদা গর্ব্বিত অতি বিক্রমশালী (দেহাভিমানরূপ) হস্তী এখন আমার শত্রুর বশতাপন্ন হইয়া, কিরূপ ভোগ্যবস্তু লাভ করিবে, তাহা জানি না।

ব্যাখ্যা। দেহবিষয়ক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই "অহং" বৃত্তি-বিষয়ক চিন্তা উপস্থিত হয়। অভিমান সকল বৃত্তির প্রধান কারণ, অভিমান না থাকিলে, দেহ থাকে না। আমরা সর্ব্বদা—"আমি দেহী" এইরূপ অভিমান করিয়া থাকি বলিয়াই দেহটি ক্রিয়াশীল থাকে। যে মুহূর্ত্তে এই দেহাভিমান রুদ্ধ হয়, (একেবারে লোপ পায় না) সেই মুহূর্ত্তে দেহ নিশ্চল হইয়া পড়ে। এইজন্যই চতুর্দ্দশ করণের মধ্যে অহং-কারেরই প্রাধান্য, তাই মন্ত্রে, "প্রধান" বলা হইয়াছে। তারপর—এই দেহাভিমান কখনও একেবারে বিদূরিত হইতে চায় না, আপন-ভাবেই মত্ত থাকে। এইরূপ সে দেহাত্মবোধে নিয়ত আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করে বলিয়াই মন্ত্রে 'সদা-মদ' শব্দটি উক্ত হইয়াছে। এই দেহাভিমানকে বলি দেওয়া বা নির্জ্জিত করা বড় দুরূহ ব্যাপার; তাই, ইহাকে "শূর" বলা হইয়াছে। এই "অহংকার" অজ্ঞানমাত্র; তাই 'হস্তী' নামে অভিহিত হইয়াছে। হস্তী যেরূপ অমিত

বলসম্পন্ন হইয়াও দুর্ব্বল মানবের দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়, বুঝিতে পারে না যে, আত্মবল কত; সেইরূপ এই "আমিও" একদিন অমিত বলসম্পন্ন ছিল, যে দিন বিরাট্ আমিরূপে—পরমেশ্বররূপে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্তৃত্ব নিয়া ছিল,—যে দিন স্বাধীন ইচ্ছায় বহুত্ব-লীলার অভিলাষ করিয়াছিল। সেই মহান্ আমি আজ অতি ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর মাংসপিণ্ডময় দেহ মাত্রে আবদ্ধ হইয়া সমস্ত বল, সমস্ত শক্তি বিস্মৃত হইয়াছে। দেহের দাসত্ব—বিষয়ের সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত আছে; সুতরাং ইহাকে হস্তিমূর্খ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে!

জীব বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিলেও, প্রথম প্রথম এইরূপ দেহাভিমানবিষয়ক চিন্তার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। বহুজন্মের সংস্কার সহজে বিদূরিত হইতে চায় না। এরূপ স্থলে জীবের প্রধান চিন্তা ঐ হস্তীটির ভোগের জন্য।—"কান্ ভোগানুপলপ্স্যতে"; কারণ, জীব জানে—এই অহংএর ভোগ বড় বেশী; কিছুতেই ইহার ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না। সে যাহা পায়, তাহাই আয়ত্ত করিবার জন্য নিয়ত লোলুপ! সম্মুখে দেখিল—অত্যুচ্চ রাজপ্রাসাদ; অমনি অহং—সেই শূরহস্তী বলিয়া উঠিল—"উহাই চাই"। হয়ত ঐ ক্ষুধাটির নিবৃত্তি করিতে জীবের দশবার জন্মমৃত্যু-যাতনা সহ্য করিতে হইল। তার পর সম্মুখে দেখিল স্বর্গসুখ বিরাজিত, অমনি—"উহা চাই"। কিংবা সম্মুখে দেখিল অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি সুশোভিত; অমনি—"আমি উহা চাই"। এ সব ত' বড় খাদ্য! এ সকল খাদ্য সংগ্রহ করিতে জীবকে যে কত শতবার জন্মমৃত্যুর পেষণ সহ্য করিতে হয়, তাহা কে নির্ণয় করিবে? এ সকল বিপুল খাদ্য ব্যতীত কাম কাঞ্চন যশ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি, কত কি যে ইহার খাদ্য আছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এই সর্ব্বগ্রাসী আমিটিকে 'আর চাই না' বলান বড সহজ ব্যাপার নহে! যত দিন মায়ের আমার অনিন্দ্য-সুন্দর চিদ্‌ঘন মোহন মূর্ত্তিটি দেখিতে না পায়, তত দিন কিছুতেই ইহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ' যাঁহাকে পাইলে, আর কিছু পাইবার ইচ্ছা থাকে না, একমাত্র তাঁহাকে

দেখিতে পাইলেই, ইহার ভোগের অবসান হয়; নতুবা অন্য কিছুতেই হয় না। এই হস্তীটির ভোগ নিষ্পন্ন করিবার জন্যই জীবের যত কিছু আয়োজন—যত কিছু উৎপীড়ন। তাই, বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আরোহণ করিয়াও হস্তীটির ভোগ সম্পন্ন হইল কি না, এই চিন্তাদ্বারা জীবকে আকুল হইতে হয়। জীব! একবার তোমার দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট অহংটির দিকে চাহিয়া দেখ। উহার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাই তোমাকে উন্মাদের মত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাইয়া লইতেছে; জন্ম হইতে জন্মান্তরে সমানীত করিতেছে; মৃত্যু হইতে মৃত্যুর দিকে অজ্ঞাতসারে দ্রুতবেগে ধাবিত করিতেছে। উহারই তৃপ্তিবিধানের জন্য কত জীবন পরিব্যয়িত করিতেছে, অথচ কি করিলে উহার ভোগের—আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হইবে, তাহা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছ না। 'সঃ' এর নিকট অহংকে উপস্থিত কর, উহার প্রকৃত স্বরূপটি উপলব্ধি করিতে পারিবে। মাতৃ-স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাও, নিত্যানন্দময়ীকে দেখাও, নিত্য নূতন আশার অবসান হইবে। জগদ্‌গ্রাসী ভাব—জলন্ত বুভুক্ষা চিরতরে নির্ব্বাপিত হইবে। তখন এই আমিই 'ব্রহ্মাহমস্মি' বলিয়া সর্ব্ববিধ শোক মোহের পরপারে চলিয়া যাইবে—সর্ব্ববিধ ভোগের অবসান হইবে।

যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ।
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেঽদ্য কুর্ব্বন্ত্যন্যমহীভৃতাম্‌ ॥১৩॥

অনুবাদ। যাহারা (কর্ম্মকাণ্ড) পূর্ব্বে প্রসাদ, ধন এবং নানাবিধ ভোগ্যবস্তু দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া আমারই অনুগত ছিল; অধুনা নিশ্চয়ই তাহারা অন্য মহীপালগণের আনুগত্য করিতেছে।

ব্যাখ্যা। দেহাভিমানবিষয়ক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ক চিন্তা উপস্থিত হয়। জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি আসক্তির মূল শিথিল হইতে থাকে; অথচ বহুজন্মসঞ্চিত সেই অনুরাগ একেবারে দূরীভূত হয় না। তাই, উদাসীন বুদ্ধি-জ্যোতিতে অবস্থান করিয়াও বৈধকর্ম্মবিষয়ক চিত্ত-চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়।

প্রসাদ, ধন এবং ভোজন এই তিনটি দ্বারা পরিপুষ্ট হয় বলিয়া, শাস্ত্রীয় আদেশগুলি আমাদের বিশেষ অনুগত বা অনুকূল! প্রসাদ শব্দের অর্থ—চিত্তের প্রসন্নতা। ব্রত নিয়ম উপবাস পূজা হোম জপ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে একটা অসাধারণ চিত্ত-প্রসাদ লাভ হয়। কাম কাঞ্চনের সেবা করিয়া, জীব যে তৃপ্তি ভোগ করে, তদপেক্ষা একটু বিশিষ্ট তৃপ্তির সন্ধান পায় বলিয়াই, মানুষ শাস্ত্রীয় আদেশগুলি যথাসাধ্য পালন করিতে উদ্যত হয়। ধন শব্দের অর্থ—সিদ্ধিশক্তি প্রভৃতি মাতৃ-বিভূতি—ঐহিক উন্নতি, অনভীষ্টের অপ্রাপ্তি, পারত্রিক স্বর্গাদি সুখ, কিংবা মাতৃ-প্রীতি অথবা মুক্তি। ইহার কোন না কোনও ফল অর্থাৎ ধনলাভের আশা থাকে বলিয়াই মানুষ বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। ভোজন শব্দের অর্থ মাতৃ-সঙ্গভোগ এবং পঞ্চ কোষের আহার। প্রথম প্রথম বিশিষ্ট কর্ম্মের সাহায্যেই মাতৃ-সম্ভোগের অভ্যাস করিতে হয়। যতদিন 'সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদক' না হয়—যতদিন সর্ব্বভাবে সর্ব্ববস্তুতে সর্ব্বেশ্বরী মূর্ত্তির দর্শন না হয়, যতদিন মাতৃ-করুণা-মহার্ণবে পূর্ণভাবে অবগাহন করিতে পারা না যায়, ততদিন বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের অনুষ্ঠানরূপ কূপাদি জলাশয় খনন করিয়া, পিপাসা-নিবৃত্তি বা মাতৃ-সঙ্গ ভোগ করিতে হয়। সেই জন্যই পূর্ব্বাচার্য্যগণ প্রতিমাসেই নানারূপ পূজা পার্ব্বণের ব্যবস্থা করিয়া, আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। এক দিকে এই বৈধকর্ম্মাদি যেরূপ সাময়িক মাতৃ-সম্ভোগের সহায়, অন্যদিকে উহারা সেইরূপ আমাদের সর্ব্বাবয়বেরই পরিপুষ্টি বিধান করে—আহার দেয়। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ক্রিয়মাণ বৈধকর্ম্মসমূহ দেহ, প্রাণ, মন, জ্ঞান ও আনন্দের পোষণ করে। শাস্ত্রীয় আদেশগুলি যথাশক্তি প্রতিপালন করিলে, স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে ও দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। ইহাই অন্নময় ও প্রাণময় কোষের আহার। ঐ সকল কর্ম্ম মানসিক প্রসন্নতা ও স্থৈর্য্যের বিশেষ অনুকূল—আত্মাভিমুখী চিন্তাশক্তির সহায়তা করে; সুতরাং জ্ঞানলাভের পথ উন্মুক্ত হয়। যে পরিমাণে জ্ঞান অধিগত হইতে

থাকে, সেই পরিমাণে আনন্দ বা শান্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এইরূপ ভাবে বৈধকর্ম্মসমূহ আমাদের পঞ্চ কোষেরই ভোজন বা পুষ্টিবর্দ্ধন।

বর্ত্তমান যুগে অধিকাংশ লোক যে, দিন দিন বৈধকর্ম্মাদির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছেন, তাহার প্রধান হেতু—এই তিনটির প্রতি লক্ষ্যহীনতা। বিধিনিষেধগুলির মধ্যে যে অপূর্ব্ব চিত্তপ্রসাদ আছে, সিদ্ধিশক্তিরূপ ধন আছে এবং মাতৃ-সম্ভোগের আনন্দ ও পঞ্চ কোষের পুষ্টিবিধান আছে, ইহা যদি ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন, তবে কেহই উহাতে বিমুখ হইবেন না। আধুনিক পুরোহিতগণ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন বটে; কিন্তু উহার ভিতর এই তিনটির একটিরও সন্ধান রাখেন না। একটা মৃত কর্ম্ম, অভ্যাসানুযায়ী কতকগুলি মন্ত্রপাঠ করিতে হয়—করিয়া যান; সুতরাং যজমানগণও কর্ম্মকাণ্ডের যে একটা বিশেষ সার্থকতা আছে, তাহা বুঝিতে পারেন না। সেই জন্যই হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকলাপ দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। তাহারই ফলে রোগ শোক অকালমৃত্যু দুর্ভিক্ষ মহামারী জলপ্লাবন প্রভৃতি উৎপাতে দেশ জর্জ্জরীভূত হইতেছে।

এখনও গৃহে গৃহে দেবপূজা হয়, এখনও বহুসংখ্যক নরনারী ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান করে; কিন্তু ঐ প্রসাদ, ধন এবং ভোজনের দিকে লক্ষ্য নাই বলিয়াই অনেক স্থলে আশানুরূপ ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়। কেহ বলেন—কলিকালে শাস্ত্রীয় কর্ম্মসমূহের যথোক্ত ফললাভ হয় না। কেহ বলেন—কর্ম্ম অজ্ঞানের অনুষ্ঠেয়। কেহ বলেন—নামকীর্ত্তন ভিন্ন অন্য কর্ম্ম কলিযুগে নিষ্ফল। এই অসংখ্য মতবাদ শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহা ধ্রুব সত্য যে, এখন—এই কলিযুগেও বৈধকর্ম্ম সম্পূর্ণ সফল, এখনও দেবকার্য্যে দেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব হয় এবং সাধকও অভীষ্ট বর লাভে ধন্য হয়। কিন্তু সে অন্য কথা—

মা আমার শঙ্কররূপে আবির্ভূত হইয়া কর্ম্মকে অজ্ঞানমাত্র প্রতিপাদন করিলেন; আবার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের অনাবশ্যকতা কীর্ত্তন করিলেন; এক দিকে উজ্জ্বল জ্ঞানের

অন্যদিকে পরাভক্তির তীব্র কশাঘাতে কর্ম্মকাণ্ড সঙ্কুচিত ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। তাই কি বর্ত্তমান বৈধকর্ম্মগুলি প্রাণহীন একটা অনুষ্ঠানমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে? শঙ্করের মত জ্ঞানী, চৈতন্যের মত প্রেমিক হইলে কর্ম্মকাণ্ডের মূল শিথিল হয়, ইহা সত্য; কিন্তু তদনুগামিগণ—যাঁহারা সে জ্ঞান ও প্রেমের সন্ধান পান নাই, তাঁহারা যদি বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডকে অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করেন, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে—তাঁহারা ভ্রমসঙ্কুল পথে বিচরণ করিতেছেন। কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বেদ। বেদ অপৌরুষেয়। উহা ভ্রম-প্রমাদশূন্য ঋষিগণের আত্মসম্বেদন হইতে সঞ্জাত; সুতরাং কর্ম্মকাণ্ড নিষ্ফল বা অল্প ফলপ্রদ ইহা বলা অজ্ঞতার পরিচয়। তবে এমন একটা দিন আসে যে, যখন আর কর্ম্মকাণ্ডের কোন প্রয়োজনীয়তা মনে হয় না। তখন কেহ কেহ বা লোকশিক্ষার জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, আবার কেহ বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। সে অবস্থায় কর্ম্ম আপনি খসিয়া পড়ে। ভেকশাবকের পুচ্ছ আপনা হইতে স্খলিত হয়; কিন্তু সেই পুচ্ছস্খলনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে যদি কেহ উহা ছিন্ন করিয়া দেয়, তবে ভেকশিশুর মৃত্যু অনিবার্য্য।

আমাদের বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড এত মধুর, এত আনন্দপ্রদ যে, নিতান্ত পাষণ্ড ব্যক্তিও সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠানপ্রণালী-দর্শনে ক্ষণকালের জন্য বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যে পূর্ব্বকথিত প্রাণরসের সন্ধান করিয়া লইলেই, এই চিত্তপ্রসাদ, মাতৃ-বিভূতি ও মাতৃ-সম্ভোগের সুযোগ উপনীত হয়। এমন কোনও ব্রত নিয়ম কিংবা পূজাদির অনুষ্ঠানই হইতে পারে না, যাহাতে ঐ সকল অনুভূতির ন্যূনাধিক পরিমাণে লাভ না হয়। যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠাতা, তাঁহাদের ত' কথাই নাই, দর্শকগণও বিপুল আনন্দে ও সাত্ত্বিক ভাবে আপ্লুত হইয়া পড়েন।

প্রত্যেক কর্ম্মের মধ্যে অন্বেষণ করিতে হয়—আমার চিত্ত কতটা প্রসন্ন হইল, আমি কতটা মাতৃ-মহিমা দর্শন করিলাম, আমি কতটা সময় জগতের খেলা ভুলিয়া মাতৃ-সঙ্গভোগে ধন্য হইলাম। এই

সার্থকতার দিকে দৃষ্টি না থাকিলে, কর্ম্ম প্রাণহীন হইয়া পড়ে। অধিকাংশ লোকের ধারণা—আমরা যে নিত্য-ক্রিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদির অনুষ্ঠান করি, অথবা বাড়ীতে যে মাসে মাসে পূজা ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান হয়, উহা দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, কোন যোগী কিংবা সন্ন্যাসীর নিকট হইতে কোনও গুপ্ত উপদেশ লইয়া তদনুসারে সাধনা করিতে হয় এবং বহুকাল সাধনার ফলে যদি ভাগ্যবশে কদাচিৎ কাহারও আত্মসাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। এইরূপ ধারণা বহুদিন হইতে এদেশে পরিপুষ্ট হইতেছে। বৈদিক যুগে কিন্তু এরূপ ধারণা ছিল না। এখনও আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়মাণ কর্ম্মগুলিই ভগবৎলাভের পক্ষে প্রচুর। আচমন, সূর্য্যার্ঘ্য, আসন-শুদ্ধি, ইষ্টমন্ত্রজপ ইত্যাদি যে কোনও একটি কার্য্যের অনুষ্ঠান যদি যথারীতি সম্পন্ন হয়, তবে উহাতেই মানুষ অমৃতের সন্ধান পাইতে পারে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমাদের শাস্ত্রাদিতে যে বহুবিধ কর্ম্মকাণ্ডের বিধান দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ,—অধিকারিভেদে কর্ম্মভেদ। হিন্দুধর্ম্মের ইহাই বিশেষত্ব যে, অধিকারভেদে সাধন-প্রণালীর ভেদ বিহিত হইয়াছে। অন্য কোনও দেশে এই বিশেষত্ব নাই। অন্য দেশে সকলেরই উপাসনাপ্রণালী এক প্রকার। কেবল হিন্দুজাতিরই সম্প্রদায়ভেদে, ব্যক্তিভেদে, অধিকার ভেদে বিভিন্ন উপাসনার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াও বহুত্বের মধ্যে অপূর্ব্ব একত্ব, মধুর মিলন ও অচিন্ত্যনীয় সামঞ্জস্য বিন্যস্ত রহিয়াছে। গুণ ও কর্ম্মভেদে প্রত্যেক মানুষেরই প্রকৃতি পৃথক্-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে ; সুতরাং সকল মানুষেরই সাধনা-প্রণালী বিভিন্ন হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এতদ্ভিন্ন বহুবিধ কর্ম্মকাণ্ডবিধানের আর একটি উদ্দেশ্য আছে—আমাদের মন অত্যন্ত চঞ্চল ; কোন একটিমাত্র কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়া মনের স্থৈর্য্য অধিকক্ষণ রক্ষা করা দুষ্কর। নিত্য এক প্রকার রসের আস্বাদনে প্রাণও পরিতৃপ্ত হইতে চায় না। তাই একই জিনিষকে নূতন নূতন ভাবে ভোগ করিতে হয়। জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, কীর্ত্তন প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের কর্ম্মকাণ্ডগুলি

শুধু আমাদের মনের স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন-প্রিয়তার জন্যই বিহিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, প্রসাদ, ধন এবং ভোজন এই তিনটিই বৈধকর্ম্মের পরিপোষক হেতু। এই তিনটি উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সংসাধিত হয় বলিয়াই, কর্ম্মকাণ্ড আমাদের অনুগত থাকে—অনুকূল হয়; কিন্তু জীব যখন একটু একটু করিয়া প্রজ্ঞার সন্ধান পাইতে থাকে, (বুদ্ধিময় ক্ষেত্রেই প্রজ্ঞার আভাস পাওয়া যায়) তখন দেখিতে পায়, সেই নিত্য অনুকূল কর্ম্মকাণ্ডসমূহ—যাহারা এতদিন প্রসাদ, ধন এবং ভোজনের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহারা অন্য মহীভৃদ্‌গণের আনুগত্য করিতেছে। মহীভৃৎ শব্দের অর্থ—ক্ষিতিতত্ত্বপোষণকারী স্থূলাভিমানী ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগণ। কর্ম্মসমূহ মাত্র স্থূল পার্থিব ভাবগুলিরই সেবা—আনুগত্য করে। প্রথমে জীব কর্ম্মকাণ্ডের এই দোষ উপলব্ধি করিতে পারে না। মনে ভাবে, ঠিকই হইতেছে। সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি যাহা করিতে হয়, ঠিকই করিতেছি; কিন্তু হায় তখনও দেখিতে পায় না—বুঝিতে পারে না যে, উহা পার্থিব ভাবেরই পরিপুষ্টিসাধন করিতেছে। মন ও ইন্দ্রিয়ের সেবার জন্যই অনুষ্ঠিত হইতেছে। একবার চৈতন্যের সন্ধান পাইলে, একটু প্রজ্ঞার আলোকরেখা দৃষ্টিগোচর হইলেই, কর্ম্মের এই দোষ-অংশ পরিলক্ষিত হইতে থাকে। তখন জীব কর্ম্মকাণ্ডের এই স্থূলাভিমুখী দোষ দেখিয়া নিতান্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে এবং কি উপায়ে কর্ম্মগুলি জ্ঞানময় মধুময় ও আত্মানুসন্ধানযুক্ত হইতে পারে, তজ্জন্য যত্নবান হয়।

এস্থলে কর্ম্ম-রহস্য একটু আলোচনা করা আবশ্যক। বৈধকর্ম্মগুলি যতদিন জ্ঞানময় না হয় এবং জ্ঞান যতদিন ভক্তিময় না হয়, ততদিন উহারা সাধককে চরিতার্থ করিতে পারে না! কি বৈধকর্ম্ম, কি ব্যবহারিক কর্ম্ম, যে কেন্দ্র হইতে উহারা বিকাশ পায়, আবার যেখানে মিলাইয়া যায়, সেই কেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া যদি অনুষ্ঠিত না হয়, তবে উহা যথার্থ অজ্ঞানমাত্র। কর্ম্মের প্রত্যেক অঙ্গ মাতৃময় করিয়া লইলে, তবেই কর্ম্ম সার্থক হয়। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা

হুতং” রূপে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। কর্ত্তা কর্ম্ম করণ সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ এই ছয়টি কারকই ব্রহ্ম—মা। মা আমার কর্ত্তা, মা আমার কর্ম্ম, মা আমার করণ, মা আমার ফল। কর্ম্মের সর্ব্বাবয়বেই মাতৃ-সত্তার উপলব্ধি করিতে হয়, তবে কর্ম্ম জ্ঞানময় হয়। সাধক! ধ্যান করিতে বসিয়া দেখ—মা-ই মায়ের ধ্যান করিতেছেন! পূজা করিতে বসিয়া দেখ—মা-ই মায়ের পূজা করিতেছেন। পূজার উপচাররূপেও মা-ই বিরাজ করিতেছেন। হোম করিতে বসিয়া দেখ—অগ্নিরূপে মা, হবিরূপে মা, হোতারূপে মা, অর্পণরূপে মা। কাতর স্বরে মা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দেখ—শব্দরূপে মা, কাতরতা-রূপে মা। মা-ই মাকে ডাকিতেছেন। এইরূপ কর্ম্মের সর্ব্বাবয়বে মাকে দেখিতে অভ্যাস কর, কর্ম্ম জ্ঞানময় হইবে। জ্ঞান ও কর্ম্ম একই জিনিষ। কর্ম্ম অজ্ঞান নহে, জ্ঞানের ঘনীভূত বিকাশ মাত্র। যে জ্ঞানের সন্ধানে তুমি ছুটিতেছ, যে জ্ঞান অমৃতের নিদান, সেই জ্ঞানই কর্ম্মের আকারে তোমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই, তোমার “ব্রহ্মার্পণং”—মন্ত্রটি সিদ্ধ হইবে —চৈতন্যময় হইবে। তখন কি লাভ হইবে?—“ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্”। তুমি ব্রহ্মত্বে উপনীত হইতে পারিবে—জীবত্বের অব্যয় গ্রন্থি ছিন্ন হইবে; যতদিন কর্ম্মের মধ্যে এই শাশ্বত জ্ঞানকে দেখিতে না পাওয়া যায়, ততদিন কর্ম্ম কেবল পার্থিব ভাবেরই আনুগত্য করে। সুরথের শুভদিন সমাগত; তাই কর্ম্মের দোষাংশে দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। কর্ম্মগুলি যে অন্য মহীভৃদ্‌গণের সেবা করিতেছে, আমার—আত্মার—জ্ঞানের—সচ্চিদানন্দের সেবা ত করে না! কর্ম্মের যাহা লক্ষ্য, কর্ম্মের যাহা মধু, তাহা সবই যে অন্য উদ্দেশ্যে পরিব্যয়িত হইতেছে। এখন পর্য্যন্ত কর্ম্মগুলি ত জ্ঞানময় হয় নাই! যে আত্মজ্ঞান-লাভ জীবের চরম এবং পরম উদ্দেশ্য, বৈধকর্ম্মসমূহ এখন পর্য্যন্তও ত সে উদ্দেশ্যে, সেরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে না! যাঁহার দিকে তাকাইয়া যাঁহার প্রেমে আসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়, এতদিন তাঁহার সন্ধানই পাওয়া

যায় নাই। এখন মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, ইহা বুঝিতে পারিয়াই সুরথের এই সকল ভাবনার সময় আসিয়াছে।

অসম্যগ্ ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ সততং ব্যয়ম্।
সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি ॥১৪॥

অনুবাদ। অসম্যক্ ব্যয়শীল সেই মহীভৃদ্গণের সতত ব্যয়ের ফলে, আমার অতি দুঃখে সঞ্চিত (প্রাণময়) কোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে।

ব্যাখ্যা। জীবের জ্ঞানচক্ষু ধীরে ধীরে যত উন্মেষিত হইতে থাকে, ততই সে নিজের দোষগুলি উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করিতে পারে। কেবল বৈধকর্ম্মগুলি যে স্থূলভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়সমূহের আনুগত্য করিতেছে, তাহা নহে; উহারা—ঐ মহীভৃদ্গণ অপরিমিত ব্যয় করিয়া বহুকষ্টে সঞ্চিত প্রাণময় কোষেরও অযথা ক্ষয় করিতেছে; ইহাও সে বেশ দেখিতে পায়। প্রাণময় কোষ বিনষ্ট হইলে দেহ বা অন্নময় কোষেরও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। অসময়ে মাকে লাভ করিবার পূর্ব্বে দেহের পতন কাহারও অভীষ্ট নহে। ঈশোপনিষৎ বলেন—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" জগতের সর্ব্বত্র পরমেশ্বরের সত্তা দর্শনরূপ কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া, শত সংবৎসর-কাল অর্থাৎ পূর্ণ আয়ুষ্কাল জীবিত থাকিবার অভিলাষ করিবে; আত্মহন্ হইবে না। পুরুষায়ুপরিমাণের পূর্ব্বেই যদি অসম্যক্ প্রাণ-ব্যয়ের ফলে অসময়ে দেহের পতন হয়, তবে পুনরায় গর্ভ-যন্ত্রণা প্রভৃতি নানাবিধ দুঃখসম্ভোগ অনিবার্য্য। তাই, সতত প্রাণশক্তির অযথা অপচয় দেখিতে পাইয়া, জীব নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে।

অতিদুঃখেন সঞ্চিতঃ—আমরা কত কষ্ট করিয়া, কত শোক দুঃখ মর্ম্মপীড়া কত জন্মমৃত্যুর যাতনা সহ্য করিয়া, ধীরে ধীরে কত সুদীর্ঘ কালের কঠোর প্রযত্নে এই মনুষ্যোচিত প্রাণ ও দেহটি লাভ করিয়াছি; তাহা স্মরণ করিলেও ভয় হয়। জীব যখন ইন্দ্রিয়হীন, কেবল একটু স্পন্দন-ধর্ম্ম লইয়া ক্ষুদ্রতম জীবাণু-আকারে প্রথম

উন্মেষিত হয়, (ইহার পূর্ব্বে যে কতকাল জড়পদার্থরূপে অভিব্যক্ত ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই) চৈতন্যের সেই প্রথম উন্মেষণে যখন অপেক্ষাকৃত প্রবল জীব কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন সেই প্রবলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার কোন উপায় না থাকায় জীবহৃদয়ে বিন্দুমাত্র কাতরতার অভিব্যক্তি হয়। প্রাণরূপিণী মা আমার সেইটুকু মনে করিয়া বসিয়া থাকেন। তাই পরবর্ত্তী জন্মে অপেক্ষাকৃত বলবান্ দেহ লাভ করে। মনে কর, একটি পুরীষকীট ইন্দ্রিয়হীন—তাহার মাত্র স্পন্দন-ধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়াছে। (ঐ স্পন্দনটুকু আছে বলিয়াই আমরা চৈতন্যের জীব-ভাবীয় অভিব্যক্তি বুঝিতে পারি)। কতকগুলি পিপীলিকা তাহাকে চতুর্দ্দিক হইতে দংশন করিতে আরম্ভ করিল। সে দংশন-যন্ত্রনায় অস্থির হইয়াও দেখিতে পাইতেছে না—কে তাহাকে যাতনা দিতেছে। তাহার সেই কাতর নির্ব্বাক দর্শনবাসনাটি মায়ের বুকে লাগিল। তিনি পরবর্ত্তী জীবনে তাহাকে চক্ষুস্মান্ কীটরূপে পরিবর্ত্তিত করিলেন। সেই জীবনে চক্ষুস্মান্ হইয়াও সম্মুখত উৎপীড়নকারীর হস্ত হইতে পলায়ন করিবার সামর্থ্য নাই দেখিয়া আবার কাতর প্রার্থনা উঠিল—আবার অন্তর্যামিনী মায়ের প্রাণে লাগিল। পরবর্ত্তী জন্মে সে গমনশীল পলায়ন-সমর্থ কীটরূপে আবির্ভূত হইল। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য-পূর্ণ পরিণত অবস্থায় উপনীত হইতে অর্থাৎ মনুষ্যকুলে আসিয়া উপস্থিত হইতে অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়, এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। স্থূল কথায় বহু লক্ষ জন্ম-মৃত্যু-প্রবাহ অতিক্রম করিয়া, অগণিত ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া যে, এই প্রাণময় কোষ অর্থাৎ মানব-দেহটি গঠন করিয়া লইতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাই, সুরথ বলিলেন—'সঞ্চিতঃ সোঽতিদুঃখেন'।

ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি—প্রাণময় কোষের অযথা অপচয়। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন হইতে এই কোষক্ষয় আরম্ভ হয় এবং সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। জগতে আমরা যাহা

কিছু করি, তাহাতেই কিছু না কিছু প্রাণশক্তি পরিব্যয়িত হয়। এই যে মহীয়সী বিরাট্ প্রকৃতি অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়-সম্ভার-পরিপূর্ণ উপহারডালা সাজাইয়া, প্রতিনিয়ত তোমার সম্মুখে অনুগতা পরিচারিকার ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন এবং তোমার বাসনানুরূপ বিষয়-প্রদানে পরিতৃপ্তিসাধন করিতেছেন, মনে করিও না জীব! উহা বিনামূল্যে লাভ করিতেছ। মনে করিও না, কোন প্রতিদানের অপেক্ষা না করিয়া, প্রকৃতি সুন্দরী তোমাকে এই জগদ্ভোগের সুযোগ দিতেছেন। তুমি ফুল দেখিলে, ফল দেখিলে, কার্য্যতঃ অজ্ঞাতসারে বিন্দু বিন্দু করিয়া তোমার প্রাণশক্তির অপচয় হইল। তুমি স্ত্রী পুত্র ধন যশ প্রভৃতিকে ভালবাসিতেছ; ভাবিয়া দেখিয়াছ কি—কোন্ জিনিষ ইহার বিনিময়ে তোমাকে দিতে হইতেছে! ঐ প্রাণশক্তি! যাহা সঞ্চয় করিতে—যে মনুষ্যোচিত দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতি ও শক্তি লাভ করিতে তোমাকে অগণিত জন্মমৃত্যু, দুঃখের অসহনীয় পেষণ সহ্য করিতে হইয়াছে, ঐ দেখ! সেই প্রাণশক্তি পলে পলে নিশ্বাসে নিশ্বাসে নির্গত হইয়া যাইতেছে। হায়! জীব! অতি কঠোর যত্নে সঞ্চিত এই প্রাণময় কোষের অযথা ক্ষয় দেখিয়া, কবে তুমি সুরথের মত উৎকন্ঠিত হইবে! দিন দিন যে অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছ; পৃথিবীতে এমন কেহ আত্মীয়, এমন কেহ বন্ধু নাই যে, তোমার এই মৃত্যুগতি রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইবে! কেবল আহার নিদ্রার ও কামনার সেবা করিয়া, অতি দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবন অতিবাহিত করিয়া দেওয়া অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি আছে! মাত্র ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়াই পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হইতেছে। কেবল মৃত্যু নহে, জীবনকালেও অপরিমিত প্রাণশক্তির অপচয় ফলে, নানাবিধ রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, মৃত্যুর অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। তুমি সর্ব্ববিধ পার্থিব সুখ-সম্ভোগের মধ্যে প্রতিমুহূর্ত্তে এই প্রাণব্যয়রূপ মৃত্যুর করাল ছায়া দর্শনে উৎকন্ঠিত হও, অচিরে অমরত্বের সন্ধান পাইয়া, সুরথের ন্যায় ধন্য হইবে।

এই প্রাণশক্তির অযথা ক্ষয় নিরোধ করিবার জন্য ধর্ম্মজগতে

প্রাণায়াম, হঠযোগ, নাভিক্রিয়া প্রভৃতি নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিবার বিধান আছে। বিভিন্ন কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমাদের নিশ্বাসের গতির বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ আমরা প্রতিশ্বাসে যতটা বহির্বায়ু গ্রহণ করি, প্রতি নিশ্বাসে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে বায়ু নির্গত হয়। এই অতিরিক্তটুকুই আমাদের সঞ্চিত প্রাণশক্তির অংশ। বায়ু ঠিক প্রাণশক্তি নহে, প্রাণের স্থূল বিকাশমাত্র। সুস্থ শরীরে স্বাভাবিক শ্বাসের গতি দ্বাদশাঙ্গুলি। অধিক ভোজন, নিদ্রা, রতিক্রিয়া, ধাবন প্রভৃতি কার্যে উহার গতি অত্যধিক মাত্রায় পরিবর্দ্ধিত হয়। ঐ বৃদ্ধি অর্থাৎ অতিরিক্ত ক্ষয় রহিত করার জন্য আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদির সংযম অবলম্বন করিতে হয়। তারপর স্বাভাবিক গতির হ্রাস করিয়া, ক্রমে নাসাভ্যন্তরচারী শ্বাসপ্রশ্বাস অভ্যাস করিতে হয়। পরিশেষে কুম্ভকের সাহায্যে একেবারে বায়ু নিরোধপূর্ব্বক দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার চেষ্টা করিতে হয়। কঠোর অধ্যবসায়-বলে উহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, দীর্ঘকাল উপযুক্ত ক্রিয়াবান্ গুরুর নিকট অবস্থান করিয়া, উহা অভ্যাস করিতে হয়। তাহার ফলে সুস্থ শরীর, দীর্ঘজীবন এবং দুই একটি ক্ষুদ্র সিদ্ধিলাভও হইতে পারে, কিন্তু মানুষ কি মাত্র উহাতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে? যত চেষ্টাই করা হউক, যত যোগকৌশলই অবলম্বন করা হউক, মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোনও উপায় নাই; সুতরাং যেখানে গেলে, যে উপায় অবলম্বন করিলে আর মরিতে হয় না, যাহা পাইলে মৃত্যু বলিয়া একটা বোধই থাকে না, সেই অভয় অমৃত মাতৃ-স্নেহ ভোগের জন্য সমস্ত অধ্যবসায়ের প্রয়োগ করাই একান্ত সঙ্গত।

একমাত্র প্রাণেশ্বরী মহাপ্রাণময়ী মহামায়া মায়ের আমার মহতী পূজা বা এই বিরাট্ ব্রহ্মযজ্ঞদর্শনকারী সাধকই এই অমরত্বলাভে সমর্থ। যে সাধক দেখিতে পায়—তাহার প্রত্যেক ইঙ্গিত, প্রত্যেক প্রচেষ্টা, প্রত্যেক চিন্তা, প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালন, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে মহামায়ারই পূজা নিষ্পন্ন হইতেছে, যে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে—"প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ। যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব

পূজনম্”। মাত্র সে-ই এই কোষক্ষয় হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। যাহার সকল কর্ম্মই মাতৃময় হইয়াছে, যে সাধক ‘ব্রহ্মার্পণং’ মন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত হইয়াছে, তাহার জন্মমৃত্যুর ধাঁধাঁ চিরতরে দূরীভূত হইয়াছে ; সুতরাং কোষক্ষয়-নিরোধ বলিয়া তাহার আর পৃথক্ কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় না। যতদিন ধর্ম্ম কর্ম্মসমূহ, কেবল ধর্ম্ম কর্ম্ম নহে—সকল কর্ম্মই জ্ঞানময় না হয়, অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানই যে কর্ম্মের আকারে প্রকাশ পাইতেছে, এই বোধ যতদিন বিকাশপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন কর্ম্মগুলি অহং-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অহং-বুদ্ধিতে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, উহা প্রাণক্ষয় করিবেই ; কারণ, জীব যে ক্ষর পুরুষ! ক্ষরণ বা অপচয় জীবের নিয়ত ধর্ম্ম। নৈষ্কর্ম্ম্য অবলম্বনই কর, কিংবা প্রাণায়ামই কর, যতদিন অক্ষর পুরুষের সন্ধান না পাইবে, ততদিন এই ক্ষয়নিরোধের কোনও উপায় নাই।

যাহা হউক, প্রাণময় কোষটি যথোপযুক্তভাবে গঠিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করিতে যে বহুজন্মের কাতর ক্রন্দন, বহুজন্মের আকুল আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ লক্ষ জীবন-আহুতি, লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর পেষণ সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, ইহার অপব্যয় করিতে জীব সঙ্কুচিত হইবেই। কেবল ইন্দ্রিয়বৃত্তির সেবায়—মনের আদেশ প্রতিপালনে ইহার ব্যয় হইলে, তদপেক্ষা শোচনীয় দৃশ্য আর কি হইতে পারে? জীব যখন সৌভাগ্যবান্ হয়—সুরথ হয়, তখনই স্বীয় দেহ প্রাণ মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতির মধ্যে দিবারাত্র কিরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে থাকে। তখনই সে আত্মলাভের প্রতিকূল ঘটনা-সমূহ প্রতিরুদ্ধ করিতে প্রয়াস পায় ; কিন্তু দেখে—আমার যে সবই বিনাশ-মুখী ; সবই যাইতে বসিয়াছে! অতি যত্নে পালিত বৃত্তিনিচয় অসদ্‌বৃত্ত হইয়াছে। মন নিয়ত পরিচ্ছিন্ন বিষয়সুখে মুগ্ধ! দেহপুর বিলুণ্ঠিত! প্রাণশক্তি ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতায় ক্ষয়প্রাপ্ত! শত্রু মিত্র উভয়েই প্রতিকূল! তবে আর আমার কি আছে! কাহাকে আশ্রয় করিয়া আমি মাতৃ-লাভের পথে অগ্রসর হইব!

মা! যাঁহারা তোর প্রিয়তম সাধক সন্তান, তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা

মন বিশুদ্ধ রাখিয়াছে, প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযম করিয়াছে, প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণের অপচয় নিরোধ করিয়াছে। তাঁহারা মা বলিয়া ডাকিলে, তাহাদের মন প্রাণ ইন্দ্রিয় এক সুরে বাজিয়া উঠে, সে মাতৃ-ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত পবিত্রীকৃত হয়, আর তুমিও মা সে আহ্বানের প্রবল আকর্ষণে স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদের কণ্ঠে বিজয়মাল্য পরাইয়া দেও, তাঁহারা ধন্য হন। কিন্তু মা! আমাদের উপায় কি। আমরা যে দিক্‌ চাই, সবই ত' অন্ধকার! যদি বা একবার ক্ষীণকণ্ঠে মা বলিয়া ডাকিতে চেষ্টা করি, অমনি মন তাহার পুঞ্জীভূত সংস্কার লইয়া সম্মুখে দাঁড়ায়! চির চঞ্চল ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিতে থাকে। আর প্রাণ! তার ত' খোঁজই নাই! সে ইন্দ্রিয়ের সেবায় নিরত। তবে এই মনহীন ইন্দ্রিয়হীন প্রাণহীন, সুতরাং শ্রদ্ধাভক্তি ও বিশ্বাসহীন এই দুর্ব্বল ক্ষীণকণ্ঠের মাতৃ-আহ্বান কি তোর কৈলাসের হৈম-সিংহাসন পর্য্যন্ত পৌছিবে মা! তুই কি কনিষ্ঠ অর্ব্বাচীন সংসারতাপে জর্জ্জরিত দুর্ব্বল সন্তানের দিকে চাহিয়া দেখিবি মা! এই অষ্টবন্ধনযুক্ত শিশুপুত্রকে একবার কোলে লইবার জন্য উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিবি কি মা! দেখ, কি দুরবস্থায় নিপতিত আমরা। এ অধম পুত্রগণের গায়ে ধূলা ময়লা দুর্গন্ধ দেখিয়া পথের ধারে ফেলিয়া রাখিলে, তোর অকলঙ্ক মাতৃ-স্নেহ কলঙ্কিত হইবে! যে তোকে চায়, সে ত' নিশ্চয়ই তোকে পায় মা। আমরা যে চাইতেই পারিলাম না! মন চায় ভোগ, ইন্দ্রিয় চায় বিষয়, প্রাণ চায় দেহ; সুতরাং তোকে আর চাহিতে পারিলাম কই! যত দিন যায়, ততই মর্ম্মে-মর্ম্মে ইহার উপলব্ধি হয়।

আমরা না চাহিলেও তুই আসিবি কৃপাময়ি! এত কৃপা, এত স্নেহ তোর বুকে মা! তোর স্নেহের একবিন্দু পাইয়া, জগতের মা পুত্রস্নেহে আত্মহারা। আর সিন্ধু তুই, তোর স্নেহ কত বেশী! জানি তুই মা! যেখানে অপরাধ বলিয়া কিছু নাই, সেই মা তুমি আমাদের; সন্তানের দোষ দেখিতে অন্ধা মা আমার! তুমি আসিবে! আমায় আত্মহারা করিবে—আমার চিবুক ধরিয়া তেমনি করিয়া

"এস বাবা" বলিয়া আদর করিবে। আর আমি অভিমানে মুখ ফিরাইয়া বলিব—"আর তোকে মা বলে ডাক্‌বো না মা!"

এই চারিটি মন্ত্রে সুরথের যে সকল চিন্তার বিষয় কথিত হইয়াছে, এই স্থলে আর একবার তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া লওয়া যাউক। প্রথম, দেহপুর-বিষয়ক চিন্তা—অসদ্‌বৃত্ত ইন্দ্রিয়গণের অযথা পরিপোষণ, দ্বিতীয়, দেহাভিমানের বিপুল ভোগ-বাসনা-বিষয়ক চিন্তা, তৃতীয়, কর্ম্মকাণ্ডের বহির্মুখতা এবং চতুর্থ, বহুকষ্টে সঞ্চিত প্রাণময় কোষের অযথা ক্ষয়-বিষয়ক চিন্তা। যাঁহারা বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপনীত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, সেরূপ সাধকগণের এই সকল চিন্তা একান্ত স্বাভাবিক।

এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্থিবঃ।
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ ॥১৫॥

অনুবাদ। হে বিপ্র! রাজা সুরথ সর্ব্বদা এইরূপ এবং অন্যান্য নানাবিধ চিন্তা করিতেন। অনন্তর একদিন তিনি সেই আশ্রমের সমীপে এক বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন।

ব্যাখ্যা। এইরূপ নানাবিধ চিন্তাদ্বারা জীব যখন একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়ে, কি উপায়ে এই দেহেন্দ্রিয়ের প্রতিকূলতা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, অভয় মাতৃ-অঙ্কে চিরতরে আশ্রয় লইবে, এইরূপ চিন্তায় যখন অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে, তখনই মা আমার এক বৈশ্যের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার সংঘটন করাইয়া দেন। প্রবেশার্থক বিশ্‌ ধাতু হইতে বৈশ্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রবেশ-ধর্ম্মশীল ব্যক্তিই বৈশ্য। বুদ্ধির রাজ্য অতিক্রম করিয়া, যে ব্যক্তি আত্মরাজ্যে—মাতৃ-অঙ্কে প্রবেশ করিতে উদ্যত, তাহাকে বৈশ্য বলে। ইহার বিশেষ পরিচয় পরে পাওয়া যাইবে। এস্থলে জাতিরহস্য-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আত্মার জাতি নাই, দেহেরও জাতি নাই; কিন্তু দেহাত্মবোধবিশিষ্ট জীবের জাতি সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ। গুণ ও কর্ম্মভেদে জাতির ভেদ হয়। গুণ ও কর্ম্ম অনাদি;

সুতরাং জাতিও অনাদি। ইহা মনুষ্যকৃত একটি সামাজিক শৃঙ্খলা-বিধান নহে। সূক্ষ্মদেহের বর্ণ-বৈচিত্র্যই বিভিন্ন জাতি বা বর্ণের প্রবর্ত্তক। সাধনজগতে অধিকারের স্তরভেদে বর্ণচতুষ্টয় নিরূপিত হইয়াছে। যত দিন জীব ভগবানকে আত্মভেদে বিশিষ্ট মূর্ত্তি বা ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সেবা পরিচর্য্যাদি করিয়া পরিতৃপ্ত থাকে, তত দিন সে শূদ্রস্তরীয় সাধক; যখন জীব আপনাকে ভগবানের অংশ বলিয়া বুঝিতে পারে এবং নানাবিধ অভীষ্ট ফললাভের আশায় সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত কোনও বিশিষ্ট মূর্ত্তি বা ভাবের সমীপস্থ হইয়া, তাহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহাকে বৈশ্যস্তরীয় সাধক বলা যায়। যখন ভগবান্‌কে একান্ত আত্মীয়বোধে জীবত্বরূপ ক্ষত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তখন সে ক্ষত্রিয়স্তরের সাধক। আর যাঁহারা ব্রহ্মকে আত্মারূপে জানেন, অর্থাৎ চিন্ময়ী মহাশক্তির চরণে জীবভাবীয় কর্ত্তৃত্ব সম্যক্‌ভাবে উৎসর্গ করিয়া, নিত্যানন্দ ভোগ করিতে করিতে জগতের মঙ্গল-বিধানে নিরত থাকেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ।

শারীরিক-ভাষ্য শূদ্রশব্দের অর্থ করিয়াছেন—"শুচা দ্রবতি ইতি শূদ্রঃ"। যে ব্যক্তি শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে সে-ই শূদ্র; যাঁহারা এই শূদ্রত্ব হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহারাই বৈশ্য। বেদশাস্ত্রে বা মাতৃ-সম্বেদনে প্রথম প্রবিষ্ট সাধকগণই বৈশ্য-জাতি। যাঁহারা আত্মলাভে অর্থাৎ আত্মসমর্পণে উদ্যত, তাঁহারা ক্ষত্রিয়। যাঁহারা আত্মলাভে কৃতকৃতার্থ তাঁহারা ব্রাহ্মণ। আধ্যাত্মিক জগতের এই তারতম্য এবং বিভাগ-অনুসারেই ব্যবহারিক জগতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বিভাগ হইয়াছে! একই মহান্ উদ্দেশ্যে—একমাত্র আনন্দময় পরমাত্মবস্তু-লাভের উদ্দেশ্যে ধাবমান এই বিরাট জনসংঘের যাঁহারা সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী তাঁহারা ব্রাহ্মণ; যাঁহারা তৎপশ্চাদ্‌বর্ত্তী তাঁহারা ক্ষত্রিয়। এইরূপ ক্রমপশ্চাৎ জনসংঘ বৈশ্য ও শূদ্র নামে অভিহিত হয়। ইহাতে বিদ্বেষ নাই, হিংসা নাই, পরস্পর সহানুভূতি আছে। যাহারা শূদ্র

অথবা বৈশ্যজাতীয় হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত গুণ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা কিছুদিন পরে অবশ্যম্ভাবী ব্রাহ্মণ জন্ম জানিয়াও, বালকোচিত অধীরতার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ইহজন্মেই ব্রাহ্মণ হইবার অভিলাষে কোনরূপ সমাজস্থিতির বিশৃঙ্খলা উৎপাদন হইতে বিরত থাকেন, ইহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অভিপ্রেত ছিল। তাই, তিনি গীতায় বর্ণসঙ্করের অনিষ্টকারিতা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও বর্ত্তমান যুগে বর্ণসঙ্করতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, তথাপি এখনও মানুষমাত্রেরই স্ব স্ব বর্ণোচিত আশ্রমধর্ম্ম-প্রতিপালনে যত্নবান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি যে ভাবে যে কার্য্যে নিযুক্ত আছ, তাহার সেই কার্য্য নিন্দিত হউক অথবা প্রশংসিত হউক, যে যেমন অবস্থায় আছ, ঠিক তেমনই থাকিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হও। সর্ব্বতোভাবে তাঁহার চরণে আশ্রয় নিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। কর্ম্মের শক্তি দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইবে, অথচ চিত্তে একটা অনুপম নির্ম্মল শান্তি সর্ব্বদা বিরাজমান থাকিবে। প্রত্যেক বর্ত্তমান অবস্থার ভিতর দিয়া জীবনের সার্থকতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। ভবিষ্যৎ বা অতীত অবস্থাগুলির সার্থকতা আপনি আসিবে। "শেষ জীবনে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিব," উহা অলসের শূন্যগর্ভ বাক্যবিন্যাসমাত্র। 'একান্ত আশ্রয় তুমি প্রভু', 'একান্ত সুহৃৎ তুমি আমার' বলিয়া প্রত্যেক বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে (যে মুহূর্ত্তে তাঁহার কথা মনে পড়িয়া যায়) তাঁহার নিকট সকল দুঃখ কষ্ট পাপ আত্মগ্লানি সরলপ্রাণে নিবেদন কর। অচিরাৎ আশ্রমধর্ম্ম বর্ণধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তোমায় কোন বিশিষ্ট চেষ্টা করিতে হইবে না, দেখিতে পাইবে,—কোন অজ্ঞেয় শক্তি তোমার ভিতরে থাকিয়া সকল আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করাইয়া লইতেছে। গীতার সেই সুমধুর আশ্বাস-বাণী স্মরণ কর—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ ব্যবসিতো হি সঃ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

স পৃষ্টস্তেন কস্ত্বং ভো হেতুশ্চাগমনেঽত্র কঃ।
সশোক ইব কস্মাত্ত্বং দুর্ম্মনা ইব লক্ষ্যসে ॥১৬॥

অনুবাদ। সুরথ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কে? এখানে আগমনের প্রয়োজন কি? কেনই বা আপনাকে শোকাচ্ছন্ন এবং দুর্ম্মনায়মান দেখা যাইতেছে?

ব্যাখ্যা। কিছুদিন বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে বারংবার যাতায়াত করিবার ফলে ধীরে ধীরে একটা তন্ময়তা আসিতে থাকে। প্রাণ-প্রিয় মনোবিমোহন বুদ্ধিজ্যোতির উপর একটু একটু আত্মপ্রতিবিম্বের আভাস পাইয়া স্বভাবতঃ তাহাতে ক্ষণকালের জন্য সাধকের মুগ্ধতা উপস্থিত হয়। এই মুগ্ধভাব হইতেই একটু একটু তন্ময়তা আসে। তখন ঐ তন্ময়তার স্বরূপ কি তাহা অবগত হইবার জন্য সে আগ্রহান্বিত হয়। যে তন্ময়তা-লাভের জন্য সাধকগণ কত রকম যৌগিক কৌশল অবলম্বন ও কঠোর অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়াও বিফলমনোরথ হন, তাহা যে স্বয়ং অনাহূতভাবে উপস্থিত হয়, ইহা জীব প্রথমে ধারণাই করিতে পারে না; তাই, উহার পরিচয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়। সেই অবস্থাটি অপূর্ব্ব আনন্দপ্রদ হইলেও তখন পর্য্যন্ত বিষয়মলিনতা ও জীবভাবীয় পরিচ্ছিন্নতা থাকে; সেই জন্যই, মন্ত্রে বৈশ্যকে সশোক ও দুর্ম্মনা বলা হইয়াছে। অন্ততঃ সুরথের নিকট বৈশ্য সেইরূপেই প্রতীয়মান হইতেছিল। সুরথের প্রথম কথাগুলি আগন্তুকের প্রতি প্রণয়ভাবের সূচনা করিতেছে। এই বৈশ্য যে জীবের অতি প্রিয় এবং একান্ত আকাঙ্ক্ষিত, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্।
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতো নৃপম্ ॥১৭॥

অনুবাদ। ভূপতির এরূপ প্রণয়গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বৈশ্য বিনয়নম্র হইয়া রাজাকে বলিলেন।

ব্যাখ্যা। আগন্তুকের পরিচয় পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়াস পাইলেই জীব বুঝিতে পারে—এ অবস্থাটি কি, যেহেতু মা নিজেই দয়া করিয়া জীবের সকল সংশয় দূরীভূত করিয়া দেন। প্রথম যখন তন্ময়তা উপস্থিত হয়, তখন জীব উহার প্রকৃত স্বরূপ কিছুই জানে না; অথচ সে অবস্থা অতীব সুখাবহ বলিয়া পুনঃপুনঃ তাহার সঙ্গলাভের বাসনা হয়। প্রথম দর্শনেই একটা পরমাত্মীয় ভাব হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে, সাধকের এই প্রণয়োদিত ভাবের উদ্বেলন বশতঃই আগন্তুক অসঙ্কুচিতভাবে স্বকীয় পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

বৈশ্য উবাচ।

সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে।
পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥১৮॥

অনুবাদ। বৈশ্য বলিলেন—আমি সমাধি নামক বৈশ্য, ধনীদিগের কুলে আমার জন্ম; কিন্তু ধনলোলুপ অসাধু স্ত্রী পুত্রকর্ত্তৃক আমি বিতাড়িত হইয়াছি।

ব্যাখ্যা। বহু-জন্ম-সঞ্চিত সুকৃতির ফলে, জীব সমাধির সন্ধান পায়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থাই সাধারণ জীবের নিয়ত ভোগ্য। ঐ তিনটি ব্যতীত আর একটী অবস্থা আছে, তাহার নাম তুরীয় বা সমাধি। কদাচিৎ কোনও জীব ইহার সাক্ষাৎকার-লাভে ধন্য হয়। যে অবস্থায় মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার, চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্ পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই চতুর্দ্দশ করণ ক্রিয়াশীল থাকে, সেই অবস্থার নাম জাগ্রৎ। যখন কেবল অন্তঃকরণ-চতুষ্টয় ক্রিয়াশীল থাকে, অবশিষ্ট দশ ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে, তখন স্বপ্ন-অবস্থা। যখন এই চতুর্দ্দশ করণ সকলই নিষ্ক্রিয় হয়, তখন ইহাকে সুপ্তাবস্থা বলে। এই সুপ্তাবস্থায় আমরা আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হই। তখন জগৎজ্ঞান এবং "আমি আছি" এ জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হয় না।

ইহাকে প্রায় মৃতবৎ অবস্থা বলা যায়। কিন্তু সমাধি অবস্থায় তাহা হয় না—জগৎজ্ঞান থাকে না, অথচ আত্মসত্তাটি প্রবুদ্ধ থাকে। যাহাকে বলে 'জাগিয়া ঘুমান'। জগদ্‌ভাবে সম্পূর্ণ নিদ্রিত; কিন্তু আত্মভাবে প্রবুদ্ধ, ইহারই নাম সমাধি। বুদ্ধিযোগের ফলে চৈতন্যময় মহাব্যোমমণ্ডলে অবস্থান করিতে অভ্যস্ত হইবার পর, এই অবস্থা আপনা হইতে উপস্থিত হয়। ইহা আত্মরাজ্য ও মাতৃ-অঙ্ক-লাভের প্রবেশদ্বার। তাই, ইনি বৈশ্য বা আত্মরাজ্যে প্রথম প্রবেশক বলিয়া পরিচয় দিলেন। ধনীদিগের কুলেই ইহার আবির্ভাব। যাহারা মাতৃ-স্নেহরসে অভিষিক্ত, ভক্তিধনে ধনবান্, যাহারা সদ্‌গুরুর অহৈতুক কৃপাধনে জ্ঞানবান, যাহারা সত্যপ্রতিষ্ঠার অসীম শক্তিতে বীর্য্যবান্, যাহারা বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মফলে—চিন্ময়জ্যোতির্ধনে ধনবান্, সেই ধনবান্‌দিগের কুলেই সমাধির আবির্ভাব হয়।

সমাধি—অষ্টাঙ্গযোগের চরম অঙ্গ। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান এবং সমাধি, যোগশাস্ত্রে এই আটটি যোগাঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছে। এ গুলি যে কেবল ভগবৎলাভের পক্ষেই উপযোগী তাহা নহে, যোগ ব্যতীত জগতের কোন ব্যাপারই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। যোগ শব্দের অর্থ মিলন। কি ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের মিলন, কি মনের সহিত বুদ্ধির মিলন, কি বুদ্ধির সহিত আত্মার মিলন, কি প্রত্যগাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন কিংবা ভক্তের সহিত ভগবানের অথবা মাতার সহিত পুত্রের মিলন, ইহার সকলই যোগশব্দবাচ্য। এই মিলন বা যোগ পূর্ব্বোক্ত যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গের সমষ্টিমাত্র। বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগের নাম কর্ম্ম; সুতরাং কর্ম্মমাত্রই যোগ এবং জীবমাত্রই যোগী। মহাযোগিনী যোগমায়া মায়ের আমার কল্পিত প্রত্যেক পরমাণুই এই মহাযোগে সতত যুক্ত। মহাযোগী মহেশ্বরের হৃদয়বিহারিণী যোগেশ্বরীর সহিত যোগচ্যুতি বা সম্বন্ধবিলোপ ঘটিলে, ব্যোম-পরমাণু পর্য্যন্ত অস্তিত্ববিহীন হয়। সম্যক্ মাতৃমিলনে—মহামুক্তিতে এই যোগের অবসান। কোন্ অতীত

যুগে—কোন্ প্রথম চৈতন্যের অভিব্যক্তি-দিনে এই যোগের আরম্ভ হইয়াছে এবং কতদিনে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে, তাহা আমার যোগরাণী মা ব্যতীত অন্য কে বুঝিবে?

এইবারে আমরা দেখিব—কিরূপে কর্ম্মমাত্রেই যোগ হইয়া থাকে। মনে কর—তুমি আহার করিতেছ; তৎকালে তোমার চিত্তকে অন্যান্য কার্য্য হইতে আবশ্যকানুরূপ কথঞ্চিৎ সংযত করিতে হয়, ইহারই নাম যম। আহার করিতে হইলে হস্ত পদাদি-প্রক্ষালন, অন্নাদির যথাস্থানে সংস্থাপন ইত্যাদি কতকগুলি আবশ্যক নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়, ইহাই নিয়ম। যেরূপ ভাবে উপবেশন করিলে আহারকার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, সেরূপ উপবেশনের নাম আসন। ধাবন কিংবা শয়নকালে যেরূপ অঙ্গসংস্থান করিতে হয়, সেরূপ করিলে আহারকার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। যেরূপ অঙ্গসংস্থান যে কার্য্যের পক্ষে উপযোগী ও সুখকর, তাহাই সে কার্য্যের উপযুক্ত আসন। তার পর প্রাণায়াম। প্রাণের আয়াম অর্থাৎ বিস্তার। প্রাণায়ামতত্ত্ব পরে ব্যাখ্যাত হইবে। সাধারণতঃ, প্রাণায়াম বলিলে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংযম বুঝায়। বিভিন্ন কার্য্যের অনুষ্ঠানে আমাদের শ্বাসের গতির পরিমাণ ও মাত্রার যে তারতম্য হয়, প্রাণের আয়াম অথবা সঙ্কোচই উহার হেতু। যে কার্য্যে প্রাণের প্রসার হয়, সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে শ্বাসের গতি মৃদুভাবে নিষ্পন্ন হয়। আর যে কার্য্যে প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, সেই কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে শ্বাসের গতি তীব্র হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের গতির হ্রাসবৃদ্ধি মানুষমাত্রেরই লক্ষ্য; কিন্তু প্রাণায়াম সাধকগণের প্রণিধানযোগ্য। কোন্ কার্য্যে প্রাণ কি পরিমাণ আয়াম বা সঙ্কোচ লাভ করে, তাহা লক্ষ্য করিয়াই পূর্ব্বাচার্য্যগণ পুণ্য পাপ ও বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রাণ স্বভাবতঃ প্রসারিত হয়, তাহাই শাস্ত্রে পুণ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে; উহাই বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম। আর যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, উহাই শাস্ত্রকারগণ পাপকার্য্যরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই নিষেধবিধানের অন্তর্গত বা নিষিদ্ধ। পাপ পুণ্য এবং

বিধিনিষেধ এই প্রাণায়াম-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা হউক, সে অন্য কথা। আমাদের পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত আহাররূপ কার্য্যেও এইরূপ স্বাভাবিক প্রাণায়াম বা শ্বাসপ্রশ্বাসের গতির তারতম্য নিত্যসিদ্ধ। অনন্তর প্রত্যাহার। ইন্দ্রিয়-বৃত্তিসমূহকে অন্যান্য বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া অভীষ্ট কার্য্যে বিনিয়োগ করার নাম প্রত্যাহার। আহারকার্য্য সম্পন্ন করিতেও কথঞ্চিৎ প্রত্যাহার একান্ত আবশ্যক। তারপর ধারণা। চিত্তকে আহার এবং তজ্জন্য তৃপ্তি ও ক্ষুন্নিবৃত্তির দিকে ধারণা করিয়া রাখিতে হয়। তাই, ক্ষুধা-নিবৃত্তি বা তৃপ্তি হইলেই আহারের পরিসমাপ্তি হয়। এইরূপ আহার-বিষয়ক একটু ধ্যান বা চিন্তা এবং তজ্জন্য অতি অল্পক্ষণস্থায়ী সমাধি হয়—ক্ষণকালের জন্য মন আজ্ঞাচক্র স্পর্শ করিয়া আসে এবং তাহারই ফলে আহারকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্বত্র। আমাদের সমস্ত কর্ম্মের ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে এই অষ্টাঙ্গযোগ সাধিত হইতেছে। জাগতিক কার্য্যগুলিতে আমরা এতই অভ্যস্ত যে, প্রত্যেক কার্য্যের অনুষ্ঠানে যে এতগুলি কাণ্ড করিতেছি, তাহা লক্ষ্যই করিতে পারি না, অথচ এই আটটি ব্যাপার একটির পর একটি নিষ্পন্ন হইতেছে। উৎপলশতপত্রভেদ ন্যায়ে (১) ইহা আমাদিগের নিকট এক প্রযত্নে যুগপৎ নিষ্পন্ন বলিয়া প্রতীত হয়।

সমাধি ব্যতীত কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হইতে পারে না ; মন যখন বুদ্ধিতে বা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিতে সমাহিত বা সম্যক্‌ভাবে সংস্থাপিত হয়, তখনই সমাধি হয়। তোমার পদে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইল। ইন্দ্রিয়গণ ঐ কণ্টকবেধরূপ ব্যাপারটি মনের নিকট উপস্থিত করিল। মন কিন্তু বলিতে পারে না, ইহা কি ; তাই সে আবার উহাকে বুদ্ধির নিকট উপস্থিত করে, এই যে উপস্থিত করা—ইহারই নাম সমাধি। এই সময়ে মন আজ্ঞাচক্রে বুদ্ধির সহিত মিলিত হয়, তখন বুদ্ধি

(১) একশতটি পদ্মফুলের পাপড়ি একটি সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিলে, মনে হয় একেবারে সমস্ত দলগুলির ভেদ হইয়া গেল। বাস্তবিক কিন্তু একটির পর একটি বিদ্ধ হয়।

বলিয়া দেয়—উহার নাম "কণ্টকবেধ, উহাতে একটি যাতনা হইতেছে।" অমনি মন "উহুঃ বড় যন্ত্রণা" বলিয়া কণ্টকবেধের যাতনা উপলব্ধি করে। এইরূপ সর্ব্বত্র। এই মন বুদ্ধির মিলনরূপ সমাধি, জাগতিক সর্ব্বকার্য্যের মূল। এরূপ সমাধি জীবের অহর্নিশ সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং তদঙ্গীভূত যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগও স্বভাবতঃ নিষ্পন্ন হইতেছে ; কিন্তু এরূপ সমাধি সমাধি নহে ; কারণ ইহা মনের সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত সমাধি—প্রজ্ঞার সহিত মনের মিলন। "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এইটী ঋগ্‌বেদীয় মহাবাক্য—প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম। মন যখন প্রজ্ঞানাকারে আকারিত হয় অথবা প্রজ্ঞায় বিলীন হইয়া যায়, তখনই যথার্থ সমাধি হয়। ইহা প্রথমতঃ জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটিযুক্ত হইয়া সবিকল্পভাবে আবির্ভূত হয়। পরে মাতৃ-কৃপায় অভ্যাসবলে নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ উক্ত ত্রিপুটিশূন্য কেবল বিশুদ্ধ-বোধরূপে প্রকাশিত হয়। ইহারই নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

সমাধিই মাতৃ-মিলনের দ্বার। অখণ্ড চিৎসমুদ্রের সহিত কল্পিত জীবভাবাপন্ন পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের মিলন সংঘটিত হইবার প্রণালী—এই সমাধি। প্রতিনিয়ত জীবচৈতন্যে ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাব সংঘটিত হইলেও, যতদিন ইহা প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদিন জীব জন্ম মৃত্যু দুঃখ কষ্ট শোক তাপের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় না। মা-ই আমার সমাধিরূপে আবির্ভূত হইয়া, স্নেহের সন্তান জীবকে আত্মসমুদ্রে মিলিত বা আত্মহারা করাইয়া লয়েন। মনুষ্যজীবনের উহাই চরম এবং পরম চরিতার্থতা।

প্রথম প্রথম এই সমাধি মলিন ভাবাপন্ন থাকে, তাই, মন্ত্রে সশোক এবং দুর্ম্মনা এই দুইটি বিশেষণ-পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, সুরথ এতদিন সমাধির সন্ধান পায় নাই, এইবার বহু সৌভাগ্যের ফলে মাতৃ-কৃপায় উহার দর্শন-লাভ ঘটিয়াছে। তবে মলিন ভাবাপন্ন, তা হউক। মলিনতা কাটিয়া যাইবে, শোক দূর হইবে, দুর্ম্মনা সুমনা হইবে। সে সকল কথা পরে জানিতে পারিব। এখন দেখা যাউক—সমাধি প্রথম সাক্ষাৎকারে 'সশোক' এবং 'দুর্ম্মনা' কেন ? মন্ত্রে উক্ত

হইয়াছে—"পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ"। ধনলোলুপ অসাধুবৃত্তি পুত্র-ভার্য্যাকর্ত্তৃক বিতাড়িত; তাই এই মলিন ভাব—সশোক এবং দুর্ম্মনা। সমাধির পুত্র—ধ্যান এবং ভার্য্যা ধারণা। কথাটা একটু বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয়—যম নিয়মাদি অঙ্গগুলির পর পরটি পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার পরিপক্কতা-অনুসারে আবির্ভূত হয়। অর্থাৎ 'যম'-অনুষ্ঠানে সিদ্ধ হইলেই নিয়ম উপস্থিত হয়। নিয়মে সিদ্ধ হইলে আসন অনুষ্ঠানের সময় হয়। এইরূপ ক্রমে ধারণায় অভ্যস্ত হইলেই ধ্যান হয় এবং ধ্যান গভীর হইলেই সমাধি উপস্থিত হয়। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নহে; আমরা দেখিতে পাই—সমাধি আসিবার সময় হইলে অন্যান্য যোগাঙ্গগুলি যেন আপনা হইতেই সম্পন্ন হইতে থাকে। সমাধি নিত্যসিদ্ধ বস্তু, উহা জন্য পদার্থ নহে। ধ্যান হইতে সমাধি আসে না, সমাধি আসিলেই ধ্যান সিদ্ধ হয়; সূর্য্যের উদয় হয়, তাই অন্ধকার পলায়ন করে।

যে অনুলোমক্রমে সৃষ্টি, প্রলয়ও ঠিক সেইরূপ ভাবেই নিষ্পন্ন হয়। প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ-মহাভূত; এইরূপে অনুলোমক্রমে সৃষ্টি হয়। মুক্তি বা প্রলয়ের সময়ও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ঠিক অনুলোমক্রমেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি যখন মনে করেন যে, আমি আর পরিণাম দর্শন করিব না, তখন উপরের দিক হইতেই টান পড়ে; অর্থাৎ প্রকৃতি মহত্তত্ত্বকে বিলীন করিতে প্রয়াস পায়, মহৎ অহঙ্কারকে আকর্ষণ করে, অহঙ্কার পঞ্চতন্মাত্রকে, পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চমহাভূতকে, এইরূপে আকর্ষণ ঠিক অনুলোম গতিতেই হয়; কিন্তু বাহিরে বিলোম গতি প্রকাশ পায়। মনে হয়, নীচের দিক্ হইতে প্রলয় আরম্ভ হইয়াছে অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রায় প্রবেশ করে, পঞ্চতন্মাত্রা অহঙ্কারে প্রবেশ করে, অহঙ্কার মহতে এবং মহৎ প্রকৃতিতে পর্য্যবসিত হয়, এইরূপে প্রকৃতি পুরুষে বিলীন হয় বা পুরুষের সম্মুখ হইতে সরিয়া যায়। এই যে বিলোমগতি প্রত্যক্ষ হয়, ইহা অন্তর্নিহিত

অনুলোম গতিরই বহির্বিকাশ বা ফলমাত্র। যেমন জোয়ারের সময় দেখা যায়—সমুদ্রের জলরাশি নদী শাখানদী খাল প্রভৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগের কলেবর পুষ্ট করে, আবার ভাঁটার সময়ে সমুদ্রের আকর্ষণেই নদী নালার জল সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রে সমুদ্রে ভাঁটার টান পড়ে; তাই নদী নালার জল সমুদ্রাভিমুখী হয়। সমাধি প্রভৃতি যোগাঙ্গগুলিও ঠিক এইরূপ। অনুলোম গতিই জগতের সর্ব্বত্র। সমাধি হইতেই ধ্যান, ধ্যান হইতেই ধারণা এবং ধারণা হইতেই প্রত্যাহার। এইরূপ অন্যান্য যোগাঙ্গগুলিও বুঝিবে। যদিও যোগশাস্ত্রে ঠিক এরূপ ক্রমের উল্লেখ নাই, যদিও সাধকগণ নীচের দিক্ হইতেই উপরের দিকে যাইতে চেষ্টা করেন, তথাপি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণ একটু ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবেন—সমাধি বলিয়া একটা নিত্যসিদ্ধ বস্তু বা অবস্থা আছে; তাহা সর্ব্বকালে সমভাবে অবস্থিত। সে ধ্যান ধারণা হইতে জন্মগ্রহণ করে না। বরং ধ্যান ধারণা প্রভৃতিই সর্ব্বতোভাবে সমাধিরই অনুগত। সমাধি যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনিই যম নিয়ম আসন প্রভৃতি আকারে প্রকাশিত হইতে থাকেন। সাধারণ জীব এই রহস্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, নীচের দিক্ হইতে সাধনার গতি ঊর্দ্ধমুখে ফিরাইতে আরম্ভ করেন এবং বহু আয়াসেও যথার্থ আত্মস্বরূপ অবগত হইতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন।

সাধক! মনে কর, তোমাকে প্রথম যমের সাধন করিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা সত্য অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ, এইগুলির নাম যম। ইহার এক একটি সাধনায় সিদ্ধ হইতেই বহুবর্ষ অতীত হইয়া যায়। এইরূপ প্রত্যেক যোগাঙ্গ ও তাহার প্রত্যঙ্গগুলিতে সিদ্ধিলাভ করিয়া সমাধিতে উপনীত হইয়া, পরমাত্মসাক্ষাৎকার করিতে যত দৃঢ়তা এবং সহিষ্ণুতার আবশ্যক, বর্ত্তমান যুগে তাহা নিতান্ত দুর্লভ। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে জীবের চলচ্ছক্তি ছিল, তখন পথ দেখাইয়া দিলে অগ্রসর হইতে পারিত। আর এ যুগের জীব যেন সম্পূর্ণরূপে গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখন কি আর পথ দেখাইয়া নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিলে

চলে? এখন আমরা মাতৃ-অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন; সুতরাং সম্পূর্ণরূপে চলচ্ছক্তিহীন। এখন কি আর ঐ সকল যোগাঙ্গ-অনুষ্ঠানের সময় ও সহিষ্ণুতা আছে? এযুগে মা নিজে আসিয়া সন্তানকে কোলে করিয়া লইয়া যাইবেন। কাল যতই কঠোর হয়, অন্ধকার যত ঘনীভূত হইতে থাকে, পুত্রবৎসলা মা আমার ততই করুণার সিন্ধু উদ্বেলিত করিতে থাকেন; দয়ায় জগৎ ভাসাইয়া দিতে থাকেন। ইহাই মায়ের আমার মাতৃত্ব। শুধু মাতৃ-অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হও। "এই মা তুমি আমার রহিয়াছ"—এইটা ঠিক ঠিক মনে প্রাণে ধারণা কর। এক কথায় মাকে মান। মা যে সত্যই রহিয়াছেন এবং তোমার মঙ্গলসাধনে নিয়ত উৎকণ্ঠিত রহিয়াছেন, এই কথাটা জোর করিয়া বুকের মধ্যে বসাইয়া দাও। দেখিবে—তোমার সমাধি স্বয়ং উপাগত হইবে। তোমার অষ্টাঙ্গযোগ (তোমার অজ্ঞাতসারে) স্বয়ং সিদ্ধ হইবে। শুধু কাতরপ্রাণে—"মা! তুমি ত' সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে বিরাজিত, তবে কেন আমি বিশ্বাস করিতে পারি না? আমার এই অক্ষমতার মূলেও ত তুমি, তবে কেন আমায় অবিশ্বাসের অন্ধকারে ডুবাইয়া মারিবে? আয় মা! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দে, একবারমাত্র তোর ত্রিজগৎপ্লাবী স্নেহরস আস্বাদনের সুযোগ করিয়া দে, আমি মা বলিয়া ধন্য হই। এই ত্রিতাপ-বিশুষ্ক প্রাণ সরস হউক!" এমনই করিয়া কাঁদিতে থাক, বিশ্বাস হইল না বলিয়া দুঃখিত হও, মাকে জানাও, বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন দেখিবে—সমাধির সন্ধান করিতে হয় না, আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। সুরথ ত' সমাধির সন্ধান করে নাই! তথাপি একমাত্র অশ্বারোহণে বনগমন বা বুদ্ধিযোগের ফলে সমাধির সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিয়াছিল।

যাহা হউক, ধ্যানধারণারূপ সমাধির পুত্র ও ভার্য্যা—ধনলোলুপ; সুতরাং অসাধুবৃত্তি। ধন শব্দের অর্থ রূপ-রসাদি বিষয়গত ঐশ্বর্য্য বা বিষয়ত্ব। ঈশোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্‌ধনম্" বিষয়গত ধন গ্রহণ করিও না অর্থাৎ বিষয়ত্বে মুগ্ধ হইও না। ধারণা ধ্যান প্রভৃতি যোগাঙ্গগুলি নিয়ত বিষয়াভিমুখী। সমাধি সর্ব্বদাই

অখণ্ড জ্ঞানে—প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়; কিন্তু ধারণা ধ্যানাদি বিষয়াভিমুখী আকর্ষণ অর্থাৎ ধনের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি—আমাদের প্রত্যেক কার্য্যেই সমাধি বা অষ্টাঙ্গ-যোগ নিষ্পন্ন হয়। সুরথ যে সমাধির সাক্ষাৎ পাইয়াছে, তাহা ঐ নিত্যসিদ্ধ অহর্নিশ আবির্ভূয়মান সমাধি; সুতরাং ধনলোলুপ অসাধু-বৃত্তি পুত্রভার্য্যা কর্ত্তৃক বিতাড়িত। মানুষ দিবারাত্র বিষয়ের ধ্যান করে, বিষয়ের ধারণায়ই অভ্যস্ত, বিষয় আহরণের জন্যই ইন্দ্রিয় প্রত্যাহরণ করে; যাহা কিছু সাধনা ঐ রূপরসাদি বিষয়গত ধনের লোভেই অনুষ্ঠিত হয়, সুতরাং উহারা অসাধু; কিন্তু সমাধি স্বভাবতঃ অতি নির্ম্মল। সে সর্ব্বদা প্রজ্ঞার সহিত মিলিত হইতে পারিলেই সুখী। যতদিন সমাধির এই স্বাভাবিক উচ্চভাব না আসে, ততদিন সে স্ত্রীপুত্রাদির পরিতৃপ্তির জন্যই লালায়িত থাকে। যোগাঙ্গসমূহ যে রূপরসাদি বিষয় আনিয়া উপস্থিত করে, সমাধি তাহাই প্রকাশ করিয়া দেয়। সমাধি না থাকিলে বিষয়ই প্রকাশিত হয় না। যাহা হউক, বহুদিন এইরূপ পরিজনবর্গের পরিপোষণ করিয়াও যখন সমাধির অতৃপ্তি বিদূরিত হয় না, তখন সে বিষয় হইতে বিমুখ হইয়া, একাকী প্রজ্ঞার সহিত মিলিত হইতে চায়; কিন্তু ধ্যান ধারণাদির পূর্ব্ববৎ ধনলোলুপতা দূরীভূত না হওয়াতে, তাহারা সমাধিকে নির্জ্জিত করিতে থাকে। তাহারা চায়—আমাদের প্রভু সমাধি আমাদের অনুগত হইয়া থাকুক; কিন্তু সমাধি চায়—ধ্যান ধারণা আমার অনুকূল হইয়া ভূমা সুখের অনুগামী হউক। এই পরস্পর বিরুদ্ধভাব নিবন্ধন, ধ্যান ধারণাদি কর্ত্তৃক সমাধিকে নির্জ্জিত হইতে হয়। যদিও উহারা সমাধিরই অঙ্গমাত্র, তথাপি এখন সকলেই যেন স্বাধীন ও বলবান্ হইয়া উঠিয়াছে। বহুদিন অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবভাবের মধ্যে অবস্থান করিয়া, প্রত্যেকেই এক একটি অহং হইয়া উঠিয়াছে। এখন প্রত্যেকেই স্বাধীন হইতে চায়, তাই সমাধিকে বিতাড়িত করে। সেই জন্যই সমাধির সশোক এবং দুর্ম্মনা ভাব পরিলক্ষিত হয়। আসল কথাটা এই যে, বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া যখন একটু

একটু তন্ময়তা আসিতে থাকে, তখনও বিষয়-সংস্কার দূরীভূত হয় না। তাই, সমাধি নির্ম্মল ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়। ব্যষ্টিতে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, সমষ্টিতেও তাহাই হয়। মা আমার প্রত্যেক জীবহৃদয়ে যেরূপ ভাবে আবির্ভূত হইয়া জীবকে মুক্তিমন্দিরে আকর্ষণ করেন, যাহা সাধক-হৃদয়ে গোপনে সংঘটিত হয়, তাহা প্রকাশ্যভাবে অভিনয় করিয়া দেখাইবার জন্যই মা আমার ধরাধামে বিশিষ্টভাবে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইরূপ সুরথ-সমাধিরূপে প্রকটিত হইয়া কিংবা অসংখ্য অসুরকুল নির্ম্মূল করিয়া জীব-জগৎকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রারম্ভেই বলিয়াছি, চণ্ডীর উপাখ্যানভাগ রূপকমাত্র নহে। সুরথ সমাধির যে কোন ঐতিহাসিকতা নাই, তাহা নহে। আর্যগ্রন্থে মিথ্যা কল্পনার স্থান নাই। প্রাচীন কাল হইতে অসংখ্য রাজন্য কর্তৃক এই ধরা প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের কিছু না কিছু ইতিহাস আছে। ঋষিগণ সকলের ইতিহাস সঙ্কলন করেন নাই। যে চরিত্রটি চিত্রিত করিলে, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক রহস্য সন্নিবেশ করা যায়, মাত্র সেইরূপ চরিত্রই বর্ণনা করিয়াছেন। যাহার নাম এবং কর্ম্ম বর্ণনা করিতে গেলে, একদিকে যেমন ইতিহাস ও লোকশিক্ষা হইতে পারে, তেমনি অন্যদিকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বরাশিরও বিন্যাস করা যাইতে পারে, এরূপ লোকের চরিত্র অঙ্কন করাই ঋষিদের উদ্দেশ্য ছিল। তাই আর্যগ্রন্থমাত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় ঐতিহাসিক সত্যের পার্শ্বেই আধ্যাত্মিক রহস্য সুবিন্যস্ত।

বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্ ।
বনমভ্যাগতো দুঃখী নিরস্তশ্চাপ্ত-বন্ধুভিঃ ॥১৭॥

অনুবাদ—দারা-পুত্রগণ আমার ধন গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে ধনহীন করিয়াছে। বিশ্বস্ত বন্ধুগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, আমি বড় দুঃখে অরণ্যে উপস্থিত হইয়াছি।

ব্যাখ্যা। আনন্দই সমাধির ধন। পুত্র ভার্য্যা এবং অন্যান্য বন্ধুগণ অর্থাৎ ধ্যান ধারণা ও অন্যান্য যোগাঙ্গ সেই ধন গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিনিয়ত প্রতিকর্ম্মে জীবগণ যে অষ্টাঙ্গযোগের অনুষ্ঠান করে, উহা বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগ-জন্য পরিচ্ছিন্ন আনন্দের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ পরিচ্ছিন্ন আনন্দ সমাধিলভ্য আনন্দসিন্ধুর বিন্দুমাত্র। ব্রহ্ম অবধি পিপীলিকা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই আনন্দের অন্বেষী। এই যে ছুটাছুটি জগৎময় দেখিতে পাও, এই যে শুধু কামনা ও কাঞ্চনের পূরণের আশায় জীববৃন্দ উন্মত্তের মত, অন্ধের মত দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিতেছে, উহার একমাত্র উদ্দেশ্য একটু আনন্দ। ধার্ম্মিক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আনন্দ পায়, পাপী নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া আনন্দ পায়। আনন্দাংশে উভয়ই তুল্য ; কারণ, "আনন্দং ব্রহ্ম" আনন্দই ব্রহ্ম—আনন্দই মা। সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের সৎ-স্বরূপটী বিশিষ্টভাবে জড়পদার্থে প্রতিভাত। মা যে সৎস্বরূপা, অর্থাৎ মা যে আছেন, তাহা আমাদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য, এই পরিদৃশ্যমান জড়-পদার্থরূপে তিনি সতত প্রকটিতা। মা যে আমার চিন্ময়ী, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য তিনি প্রাণীরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। প্রাণীতেই আমরা চৈতন্যসত্তার বিশিষ্ট বিকাশ দেখিতে পাই। আর আনন্দ-ধর্ম্মটি বিশেষভাবে কেবল তাঁহাতেই বিদ্যমান। আনন্দ আর কোথাও নাই। একমাত্র মা আমার আনন্দ-ঘন-মূর্ত্তিতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সুপ্রতিভাত। প্রতিজীবে যে বিষয়-ভোগজনিত আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা সেই আনন্দ-সমুদ্রেরই এক একটি বিশিষ্ট বুদ্‌বুদ্‌মাত্র। এই আনন্দ জীব কিরূপে ভোগ করে ঃ—

আমরা যখন কোন অভীষ্ট বস্তু-সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করি, তখন আমাদের ইন্দ্রিয় ও মন তদুদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়; বুদ্ধিও তখন আনন্দ-সমুদ্র হইতে যেন বিচ্যুত হইয়া বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে। তার পর যখন চেষ্টা সফল হয় অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তু লাভ হয়, তখন ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ক্ষণকালের জন্য স্থির হয়। তখনই আনন্দের প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়; তাই, আনন্দলাভ হয়। কিন্তু আমরা মনে করি, অভীষ্ট বস্তুই আনন্দ প্রদান করে। ইহাই অজ্ঞান। বিষয়ে আনন্দ নাই—আনন্দ আমারই বুদ্ধিতে নিয়ত প্রতিবিম্বিত। যখন বুদ্ধি সে প্রতি-বিম্বের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, তখনই আমরা আনন্দচ্যুত হইয়া পড়ি; আবার বুদ্ধির স্থৈর্য্যে সে আনন্দ উপলব্ধিযোগ্য হয়। এখানে একটি আশঙ্কা হইতে পারে—আনন্দ যদি এক এবং অখণ্ডস্বরূপই হয়, তবে আমরা বিভিন্ন বিষয়লাভে বিভিন্নরূপ আনন্দ ভোগ করি কিরূপে? কাঞ্চনলাভে যেরূপ আনন্দের অনুভূতি হয়, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতায় তদপেক্ষা ভিন্নপ্রকার আনন্দের উপলব্ধি হয় কেন? একটি ফুল দেখিয়া যেরূপ আনন্দ হয়, একটি সঙ্গীত শুনিয়া সেরূপ আনন্দ হয় না কেন? তাহার উত্তর এই যে, আনন্দ-বস্তু এক এবং অখণ্ড হইলেও, বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ-বৈচিত্র্যবশতঃ উহা আমাদের নিকট বিভিন্নভাবে উপলব্ধ হইয়া থাকে। আমাদের যে ইন্দ্রিয় যখন বিশেষ ভাবে পরিতৃপ্তি লাভ করে, সেই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিগত বিভিন্নতাই আনন্দগত বিভিন্নতা-প্রতীতির হেতু।

আনন্দের অভাব কোথাও নাই। এ জগৎ আনন্দে ভরা। "আনন্দ হইতেই জীবগণ প্রাদুর্ভূত, আনন্দে সঞ্জীবিত এবং আনন্দেই জীবের অবসান" এই মোহন-বাণী ঋষিগণ ভূয়োভূয়ঃ পরিব্যক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগেও যাঁহারা ইহার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারাও ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। শোকার্ত্তের করুণ ক্রন্দন, রোগার্ত্তের হতাশব্যঞ্জক দীর্ঘ নিশ্বাস, ক্ষুধার্ত্তের কাতর চীৎকার, এ সকলই আনন্দের অভিব্যঞ্জক। মানুষ ঐরূপ কাঁদিয়া,

ঐরূপ হাহাকার করিয়া, আনন্দের সন্ধান পায় ; তাই, ঐরূপ করে। তিক্ত ঔষধ সেবনকালে মৌখিক অনিচ্ছা কিংবা মুখবিকৃতি প্রভৃতি বিরক্তিভাব প্রকাশ পাইলেও রোগী উহার অন্তর্নিহিত রোগ-নিবারণ-শক্তিরূপ আনন্দরসের সন্ধান পায় বলিয়াই, সেই বিস্বাদ ঔষধ সেবন করিতে বাধ্য হয়। বিষদুষ্ট অবয়বে অস্ত্রোপচারজনিত যাতনার অভ্যন্তরে একটা অব্যক্ত আনন্দের সন্ধান থাকে। রামবনবাস, সীতাহরণ, অভিমন্যুবধ প্রভৃতি করুণরসোদ্দীপক প্রকৃষ্ট অভিনয় দর্শনে সহৃদয় দর্শক অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। ঐ রোদনের মধ্যে আনন্দের আস্বাদ আছে। করুণও একটা রস। "রসো বৈ সঃ" রসস্বরূপ একমাত্র মা। সেই রস বা আনন্দ-প্রবাহ যখন করুণ-আকারে বাহিরে প্রকটিত হয়, তখনই আমরা উহার নাম দেই দুঃখ। এইরূপ একমাত্র রসস্বরূপা মা আমার প্রতিনিয়ত শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, রৌদ্র, বীভৎস প্রভৃতি বহু ভাবে প্রকটিত হইয়া, বহুত্ব-প্রিয় জীবরূপী সন্তানগণকে আনন্দ-রস পান করাইয়া থাকেন। পতিব্রতা সতী যখন মৃতপতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করে, তখন সেই প্রাণান্তকর অসহ্য বহ্নিদাহের মধ্যেও একটা অব্যক্ত আনন্দের সন্ধান পায়। এইরূপ জগতের সর্ব্বত্র। যে ব্যক্তি এই অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় অন্তর্নিহিত আনন্দরসপ্রবাহের সন্ধান পায়, সে জগতের যাবতীয় দুঃখ শোক সন্তাপ যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান করিয়াও, নিত্য নিত্যানন্দ-সম্ভোগে কৃতার্থ হয়। হায় জীব ! কবে তুমি সে আনন্দের ধারা পান করিয়া, অমর শান্তিলাভ করিবে ? সে যাহা হউক, সমাধি এই অখণ্ড আনন্দসমুদ্রের অন্বেষী ; কিন্তু ধ্যান ধারণাদি বিষয়ানন্দে মগ্ন। আনন্দময়ী মা আমার আত্মস্বরূপ লুক্কায়িত রাখিয়া, লীলার ছলে যে বিষয়ের ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া বিন্দু বিন্দু আনন্দ দান করিতেছেন, যোগাঙ্গসমূহ তাহারই প্রয়াসী ; তাই সমাধির সহিত পরস্পর বিরোধিতা। সেই যে বিষয়সংস্পর্শজনিত আনন্দ-কণা, তাহাও সমাধি হইতে লভ্য। অন্যান্য যোগাঙ্গ ত' সে আনন্দের নিকটে যাইতে পারে না ; তাই, মন আজ্ঞাচক্রে সংস্থিত হইয়া সেই আনন্দের

আস্বাদ গ্রহণ করিলে, অমনি তাহার পরিজনগণ উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রহণ করে। তাই, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"আদায় মে ধনম্"। মনে কর—ধ্যান; সে কোন বিশিষ্ট-পদার্থেই পর্য্যবসিত। যাহারা কেবল বিষয়ের ধ্যান করে, তাহারা ত' আনন্দকে খণ্ড খণ্ড করেই, তদ্‌ভিন্ন যাঁহারা কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তি কিংবা জ্যোতি অথবা কোনও বিশিষ্ট ভাবের ধ্যান করেন, তাঁহারাও সমাধিলভ্য অখণ্ড আনন্দকে খণ্ডিত করিয়া ফেলেন। এইরূপে ধারণা, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রত্যেক যোগাঙ্গই পরিচ্ছিন্নে মুগ্ধ। যোগাঙ্গসমূহের এই পরিচ্ছিন্ন-মুগ্ধতা নিয়ত অনুষ্ঠিত প্রতিকর্ম্মে, অথবা যোগশাস্ত্রোক্ত উপায় দ্বারা ভগবৎ-সাধনায়, উভয়ত্রই প্রায় তুল্য। যদিও আত্মজ্ঞান-লাভ উদ্দেশ্যে ক্রিয়মাণ শাস্ত্রীয় যোগাঙ্গগুলি জীবকে আত্মজ্ঞান লাভের উপযোগী করিয়া তোলে, তথাপি যতদিন যম নিয়মাদির সাহায্যে আত্মাকে জানিতে যায়—মাত্র যোগাঙ্গের সাহায্যে অখণ্ড আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে, তত দিন বুঝিতে হইবে—সে প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পায় নাই। ওরে, সে যে সর্ব্বত্র সুপ্রকট। ইচ্ছামাত্রেই তাহাকে দেখা যায়—সে আনন্দ উপলব্ধি করা যায়। যে মুহূর্ত্তে তাঁহার দর্শন হয়—সেই মুহূর্ত্তেই ত' সমাধি সিদ্ধ হয়। সমাধি-সিদ্ধি হইলে, অন্যান্য যোগাঙ্গগুলি যে আপনা হইতেই সম্পন্ন হইয়া যায়! যতক্ষণ দেখিব—তুমি মাকে দেখিবার জন্য যম নিয়মের অনুষ্ঠান করিতেছ, যতক্ষণ দেখিব—তুমি মাকে দেখিবার জন্য পদ্মাসন করিয়া বিশিষ্ট ভাবে বসিবার উপক্রম করিতেছ, যতক্ষণ দেখিব—তুমি ইন্দ্রিয়-গুলিকে প্রত্যাহৃত করিয়া, মাতৃমুখী করিতে প্রয়াস পাইতেছ, ততক্ষণ বুঝিব—তুমি শুধু কোমরে কাপড় বাঁধিতেছ। আরে, ধ্যান করিয়া মাকে পায় না, মা আসিলে ধ্যান আপনি হয়। জাগতিক প্রতি কর্ম্মে যেরূপ আমরা বিশিষ্টভাবে ধ্যান ধারণা করি না, যম নিয়ম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করি না, তথাপি সেই যোগাঙ্গগুলি আপনা হইতেই সিদ্ধ হইয়া যায়, (আহারের দৃষ্টান্ত স্মরণ কর।) সেইরূপ মাতৃ-লাভের বেলাও শুধু "এই আমি মাকে দেখিতেছি" বলিয়া দৃষ্টি মায়ের

দিকে ফিরাও, দেখিবে তোমার সর্ব্ববিধ যোগাঙ্গ আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া যাইতেছে।

শোন—আহার বিহারাদি দৈনন্দিন কর্ম্মগুলি যেরূপ আমাদের স্বভাবিক, মনে হয়—কোন চেষ্টা ব্যতীত আপনা হইতেই নিষ্পন্ন হইতেছে, মাতৃ-লাভও ঠিক তেমনি স্বাভাবিক। মা যে আমাদের সহজ বস্তু। আমরা দেখি না, তাই, মা যেন কোন দুরধিগম্য দেশে রহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ওরে, এ ত আর পাতান মা নয় যে চেষ্টা করিয়া তাঁহার স্নেহ আকর্ষণ করিতে হইবে। এ যে সত্য মা আমার! সে যে স্বকীয় স্নেহের প্রবল আকর্ষণেই আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। আমরা মা বলিয়া ডাকি না, আমরা তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, আমরা মায়ের বক্ষে বসিয়া বলি—কই মা কোথায়? তাই, মা আমার দুঃখে ম্রিয়মাণা। বড় আদরের, বড় স্নেহের পুত্র যদি মাকে প্রতিনিয়ত অবজ্ঞা করে, তবে মা কি কাঙ্গালিনী না সাজিয়া থাকিতে পারেন! তাই, প্রতিনিয়ত আমাদের নিকট অবজ্ঞাত হইয়া রাজ-রাজেশ্বরী—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও জননী মা আমার জীবত্বের মলিন ছিন্ন বসন পরিধান করিয়া, কল্পিত অভাবের দারুণ হাহাকারে দিগন্ত মুখরিত করিয়া, আমাদিগকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। হউক কাঙ্গালিনী, তুমি তাহারই দিকে একবার সত্যদৃষ্টিতে তাকাও, 'এই যে মা তুমি রহিয়াছ' বলিয়া সত্য সত্যই মাকে দেখিতে অভ্যস্ত হও। সমাধির জন্য চিন্তা করিতে হইবে না, উহা আপনি আসিবে। তুমি নিয়ত আনন্দে পরিপ্লুত থাকিবে।

সমাধি চায়—সেইরূপ স্বাভাবিক আনন্দ, স্বাভাবিক মাতৃ-মিলন। যাহাতে সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে মাতৃযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে, সর্ব্বদা অখণ্ড আনন্দের আস্বাদনে মুগ্ধ থাকিতে পারে, তাহাই সমাধির আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু পরিজনবর্গ তাহার সে বাসনা-সিদ্ধির বিরোধী, তাহারা সমাধিকে পরিচ্ছিন্নে মুগ্ধ রাখিতে চায়; তাই, সে পুত্র ভার্য্যাদি কর্ত্তৃক বিতাড়িত।

সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্।
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥২০॥

অনুবাদ। সেই পরমাত্মাই আমি; কিন্তু এই মেধসাশ্রমে অবস্থান করিয়া, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি স্বজনবর্গের মঙ্গলামঙ্গল-প্রবৃত্তি কিছুই জানিতে পারিতেছি না।

ব্যাখ্যা। সাধকমাত্রেরই এইরূপ একটা অবস্থা আসে। জীব যখন প্রথম সমাধির সাক্ষাৎ পায়, তখন সমাধি আত্ম-পরিচয় প্রদানকালে আপনাকে "সোঽহং" বলিয়াই পরিজ্ঞাপিত করে। "সোঽহং" জ্ঞানের নামই সমাধি 'সেই পরমাত্মাই আমি' এইরূপ প্রজ্ঞার নাম সমাধি। পুস্তক পড়িয়া বা উপদেশ শুনিয়া "সোঽহং" বোধের বিকাশ হয় না। মা যে আমার স্নেহে আত্মহারা হইয়া, আমি হইয়া গিয়াছেন, অনন্ত মহিমাময়ী কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী মা-ই যে আমিরূপে বিরাজ করিতেছেন, যে মুহূর্ত্তে উহার উপলব্ধি হয়, সেই মুহূর্ত্তেই সমাধি। তখন কি অবস্থা হয়, তাহা ভাষায় কি প্রকারে প্রকাশ করিব! সে যে মূকাস্বাদনবৎ স্বসংবেদ্যমাত্র; তথাপি কৌতুহল-নিবৃত্তির জন্য মাতৃ-চরণ স্মরণ পূর্ব্বক যতটুকু পারি, বলিতে চেষ্টা করি। তখন কি হয়—চক্ষু আর জগতের রূপ দেখে না, মায়ের রূপহীন রূপসাগরে নিমজ্জিত হয়। কর্ণ জগতের শব্দ শুনিতে পায় না, শব্দহীন মাতৃ-আহ্বান শুনিয়া মুগ্ধ হয়। রসনা সে অখণ্ড রসের আস্বাদনে জড় হইয়া যায়। নাসিকা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের অবসর পায় না, মাতৃ-অঙ্গের স্বর্গীয় সৌরভে স্তব্ধ হইয়া যায়। ত্বক্‌মাতৃ-আলিঙ্গনের মধুর স্নেহময় স্পর্শে যে কি হইয়া যায়, তাহা বলিতে পারি না। শরীরের প্রত্যেক পরমাণু কি যে আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত হয় তাহা অবর্ণনীয়। কল্পনায় মহাকবি ভবভূতির ভাষায় বলিতে পারি "নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ।" চাঁদ নিংড়াইয়া যদি কেহ সেই সুধাকরের সুধাময় স্নেহ-স্নিগ্ধ নিস্যন্দনে অন্তর বাহিরে প্রলেপ দেয়, তবু বুঝি এ সুখময় স্পর্শের তুলনা

হয় না। আরও হয়—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, নয়নদ্বয় মৃতব্যক্তির নয়নদ্বয়ের ন্যায় জ্যোতিহীন হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল বা কাষ্ঠবৎ হইয়া পড়ে। জগতের বিভিন্ন নাম রূপ আর থাকে না। এক কথায় দেহবোধ কিংবা জগদ্‌বোধ একেবারে বিলুপ্ত হয়। থাকে শুধু অনন্ত আনন্দময় চিৎসমুদ্র। প্রথম প্রথম "ঐ যে তিনি আমার পরমাত্মা, উনিই ত' আমি" এইরূপ বোধপ্রবাহ চলিতে থাকে। উহাই "সোঽহং" ভাবের সমাধি। এইরূপ সমাধিতে কিছু দিন অভ্যস্ত হইলে, আর সে, আমি, তুমি কিছুই থাকে না। তখন কি থাকে, তাহা বলা যায় না, ভাবা যায় না, তবে যাহা থাকে, তাহাই যে মহতী সত্তা, মহান্ চৈতন্য এবং অসীম আনন্দ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। না—তাহাকে মহান্‌ও বলা যায় না, অণুও বলা যায় না; কারণ, তখন পরিমাণ বলিয়া কোন বোধ ত' আর ফোটে না! কিরূপে বলিব অণু কি মহান্! তবে একটা বিশেষত্ব আছে—যাহা বলিব, তাহাই সেখানে দেখিতে পাইব। যদি বলি—(মনে করি) অণু, তৎক্ষণাৎ অণু। যদি মনে করি—মহান্, অমনি মহান্‌স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। এমন কোন সঙ্কল্প নাই যে, সেখানে অপূর্ণ থাকিতে পারে. তবে সমস্যার কথা এই যে, সেখানে গিয়া সঙ্কল্প ফোটান বড় কঠিন; কারণ, সঙ্কল্প যে করে, সে মনটিকে ত' আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! যদি মা দয়া করিয়া সে ক্ষেত্রে একটু বেশী সময় থাকিতে দেন, তবে দুই একটি মহান্ সঙ্কল্প সেখানেও জাগিতে পারে। না—সেখানে জাগে না; যেখানে সঙ্কল্প ফোটে, সেটা ঠিক সে জায়গা নয়; সে স্থান তাহার অনেক নিম্নে। কি সুখময়, কি আনন্দময় ধাম আমার মায়ের কোল! আমার যথার্থ স্বরূপ!

মা যখন দয়া করিয়া, জীবকে "সোঽহং" বোধে উপনীত করেন, জীবব্রহ্মের একত্ব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখনই ধীরে ধীরে তাহার জীবত্ববন্ধন, কর্ম্মসংস্কার, দেহাত্মবোধ প্রভৃতি স্খলিত হইতে আরম্ভ হয়। যতদিন পরিপক্কাবস্থায় উপস্থিত না হয় অর্থাৎ জ্ঞান

যতদিন সংশয়-রহিত ও বিপর্য্যয়-প্রতীতিরহিত না হয়, ততদিন সংসার-সংস্কারশ্রেণীর আধিপত্য বিদূরিত হয় না। সাধক যতক্ষণ "সোঽহং" ভাবে অবস্থান করে, ততক্ষণ সব ভুলিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু সে কতক্ষণ? আবার ব্যুত্থিত হয়। আবার "প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ" স্ত্রী-পুত্রের খবর পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। অথবা আর একটী অবস্থা আছে, তাহা মাত্র সাধকগণেরই উপলব্ধিযোগ্য। যখন সাধক "সোঽহং" ভাবে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া তন্ময় হইতে আরম্ভ করে, তখন সেই নিরালম্ব মহান্ চিৎসমুদ্রে ক্ষুদ্রজীবভাবীয় অহংটি নিমগ্ন হইতে গিয়া যেন কি রকম ভয় পায়। একটা ভীতি-মিশ্রিত বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়ে; কারণ, জীব বহুকাল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের বা ভাবের সাহায্যে আমিত্ববোধকে জাগাইয়া রাখিতে অভ্যস্ত, তাহার পক্ষে সীমাহীন নিস্তরঙ্গ চিৎসমুদ্রে অবগাহন প্রথম প্রথম কেমন যেন একটা ভীতি-উৎপাদন করে। মনে করে—এ কি! কোথায় আসিয়া পড়িলাম! ইন্দ্রিয়-রাজ্যে, মনের ক্ষেত্রে পরিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ করিয়া, অকস্মাৎ ভাবাতীত স্বরূপের সমীপস্থ হইলে, প্রথমতঃ ঐরূপ ভাব আসিবেই। ক্রমে মাতৃ-কৃপায় যাওয়া অভ্যস্ত হইলে, আর ভয় থাকে না। তখন উহাই নিজ নিকেতন বলিয়া মনে হয় এবং এই সংসার ও দেহ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বিদেশ বলিয়াই বুঝিতে পারে। যাহা হউক, সেই বিস্ময়-বিহ্বল অবস্থায় জীব আবার একটা ক্ষুদ্রবোধ বা ভাবের সন্ধান করিতে থাকে; কারণ, তাহাতেই সে অভ্যস্ত। তাই, স্ত্রী পুত্র দেহ প্রভৃতি গভীরভাবে অঙ্কিত সংস্কারগুলিকে আশ্রয় করিয়া আবার একটু আশ্বস্ত হয়। তোমরা শিশুকে কখনও খুব জোরে পাখার হাওয়া দিয়া দেখিবে—সে যেন কেমন হাঁকপাঁক করিতে থাকে। প্রবলবেগে প্রবাহিত বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণ করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়াই তাহার ঐরূপ কষ্ট হয়। ইহাও অনেকটা সেইরূপ বুঝিবে। তাই, বৈশ্য সমাধি ধ্যান ধারণাদি স্বজনবর্গের কুশলাকুশল সংবাদ জানিবার জন্য ব্যগ্র। যে সকল যোগাঙ্গ বা জাগতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ভাব-অবলম্বনে আত্মবোধ জাগাইয়া রাখে, সাধক নিরালম্ব সত্তার দিকে অগ্রসর হইয়া, সেই চিরপরিচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবলম্বনগুলিকে আবার গ্রহণ করিতে প্রয়াস পায়, ইহাই সমাধির উৎকণ্ঠা।

এস, এইবার আমরা সোঽহং-তত্ত্ব একটু বুঝিতে চেষ্টা করি। সর্ব্বদা মনে রাখিও—আমরা যে যাহাই বুঝি, উহা নিজ নিজ বুদ্ধি-গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত। ভগবত্তত্ত্ব কিন্তু বুদ্ধির অনেক বাহিরে অবস্থিত ; সুতরাং তাঁহাকে সম্যক্ জানিতে কেহ এখনও পারিয়াছেন কিংবা পারিবেন কিনা সন্দেহ। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও ধ্যানের অগম্যা মা আমার মানব-বুদ্ধিগম্যা কিরূপে হইবেন ? তবে মায়ের এক বিন্দু বুঝিতে পারিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। পিপীলিকার চিনির পাহাড়ের পরিমাণ জানিবার প্রয়োজনই বা কি ?

"সোঽহং" শব্দের অর্থ 'সেই আমি'। এই আমি নহে—সেই আমি। আমির তিনটি স্বরূপ বা অবস্থা আছে। একটি জীব আমি, একটি ঈশ্বর আমি ও অপরটি সেই বা পরম আমি। "সেইটিই" হইল আমির পরমভাব বা শ্রেষ্ঠতম অবস্থা। উহা বাক্য মন এবং বুদ্ধির অতীত স্বরূপ বলিয়া জীবভাবের পক্ষে নিয়ত অপ্রত্যক্ষ। তাই, নামপুরুষ বা সঃ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ব্যাকরণের অনুশাসন-অনুসারেও অপ্রত্যক্ষ বিষয়েই তৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য 'সঃ' শব্দে পরমাত্মাকেই বুঝা যায়। আমি এবং আত্মা একই কথা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা বস্তুতঃ দুইটি বিভিন্ন পদার্থ নহে। আত্মার যে কল্পিত অংশে জীবভাব বিকশিত হয়, তাহারই নাম জীবাত্মা এবং যে অংশে কোন ভাবের বিকাশ নাই, তাহাই পরমাত্মা। আত্মার এই পরম ভাবটি কি, তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যে ভাবে আত্মা মাত্র সৎ চিৎ ও আনন্দরূপে প্রতিভাত হন অথবা যেখানে অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দ বলিয়া কোনও কিছুর উপলব্ধি হয় না, তাহাই পরম ভাব। তাহাকে ভাষার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া, ভাব অবস্থা স্বরূপ প্রভৃতি শব্দ তাহাতে প্রয়োগ করিতেছি। বুঝিও—এসকল শব্দও তাহাতে প্রযুজ্য নহে ; কারণ, ভাব অবস্থা

স্বরূপ প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন পদার্থেরই হইয়া থাকে। মোটামুটি মনে করিয়া লও—আমার এমন একটি অবস্থা আছে, যেখানে অসৎ বলিয়া কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অচিৎ কিংবা জড় বলিয়া কিছু নাই এবং নিরানন্দের লেশমাত্র সেখানে অনুভব করা যায় না। কোনরূপ পরিচ্ছিন্নতা নাই, রূপ রসাদি বিষয় নাই, সুতরাং ভাব এবং অভাব উভয়ই সেখানে প্রতীতিযোগ্য নহে—সে এমনই একটি অবস্থা। তুমি প্রতিনিয়ত যে চৈতন্য-সত্তার দ্বারা পরিচালিত হইতেছ, যদি একবার দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি ভুলিয়া ঐ চৈতন্য-সত্তাটি-মাত্র তোমার বোধের সমীপস্থ করিয়া রাখিতে পার, তাহা হইলে এই পরমাত্মভাবের আভাস পাইবে। সেখানে কিন্তু আমি তুমি সে প্রভৃতি বোধ নাই। তাহাকে বিজ্ঞাতা কিংবা দ্রষ্টাও বলা যায় না; কারণ, সে অবস্থায় জ্ঞেয় বা দৃশ্যের সম্পূর্ণ অভাব থাকে। এই অবস্থাটির নাম পরমাত্মা বা আমার পরম ভাব।

এইবার আমরা "অহং" বস্তুটি বুঝিতে চেষ্টা করি। চণ্ডীর প্রারম্ভে দেবীসূক্তের ব্যাখ্যায় এই অহং-এর স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। এইস্থানে আমরা সেই কথাই আবার অন্যরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। যেরূপ একবার আহার করিলেই চিরজীবনের ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ অতি গহন আত্মতত্ত্ব একবারমাত্র আলোচনায় আত্মজ্ঞান লাভ হয় না; পুনঃপুনঃ ইহার আলোচনা ও অনুশীলন করিতে হয়। তাই, আমরা এক কথাই বারংবার আলোচনা করিতে বাধ্য হই। যাহা হউক, আমার সেই যে পরম-ভাব, উহার এক অংশে স্বভাবতঃ লীলাকৈবল্যবশতঃ একটা 'অহং'-বোধ ফুটিয়া উঠে। (কেন এবং কিরূপে উঠে এরূপ প্রশ্ন করিও না, বুঝিতে চেষ্টা কর)। অহংবোধটি ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে স্বরূপ তাহা অবাঙ্মনসোগোচর। যেই অহংবোধ জাগিল, অমনি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়া প্রকাশ পাইলেন। সেই প্রথম অহংবোধের উন্মেষ হইতে আরম্ভ করিয়া এই পঞ্চভূত ও ভৌতিক পদার্থ পর্য্যন্ত বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডরূপেই মহামায়ার প্রকাশ। এই মহামায়াই যতক্ষণ স্থির অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিবিহীন

ছিলেন, ততক্ষণ পরমাত্মা ব্রহ্ম নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইতেন। যখন শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল, তখন তাঁহার নাম হইল মহামায়া। সেই প্রথম যে অহংবোধ ফুটিয়া উঠিল, ঐ আমিটি মহান্ ও এক। আর দ্বিতীয় একটা আমি তখন ছিল না। উহার—সেই এক আমির ইচ্ছা হইল—বহুভাবে প্রকাশ হইব, বহুত্বের খেলা খেলিব। আনন্দই তাঁহার স্বরূপ, তাই, এই বহুত্ব-লীলার ভিতরেও অখণ্ড আনন্দ অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থিত। যেখানে এই বহুত্বের ইচ্ছাটি ফুটিয়া উঠিল, সেটা কিন্তু মন। মন ব্যতীত সঙ্কল্প হইতে পারে না। এই মনোময়ী মা পূর্ব্বপূর্ব্ব কল্পের সৃষ্টির বীজগুলি এতদিন অব্যক্ত-ভাবে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, এখন আবার প্রসব করিলেন। এই বহুত্বসৃষ্টির নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়ই তিনি—ঐ আমি—মা। তিনি এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডাকারে আত্মপ্রকাশ করিলেন। আকাশ বায়ু অগ্নি জল স্থল সূর্য্য চন্দ্র অণু জীবাণু পরমাণু কীট পতঙ্গ পক্ষী পশু মানব দেবতা, আরও কত কি হইলেন। দিক্ কাল কর্ম্ম ধর্ম্ম অধর্ম্ম কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি রিপু, এক কথায় সব হইলেন। সব হইতে গিয়া তাঁহাকে শব পর্য্যন্ত হইতে হইল। চৈতন্যই তাঁহার স্বরূপ ; তথাপি আনন্দের প্রেরণায়, স্নেহের উচ্ছ্বাসে তাঁহাকে জড় পর্য্যন্ত হইতে হইল। তিনি নিজে আমি ; তাই, তাঁর কল্পিত অণু পরমাণু পর্য্যন্ত আমি-বোধে সংবুদ্ধ হইল। তিনি সমুদ্রবৎ অবস্থিত আমি, আর জীবজগৎ তাঁহার তরঙ্গবৎ আমি।

মনে কর—একটা লণ্ঠন আছে, উহা সাতখানি সাত রংএর কাঁচদ্বারা গঠিত। মধ্যে একটি আলো জ্বলিতেছে। সাতখানি কাঁচের ভিতর দিয়া ঐ একটা আলোই সাত রকমে প্রকাশ পাইতেছে। প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে একটা আমিবোধ রহিয়াছে, উহাও ঠিক সেইরূপ। বস্তুতঃ তিনি এক আমি হইলেও এই বহু জীবের ভিতর দিয়া বহু আমি-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। বেশ ধীরভাবে চল, বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। আচ্ছা ধর, ঐ যে বহু আমি (মূলে কিন্তু বহু আমি নয়, বহুভাবে প্রকাশিত এক আমি) উহার নাম দাও ব্যষ্টি

আমি বা জীব। আর ঐ যে এক আমি, উহার নাম ঈশ্বর। ঈশ্বর কেন বলিবে? বহুত্বের সৃষ্টি ও তাহার ধারণ ঐ আমিতেই হইতেছে; আবার যখন তিনি ইচ্ছা করিবেন যে, আর আমি বহু-ভাবে প্রকাশিত হইব না, তখনই সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া যাইবে—প্রলয় হইবে। সুতরাং তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর। এই অংশটিকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে পূর্ব্বকথিত পরমাত্মা-স্বরূপেরই শক্তিরূপের বিকাশ বলা যায়। সেই পরম অংশটির নাম শক্তিমান এবং অহংবোধ হইতে আরম্ভ করিয়া বহুভাবে প্রকাশ, তাহার ধারণ ও প্রলয়াদি কার্য্য অংশটির নাম শক্তি। এই শক্তি ও শক্তিমান্ বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ। সূর্য্যের প্রকাশশক্তি, অগ্নির দাহিকাশক্তি যেরূপ মুখে বলা যায় মাত্র, উক্ত-রূপ ভেদ কখনও অনুভূতিযোগ্য হয় না, সেইরূপ শক্তি ও শক্তি-মানের ভেদ মাত্র মৌখিক বিচারে প্রযুজ্য। যেরূপ রাহুর শির বলিলে, রাহু এবং শির অভিন্নভাবে প্রতীত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা ও শক্তি অভিন্নভাবে প্রতীতিযোগ্য।

যাহা হউক, এখন বুঝিতে পারা গেল, আমির তিনটি স্বরূপ। একটি জীব আমি, একটী ঈশ্বর আমি এবং অপরটি পরম আমি। এই পরম আমিটির নাম "সঃ" কেন না অপ্রত্যক্ষ। আর জীব আমির নাম হইল "অহং"। "সঃ" এবং "অহং" এই উভয় যখন মিলিয়া যায়, তখনই জীব ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায়। এই মিলনের দ্বার সমাধি। সমাধিই "অহং"কে "সঃ" করিয়া দেয়। তাই, সমাধি আপনাকে "সোহহং" বলিয়া পরিচিত করিলেন।

এইরূপে আমরা কোন রকমে "সোহহং" কথাটি বুঝিয়া লইলাম; কিন্তু ইহার মধ্যেও অনেক জ্ঞাতব্য আছে। ধর, 'জীব আমি' কথাটায় যাহা বুঝিলাম, তাহা ত' বাস্তবিক কিছুই নয়; কারণ, লণ্ঠনের দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারিয়াছি—"আমি" একজন মাত্র। 'আমি' যদি বলিতে হয়, তবে ঈশ্বরকেই বলা যাইতে পারে। দেহাত্মবোধবিশিষ্ট জীবের পৃথক্ আমিত্ব—অজ্ঞানমাত্র। কার্য্যতঃ তাহাই বটে। "সঃ"এর সহিত যে "অহং"এর মিলন, তাহা পরমের সহিত ঈশ্বরের মিলন বলিলেই ঠিক

বলা হয়। মিলন বলিলে বুঝিও না যে, দুইটি বিভিন্ন বস্তু একত্রিত হইল। জীবভাবে প্রকাশিত অজ্ঞানসম্ভূত আমি, ঈশ্বরভাবে প্রকাশিত যথার্থ আমির সন্ধান পাইলেই, জীব ও ঈশ্বরের মিলন সংঘটিত হয়। আবার ঈশ্বরভাবে প্রকাশিত আমি, পরমভাবে উপনীত হইলেই, পরম পুরুষার্থ বা কৈবল্য লাভ হয়। জীবকে পরম ভাবে প্রকাশিত হইতে হইলে, মধ্যবর্ত্তিস্বরূপ যে ঈশ্বর "আমি," তাহাকে অতিক্রম করিয়া হইতে পারে না। জীবকে প্রথমে ঈশ্বর হইতে হইবে, ঈশ্বর পরমভাবে উপনীত হইবেন ; ইহাই মুক্তি ; ইহাই মূলতত্ত্ব।

তাহা হইলে এখন বুঝা গেল—জীবের সাধ্য ঈশ্বর, পরমভাব সাধ্য নহে। উহা সাধ্য-সাধনাদি সর্ব্ববিধ অবস্থার অতীত ; সুতরাং উপাসনা, সাধনা ইত্যাদি যাহা কিছু, তাহা মধ্যবর্ত্তী অবস্থাটি লইয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। জীব যদি কোনরূপে ঈশ্বরস্বরূপে সংবুদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলেই প্রকৃত আমি জিনিষটির সন্ধান পায়। জীবভাবে যে আমি প্রকাশ পায়, উহা প্রতিচ্ছায়ামাত্র। তাই, এই চণ্ডীতে পরে উক্ত হইবে—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা"। যথার্থ আমি—সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর অনন্ত করুণাসিন্ধু স্নেহময় নিগ্রহানুগ্রহক্ষম ও একান্ত আশ্রয়—ইনিই অক্ষর পুরুষ। আর জীব ক্ষর পুরুষ ; কারণ, কাঁচের অন্তর্নিহিত আলোকরূপ অহংটি যদি সরিয়া যায়, তাহা হইতে প্রতিচ্ছায়ারূপ জীব থাকিতেই পারে না। তাই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমিই একমাত্র মা। মা আমার আমি-স্বরূপা, আমিময়ী। তাই, তাঁর সর্ব্বাবয়বে আমি ফুটিয়াছে ; প্রত্যেক পরমাণু আমি আমি শব্দে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। যে বিরাট্ মহান্ আমি-সমুদ্র হইতে এই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আমির সন্ধান করার নামই সাধনা। সেই আমিকে ভালবাসার নাম ভক্তি বা প্রেম। সেই আমিকে জানার নাম জ্ঞান। যত দিন সাধনা এই তত্ত্বময় না হয়,—আত্মানুসন্ধানযুক্ত না হয়, তত দিনই সাধনা নীরসভাবে মৃতুপদে অগ্রসর হইতে থাকে। একটি আত্মসংবেদনে আছে—"পূজাধ্যানজপাদীনি নামসংকীর্ত্তনানি চ।

অহং-দেববিযুক্তানি বিকলান্যাহ ব্রহ্মবিৎ”। পূজা ধ্যান জপ নামকীর্ত্তন প্রভৃতি ততক্ষণ অসম্যক্ ফলপ্রদ থাকে, যতক্ষণ অহং-দেবযুক্ত না হন। অহংই সাধ্য, অহংই পূজ্য, অহংই উপাস্য। যত দিন এই আমাকে বাদ দিয়া সাধকগণ অগ্রসর হন, তত দিন আমারই পূজা করেন; কিন্তু অবিধিপূর্ব্বক; তাই গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—“যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।” ইত্যাদি।

ঐ শোন—এই আমিই ঈশ্বর, সর্ব্বযজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা এবং প্রভু। যে যাহা কিছু কর—আমিই তাহা ভোগ করিয়া থাকি। জীব! যত দিন তুমি আমাকে না জানিবে, আমাকে আদর না করিবে, ততদিনই জন্মমৃত্যু দুঃখযাতনার সংপেষণে সম্পিষ্ট হইবে। আমি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে প্রাণরূপে অবস্থিত। আমাকে চেনে না, মনুষ্য মধ্যে এমন দুরাচার কেহ নাই। তাই, দুরাচার ব্যক্তিও আমার ভজনা করিতে পারে। এই আমিই বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, গাণপত্যের গণেশ, সৌরের সূর্য্য। এই আমিই সাকারে বিশ্বরূপ এবং বিশেষ বিশেষ ভক্তের জন্য বিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই আমিই আবার রূপাতীত নিরঞ্জন। যত দিন জীব “জীবোঽহং”-বোধে অবস্থান করিয়া “ঈশ্বরোঽহং”-কে পৃথক্‌ভাবে উপাসনা করে, তত দিন সে আমাকে পাইবে না—পাইবার উপায় নাই। সর্ব্বদা মনে রাখিও “আমি” জীব নহে। ঐ যে “জীবোঽহং” বলিয়া অভিমানে স্ফীত হইতেছে, উহার মধ্যে “অহং”টি হইতেছেন “আমি”—মা। তিনি কখনও জীবকে পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করেন না। ওরে, জন্ম-জন্মান্তর হইতে আমি—মা জ্ঞাতসারে হৃদয়ে থাকিয়া এবং অজ্ঞাতসারে সর্ব্বরূপে থাকিয়া, তোমাদিগকে পরিপোষণ করিতেছি, আদর করিতেছি—স্নেহাঞ্চলের আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধন করিতেছি। এতদিন বুঝিতে পার নাই, ক্ষতি নাই; এখন মানুষ হইয়াছ, এখনও আমাকে—মাকে চিনিবে না?

বড় দুঃখে আমি বলিয়াছি—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।" মানুষ তোমরা আমাকে বড় অবজ্ঞা কর। যত অবজ্ঞা কর, ততই আমি আত্মগোপন করি, লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া পুত্র পুত্র বলিয়া তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটি, শুধু অপেক্ষায় আছি, কবে তুমি আমায় আদর করিবে—কবে তুমি আমায় মা বলিয়া ডাকিবে! তুমি দিবারাত্র 'আমার আমার' বলিয়া ছুটিতেছ—অভিমানরূপিণী আমারই মানে অভিমান করিয়া বেড়াইতেছ। আ—মা'র আ—মা'র বলিয়া ত একবারও আমার দিকে তাকাও না। পুত্র! আর কত দিন শিশু থাকিবে? আমাকে মা বল, আমাকে পাইবে।

"অহং"তত্ত্ব বুঝিতে গিয়া আমরা অনেক অপ্রকাশ্য কথার আলোচনা করিয়া ফেলিয়াছি; তাহাতে ক্ষোভ নাই, যদি দুই চারিজন সাধকও আমিকে ধরিতে পারেন, তাহা হইলে এই গোপনীয় বিষয়প্রকাশের ক্ষোভ তিরোহিত হইবে। মনে রাখিও—আমিকে না ধরিতে পারিলে "সোঽহং" হইবার উপায় নাই; "সোঽহং" না হইতে পারিলে, জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। আমরা জীবভাবে যে 'আমি আমি' করি উহা কিন্তু বাস্তবিক 'আমি' নহি। আমি—এক ব্যতীত দুই নাই। সর্ব্ব জীবের ভিতর একই আমির প্রতিধ্বনি হইতেছে। বিভিন্ন আধারে বিভিন্নভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া, একই আমি দেব মনুষ্য তির্য্যক্ ইত্যাদি আকারে প্রকাশ পাইতেছে। উহার—ঐ "একোঽহং" এর শরণাগত হও,— 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—সর্ব্বরূপে যে আমির প্রতিবিম্ব দেখিতে পাও, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বের ভিতর যাহা অনুস্যূত, সেই আমির আশ্রয় গ্রহণ কর। "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" "আমি তোমাকে সর্ব্বরূপ পাপ অর্থাৎ সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত করিব—শান্তিময় উদার মুক্তিক্ষেত্রে—সোঽহং-রাজ্যে উপনীত করিব; তুমি দুঃখ করিও না বৎস!" গীতার এই চরম ও পরম বাণীটি যাহার প্রাণে সম্বেদন আনিয়াছে—যে

সত্যসত্যই এইভাবে আমাকে—মাকে গুরুরূপে পাইয়া, তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণের জন্য যথাশক্তি পুরুষকার প্রয়োগ করিতেছে, একমাত্র তাহারই জন্য এই চণ্ডী। শুধু পড়িবার জন্য, শুধু দুই চারিটি ভাল কথা শিখিবার জন্য গীতা বা চণ্ডীতত্ত্ব আলোচনা করা বালকোচিত ক্রীড়া মাত্র।

কিন্নু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন্নু সাম্প্রতম্।
কথং তে কিন্নু সদ্বৃত্তাঃ দুর্ব্বৃত্তাঃ কিন্নু মে সুতাঃ ॥২১॥

অনুবাদ। এক্ষণে তাহাদের গৃহে মঙ্গল কিংবা অমঙ্গল বিরাজ করিতেছে? আমার সেই পুত্রাদি স্বজনবর্গ কি সদ্বৃত্ত অথবা অসদ্বৃত্ত? (তাহা জানিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠিত আছি)।

ব্যাখ্যা। ধ্যান ধারণাদির গৃহ মন। সেই মনে কি ক্ষেমঙ্করীর শ্রীপাদপদ্ম-সংস্পর্শে ক্ষেম বিরাজ করিতেছে, অথবা এখনও বিষয়-বাসনাজনিত অক্ষেম—অমঙ্গল পূর্ণভাবে আধিপত্য করিতেছে? ক্ষেম বা মঙ্গল একমাত্র মা। যিনি সর্ব্বভূতে আমিরূপে বিরাজিতা, সেই মাকে পাইয়া, মন কি ধন্য হইয়াছে? মন কিরূপে মাকে পাইবে? আত্মার বা আমার যে চঞ্চলতাময় সংস্কারাত্মক অবস্থা, তাহাই মন। যখন প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক ভাবে, মাতৃ-দর্শনের ফলে সত্য-প্রতিষ্ঠা প্রকৃতিগত হইয়া যায়, সর্ব্বভাবে মাতৃ-সত্তাই প্রকটিত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে—মনোময় ক্ষেত্রে ক্ষেমঙ্করীর পাদস্পর্শ হইয়াছে। আর যত দিন তাহা হয় না, পরিচ্ছিন্ন বিষয়-বাসনা মনের স্বাভাবিক চঞ্চলতাকে আরও বেশী চঞ্চল করিয়া তুলিতে থাকে, যত দিন কামনার অনলে পুড়িয়া পুড়িয়া মন অতিশয় সন্তপ্ত হইতে থাকে, তত দিনই মনে অক্ষেম বিরাজ করে। এই উভয়ের মধ্যে কোনটি এখন মনের উপর আধিপত্য করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য সমাধির এই উৎকণ্ঠা। সে যে এখন মনোরাজ্য হইতে বিতাড়িত, বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপনীত; তাই,

মনের সঙ্গবিচ্যুতি-নিবন্ধন মনের বর্ত্তমান অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছে না, অথচ মনের প্রতি সেই যে পূর্ব্বসঞ্চিত আসক্তি, তাহাও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না।

এখানে ইহাও জানা আবশ্যক যে, যম নিয়মাদি যোগাঙ্গগুলি যত দিন পূর্ণভাবে মাতৃ-লাভের উদ্দেশ্যে সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইয়া মাত্র শারীরিক স্বাস্থ্য, চিত্তস্থির কিংবা বিশিষ্ট কোন শক্তি-লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তত দিন মনোময় ক্ষেত্রে অক্ষেমই বিরাজ করে। তদ্ভিন্ন পুত্রগণ অর্থাৎ ধ্যানাদি যোগাঙ্গসমূহ, এখন কি সদ্বৃত্ত হইয়াছে, অথবা দুর্ব্বৃত্ত—অসদাচরণশীল আছে? ইহাও সমাধির উৎকণ্ঠার কারণ। সৎ একমাত্র আত্মা—মা। তাহাতে বর্ত্তমান থাকার নাম সদ্বৃত্ততা, আর মাতৃ-ভাবশূন্য কেবল বিষয়ভাবে বিচরণ করার নাম দুর্ব্বৃত্ততা। যোগাঙ্গগুলি আত্মলাভ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অথবা মাত্র চিত্তস্থির উদ্দেশ্যে বা বিষয়মাত্রে বিমুগ্ধ, ইহাই সংশয়। সমাধির এরূপ সংশয় প্রথম অবস্থায় একান্ত স্বাভাবিক।

রাজোবাচ।

যৈর্নিরস্তো ভবাঁল্লুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ।
তেষু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধ্নাতি মানসম্ ॥২২॥

অনুবাদ। (সমাধির এইরূপ পর্য্যাকুল অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া) রাজা সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন—বিষয়লোলুপ যে পুত্রদারাদি কর্ত্তৃক আপনি নিরাকৃত হইয়াছেন, (কি আশ্চর্য্য!) আপনার চিত্ত তাহাদের প্রতি স্নেহানুরক্ত!

ব্যাখ্যা। যদিও নিয়ত পরিচ্ছিন্নত্বে মুগ্ধ ধ্যান-ধারণাদির ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া, সমাধি অসৎসঙ্গ-পরিহার বাসনায়, তাহাদিগকে

পরিত্যাগপূর্ব্বক মেধসাশ্রমে উপনীত হইয়াছেন, তথাপি তাহাদের প্রতি চিত্তের অনুরাগভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বহু দিন সহবাসের ফলেই এইরূপ হয়। সমাধির ধর্ম্ম—আত্মানুসন্ধান, মনের ধর্ম্ম—চঞ্চলতা—বিষয়-অন্বেষণ। এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ অবস্থা নিবন্ধন, বলবান্ মন কর্ত্তৃক প্রথম প্রথম সমাধিকে নির্জ্জিত হইতে হয়, তথাপি সে মনের প্রতি পূর্ব্ব অনুরাগ পরিত্যাগ করিতে পারে না; কারণ, ঐ চঞ্চলতা ঐ পরিচ্ছিন্নতার সাহায্যেই ত' আত্মবোধ উদ্‌বুদ্ধ আছে। যাহারা আমার আমিত্ব উদ্‌বুদ্ধ রাখিবার প্রধান সহায়, তাহাদিগকে সাধনার অন্তরায় জানিলেও, নিতান্ত নির্দ্দয়ের ন্যায় তাহাদিগের প্রতি স্নেহ-শূন্য হওয়া প্রথম অবস্থায় সমাধির পক্ষে বড় কঠিন। সম্যক্ মাতৃভাবে বিভোর না হইলে, দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণ শিথিল না হইলে, ইহা সম্ভব হয় না। ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও যখন জীব আমিত্বকে উদ্‌বুদ্ধ রাখিতে সমর্থ হয়, তখনই উহাদের মায়া পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। নতুবা কি সাধনার অঙ্গ, কি যোগাঙ্গ, কি ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম, কিছুই পরিত্যাগ করা যায় না। ইহা পরে আরও ব্যক্ত হইবে।

বৈশ্য উবাচ।

এবমেতদ্ যথা প্রাহ ভবানস্মদ্‌গতং বচঃ।
কিং করোমি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥২৩॥

অনুবাদ। বৈশ্য বলিলেন—আপনি আমার বিষয়ে যাহা বলিতেছেন, তাহা এইরূপই বটে, (অর্থাৎ যাহাদিগের দ্বারা আমি বিতাড়িত, তাহাদের মঙ্গলামঙ্গলের জন্যই আমার চিত্ত পর্য্যাকুল, ইহা ঠিকই বলিয়াছেন) কিন্তু কি করিব! আমার মন কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছে না।

ব্যাখ্যা। যোগাঙ্গসমূহ বিষয়াসক্ত হইয়া সমাধিকে বিতাড়িত করিয়া, নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিলেও, সমাধি কিছুতেই সেরূপ নিষ্ঠুর

হইতে পারে না। সমাধি সত্ত্বগুণ হইতে সঞ্জাত; সুতরাং দয়াই তাহার স্বভাব। অপরের দ্বারা শত উৎপীড়িত হইলেও তাহার উপর একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করা সমাধির পক্ষে অসম্ভব। সমাধিরই অন্য পর্য্যায় প্রেম। বিশ্বব্যাপী প্রেমময় আত্মদর্শন যাহার উদ্দেশ্য, তাহার পক্ষে প্রেমহীনতা একান্ত অসম্ভব।

যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃস্নেহং ধনলুব্ধৈর্নিরাকৃতঃ।
পতি-স্বজনহার্দ্দঞ্চ হার্দ্দি তেষ্বেব মে মনঃ ॥২৪॥

অনুবাদ। যে ধনলুব্ধ পুত্র পত্নী প্রভৃতি স্বজনগণ পিতৃস্নেহ পতিপ্রেম এবং স্বজনপ্রীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে, আমার মন তাহাদের প্রতি একান্ত অনুরক্ত।

ব্যাখ্যা। ধ্যানের পিতৃস্থানীয়, ধারণার পতিস্থানীয় এবং যম নিয়মাদির স্বজনস্থানীয় সমাধির প্রতি যে স্বাভাবিক প্রীতি, তাহা তাহারা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছে। উহারা সমাধিকে চিরদিনের জন্য ক্ষুদ্রত্বে মুগ্ধ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিল; কিন্তু সে আত্মসন্ধানে অগ্রসর হইয়া, উহাদিগের স্বাভাবিক আকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন একটু একটু করিয়া প্রজ্ঞার সন্ধান পাইলেও তাহাদের প্রতি আসক্তির মূল উৎপাটিত হয় নাই। এইরূপ বিরুদ্ধভাব দ্বারা পর্য্যাকুল হওয়া, মলিন ভাবাপন্ন অল্পক্ষণস্থায়ী সমাধির পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক; কেন না, এখনও সে বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থিত; ব্রহ্মক্ষেত্রে এখনও সম্যক্‌ভাবে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। যদি বা কদাচিৎ তিলমাত্র সময়ের জন্য পরমাত্মসান্নিধ্য লাভ করে, তথাপি আবার তৎক্ষণাৎ মনোময় ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়; সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য বৈশ্য সমাধির একান্ত স্বাভাবিক।

কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে।
যৎ প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণেষ্বপি বন্ধুষু॥
তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসো দৌর্ম্মনস্যং চ জায়তে।
করোমি কিং যন্ন মনস্তেষ্বপ্রীতিষু নিষ্ঠুরম্ ॥২৫॥

অনুবাদ। হে মহামতে সুরথ! বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন স্বজনগণের প্রতি আমার চিত্ত যে অতিশয় প্রেমপ্রবণ, তাহা বুঝিতে পারিলেও আমি ইহার কারণ স্থির করিতে পারিতেছি না; তাহাদের জন্যই আমার এই দীর্ঘনিশ্বাস ও দুর্ম্মনায়মানতা উপস্থিত হইয়াছে। অনুরাগী স্বজনগণের প্রতি আমার মন যে কিছুতেই নিষ্ঠুর হইতে পারিতেছে না।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—প্রজা ও মন্ত্রিবর্গের অত্যাচারে রাজ্যভ্রষ্ট মহারাজ সুরথ বনে আসিয়াও পরিত্যক্ত রাজ্য মন্ত্রী প্রজা ভৃত্য ও কোষাদির জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠা ভোগ করিতেছেন। সমাধির অবস্থাও সেইরূপ। তিনি বিষয়লুব্ধ স্ত্রীপুত্র কর্ত্তৃক বিতাড়িত; অথচ তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তায় ব্যাকুল; উভয়েরই তুল্য অবস্থা; সুতরাং পরস্পরের প্রতি স্নেহানুরাগ স্বাভাবিক। তাই, বৈশ্য তাহার নিজের চিত্তের দুর্ব্বলতার বিষয় কিছুই গোপন না করিয়া, সরল প্রাণে অসঙ্কোচে সুরথের নিকট প্রকাশ করিলেন।

জীবাত্মার সহিত বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে যখন সমাধির প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখন তাহাকে এইরূপ মলিনভাবাপন্নই দেখা যায়; কারণ, বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে পূর্ণ নির্ম্মলতা প্রস্ফুটিত হয় না। একমাত্র প্রজ্ঞায় প্রবেশ করিতে পারিলেই সর্ব্ববিধ ভাবচঞ্চলতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধি—জগৎমুখী নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিবিশেষ। যদিও ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি হইতে বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও স্থির উদাসীনবৎ অবস্থিত; তথাপি তাহার সম্মুখে মন প্রতিক্ষণে সংস্কাররাশি একটির পর একটি আনিয়া উপস্থিত করে, তাহাতেই বুদ্ধিকেও চঞ্চল বলিয়া প্রতীতি হয়। দ্রুতগামী-শকটারূঢ় ব্যক্তি যেরূপ উভয়পার্শ্বস্থ নিশ্চল

ভূভাগকে সচল বলিয়া মনে করে, ইহাও ঠিক সেই প্রকার। নিয়ত চঞ্চল মন একটীর পর একটী সংস্কার উপস্থিত করিয়া, বুদ্ধি-জ্যোতিতে আলোকিত করিয়া লইতেছে; তাই অতিচঞ্চল মনের সহিত নিয়ত সম্বন্ধবশতঃ নিশ্চল বুদ্ধিও যেন চঞ্চলবৎ হইয়া থাকে। বহুজন্মসঞ্চিত সংসার-সংস্কারশ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন বুদ্ধিময়ক্ষেত্রে চিদাভাসের নির্ম্মল জ্যোতিতে আত্মহারা হয়, ঈষৎ সমাধির আভাস পাইতে থাকে, তখন যে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দরসের আস্বাদ পায়; যদিও তাহাতে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার সামর্থ্য না থাকায়, পুনরায় চিত্তক্ষেত্রে নামিয়া পড়ে; তথাপি সেই আস্বাদের স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া সংস্কার-শ্রেণীকে উন্মূলিত করিতে উদ্যত হয়; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা করিয়া উঠিতে পারে না। তখন স্বকীয় দুর্ব্বলতা দেখিয়া একান্ত হতাশ হইয়া পড়ে; উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসে নিজের মর্ম্মদাহ যেন আরও দ্বিগুণ করিয়া তুলিতে থাকে। "হায়! আমার মত দুর্ব্বলচিত্ত জীবের পক্ষে মাতৃ-লাভ সুদূরপরাহত!" এইরূপ ভাবিয়া সাধক নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, কেন যে এইরূপ হয়, তাহার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া অধিকতর অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

জগতের মানুষ যখন কোন ভীষণ দুঃখের আবর্ত্তে উৎপীড়িত হইতে থাকে, তখন যদি তাহার কারণটী বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সেই দুঃখের মাত্রা যেন কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হয়; কিন্তু "কারণ জানি না, অথচ উৎপীড়িত হইতেছি," ইহা মানুষের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয়। জানি—কামিনী-কাঞ্চন, বিষয়-বাসনা কিংবা যম নিয়ম আসন প্রভৃতি সাধনার উপায়গুলি আমার মাকে আনিয়া দিবে না; জানি—উহারা পরিচ্ছিন্নত্বে মুগ্ধ; জানি—উহারা আমার হিতৈষী নহে. জানি—তাহারা চায় পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখ; আমি চাই—অপরিচ্ছিন্ন উদার মাতৃ-বক্ষ—মন বুদ্ধির অতীত অতীন্দ্রিয় আত্মসত্তা, অথচ দেখিতে পাই—মন এই অত্যুচ্চ আশা এবং তদনুযায়ী উদ্যম দেখিতে পাইয়া, ধ্যান ধারণা প্রভৃতি যোগাঙ্গ অথবা কর্ম্মকাণ্ডের

সাহায্যে আমাকে ক্ষুদ্রত্বে মুগ্ধ রাখিতে উদ্যত। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে মনের প্ররোচনায় এইরূপ উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছি। আমার অমূল্য জীবন, আমার বহুজন্মসঞ্চিত অসহনীয় যন্ত্রণায় লব্ধ জ্ঞান, উৎসাহ, উদ্যম প্রভৃতি অনর্থক পরিব্যয়িত করিয়া ফেলিতেছি। পরিচ্ছিন্নতাই যে মুক্তিপথের একান্ত অন্তরায়, তাহা বুঝিতে পারিয়াও কেন আমি তাহাদের এত অনুরক্ত! কিছুতেই ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না; তাই তাহাদের প্রতি কোনরূপ নিষ্ঠুর ভাবও পোষণ করিতে পারিতেছি না! যাহা বাস্তবিক হেয় বলিয়া বুঝিতেছি, কি যেন কি অজ্ঞাত কারণে তাহাকেই উপাদেয়রূপে পরিগ্রহ করিতেছি! হায় দুর্ভাগ্য! এইরূপ চিন্তা—এইরূপ দুর্ম্মনায়মানতা সমাধিকে যেন নিতান্ত মলিন করিয়া রাখে।

একটু একটু করিয়া যখন সমাধির আভাস আসিতে থাকে, তখন সাধকের পক্ষে সংসার-সংস্কার, বিষয়ের ক্ষুদ্রতা এবং উপাসনার উপায়গুলির প্রতি যে পূর্ব্বসঞ্চিত আসক্তি, উহা অতিশয় মর্ম্মপীড়াদায়ক হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধক! মনে রাখিও—ইহাই তোমার শুভ মুহূর্ত্ত। বহুজন্ম-সঞ্চিত সুকৃতির ফলে আজ তুমি সমাধির সাক্ষাৎ পাইয়া, জীবত্বকে অসহনীয় যন্ত্রণাপ্রদ শৃঙ্খল বলিয়া মনে করিতেছ। মনে রাখিও—তুমি মুক্তিমন্দিরের দ্বারে উপনীত হইয়াছ। মনে রাখিও—তোমারই জন্য মায়ের আমার বক্ষোবাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, পুত্র-স্নেহের আকুলতায় পীনস্তনে ক্ষীরধারা উচ্ছ্বসিত হইতেছে, বহুদিন সন্তানকে অঙ্কে ধারণ করিয়া মনের মতন আদর করিতে পারেন নাই বলিয়া, আজ উন্মাদিনীবেশে দ্রুতবেগে সত্যলোক হইতে নিম্নে অবতরণ করিতেছেন। মনে রাখিও সাধক! তোমার জন্য মায়ের কত ব্যাকুলতা! তুমি এতদিন মাকে চাও নাই, বিষয় চাহিয়াছিলে—রূপ রস শব্দ স্পর্শ চাহিয়াছিলে; তাই মা আমার বিষয়ের আকারে উপস্থিত হইতেন। নিজের স্বরূপটি কত কঠোরতায় লুক্কায়িত রাখিয়া, বিষয়ের আকারে আকারিত হইয়া, তোমার

ইন্দ্রিয়বর্গকে চরিতার্থ করিয়াছেন। কামিনী-কাঞ্চনের আকারে মা কত জীবন তোমার উদ্দাম লালসা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তুমি যে পুত্র! তুমি চাহিয়াছিলে, আর মায়ের আমার বিচারের অবসর নাই, ভালমন্দ বিচার-বিমূঢ়া মা আমার—পুত্রস্নেহে অন্ধা মা আমার—তোমার সেই প্রার্থনার অনুরূপ কাম-কাঞ্চনের আকারে, রূপ-রসাদি বিষয়ের আকারে, দেহ-মন-বুদ্ধির আকারে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। ওরে, এ স্নেহের কথা মনে করিলেও মর্ম্ম শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। এ স্নেহ বুঝিবার উপযুক্ত বুদ্ধি আমাদের নাই; এ স্নেহ ধরিবার উপযুক্ত বক্ষ আমাদের নাই, এ স্নেহ ভোগ করিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয় আমাদের নাই। মা আমার অদ্বিতীয় অনন্ত, তাঁহার স্নেহও অদ্বিতীয় অনন্ত। একবার দেখ, মা তোমার জন্য কি করিতেছেন! কত ব্যস্ত তোমায় বক্ষে লইতে, কত আকুল তোমার মলিনতা মুছাইতে, কত উন্মাদনা তোমায় চুম্বন করিতে, কত আবেগ তোমায় নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত করিতে, এইরূপ প্রতিনিয়ত দেখিতে থাক! পরিচ্ছিন্নতার—চঞ্চলতার, বিষয়-বাসনার মোহ অচিরে বিদূরিত হইবে। শুভ দিন—বড় আনন্দের দিন আসিয়াছে; সুরথ সমাধির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। যদিও প্রথম অবস্থায় সমাধি তত দৃঢ়, তত উজ্জ্বল, তত একাত্মপ্রত্যয়মাত্র না হউক, তথাপি উহার মূল্য বড় বেশী। উহা বহু জন্মের বহু সাধনার ফল।

সুরথ ও সমাধি উভয়েই এখন নিজেদের অভাব দেখিতে পাইতেছে। কি যেন একটা অজ্ঞেয় শক্তি, অজেয় মোহ বিগুণ বন্ধুদের প্রতি, দুর্ম্মতি পুত্রভার্য্যাদির প্রতি এবং বিনশ্বর কোষ বলাদির প্রতি বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে। পশ্চাৎ দিকের এই প্রবল আকর্ষণ দৃষ্টিপথে নিপতিত হয় জীবের কখন? যখন সম্মুখে মায়ের দিকের আকর্ষণ একটু একটু করিয়া অনুভব করিতে পারে, যখন মাতৃ-স্নেহের প্রবল আকর্ষণের মাধুর্য্য এবং বিষয়াভিমুখী বিপরীত আকর্ষণের ক্ষণস্থায়ী রসের তিক্ততা উপলব্ধিযোগ্য হয়, তখন জীবনমাত্রেই বলিতে বাধ্য হয়—"তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসা দৌর্ম্মনস্যঞ্চ জায়তে।" তখনই

সাধক "করোমি কিং" বলিয়া আকুল হইয়া, সেই অজ্ঞেয় শক্তি—অজেয় মোহের উচ্ছেদ সাধনে কৃতযত্ন হয়।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততস্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ।
সমাধির্নাম বৈশ্যোঽহসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ॥
কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্।
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চক্রতু বৈশ্যপার্থিবৌ॥২৬॥

অনুবাদ। মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে বিপ্র! (ক্রৌষ্টুকি) অনন্তর সমাধি নামক বৈশ্য এবং রাজসত্তম সুরথ, উভয়ে মিলিত হইয়া, সেই মেধস্ মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া, যথাশাস্ত্র যথাযোগ্য সমুদাচার পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন এবং (উপযুক্ত অবসরে) কয়েকটী কথা বলিবার উপক্রম করিলেন।

ব্যাখ্যা। জীব চিত্তবিক্ষেপের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, সমাধির সাহায্যে পুনরায় বুদ্ধির নির্ম্মল জ্যোতি আশ্রয় করিয়া প্রজ্ঞার শরণাপন্ন হইলেন। পূর্ব্বে সুরথ একা ছিলেন, তখন মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়াও মেধসের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। এখন সমাধির সহায়তায় সে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সুরথ মেধসকে স্মৃতিরূপ একপ্রকার বোধপ্রবাহমাত্র বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, এখন তাহাকে প্রজ্ঞানরূপে গুরুর আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বে "ব্রহ্মাহমস্মি" এই স্মৃতিরূপ পরোক্ষজ্ঞানমাত্র মনে করিয়া, সুরথ মেধসের আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। এখন সেই মেধসকেই সমস্ত সংশয়ের নিরাসক, হৃদয়ের সমস্ত সন্তাপহারক এবং অনন্ত শান্তিদায়ক গুরুরূপে দর্শন করিলেন।

যখন স্বকীয় জ্ঞানবলে এবং অধ্যয়নাদি দ্বারা সঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে কিংবা সমধর্ম্মী কোন লোকের জ্ঞানের আলোকে কিছুতেই

তত্ত্ব-উন্মেষ হয় না, কিছুতেই প্রাণের পিপাসা মিটে না, সন্দেহ দূর হয় না, অজ্ঞান-অন্ধকার যেন আরও ঘনীভূত হইয়া আসে। "সবই বুঝি, আর একটু হইলেই যেন সব সন্দেহ বিদূরিত হয়; অথচ সেইটুকু হইতেছে না, কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না—ঐ একটুকুর জন্যই যেন সব বৃথা হইতে চলিয়াছে। কিছুই লাভ হয় নাই, বৃথা চেষ্টা, বৃথা আয়োজন, বৃথা তপস্যা, বৃথা কর্ম্মোদ্যম! সকলই করিলাম; কিন্তু জীবনের কৃতকৃতার্থতা আসিল না—অমরত্বের আস্বাদ পাইলাম না, অভয়ের সন্ধান পাইলাম না, সংশয় মিটিল না।" এইরূপ ভাবের দ্বারা জীব যখন একান্ত বিব্রত হইয়া পড়ে, তখনই মা আমার গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। যখন কোন দেশবিশেষ বা জাতিবিশেষের অধিকাংশ লোক এইরূপ ভাবের দ্বারা আকুল হইয়া পড়ে, তখনই তিনি জগদ্‌গুরুরূপে, ঋষিরূপে, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতারূপে মনুষ্যদেহে প্রকটিত হইয়া, সত্যের সমুজ্জ্বল আলোকে জীবজগৎকে ধন্য করিয়া যান। যতদিন তিনি প্রকট থাকেন, ততদিন অতি অল্প লোকই যথার্থরূপে তাহাকে জানিতে পারে; কিন্তু তিরোধানের পর জগৎ তাঁহার উপদেশ শুনিয়া, তাঁহার কার্য্য ও আদর্শ দেখিয়া, আর তাঁহাকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না। স্বয়ং ঈশ্বরের বিশিষ্ট অবতারজ্ঞানে পূজা করিয়া ধন্য হয়। ইহাই মায়ের খেলা।

সে যাহা হউক, উল্লিখিত মন্ত্র দুইটীতে গুরূপস্থানের কতকগুলি অলঙ্ঘ্য নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে! আমরা প্রথমে তাহারই আলোচনা করিব। দেখিতে পাইতেছি—একজন বৈশ্য পরমাত্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে উদ্যত, সাধনারূপ ধনে মহাধনী। "অসৌ" শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধনামা, তাহার নাম সমাধি। ভারতবর্ষে হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সমাধি শব্দটা কর্ণগোচরও করেন নাই, এরূপ লোক অতি অল্পই আছেন। এইরূপ প্রখ্যাত একজন অপর একজন—প্রসিদ্ধ রাজা পার্থিবসত্তম—জীবশ্রেষ্ঠ। সত্তম শব্দের অর্থ সত্যপ্রতিষ্ঠ। যিনি সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের মাত্র সৎস্বরূপটীর উপলব্ধি করিয়াছেন, "আমার মা একজন আছেন" এই কথাটী যিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছেন,

যাঁহার আস্তিক্য-বুদ্ধি কখনও সন্দেহ-বাত্যায় আন্দোলিত হয় না, তিনিই সত্তম। এ কথাটীও নিতান্ত উপেক্ষাযোগ্য নহে। একমাত্র আস্তিক্য-বুদ্ধিই সাধনার যথার্থ মূলধন। এই মূলধন যার যত বেশী, তিনি তত বেশী লাভবান্ হইয়া থাকেন। আমি মায়ের সম্বন্ধে কিছুই জানিনা, তাহার রূপ গুণ স্নেহ আদর মহিমা প্রভৃতি কিছুই আমার জ্ঞাত নাই, মাত্র জানি—"আমার মা একজন আছেন।" এই কথাটিতে এমন একটা বিশ্বাস আনা চাই যে, শত সহস্র ঘাত প্রতিঘাত সন্দেহ বিতর্ক বিরুদ্ধ প্রমাণ যতই আসুক না কেন, আমার সেই সত্যজ্ঞান, সেই অস্তিত্ব-বোধকে বিন্দু মাত্রও চঞ্চল করিতে পারিবে না। এইরূপ ভাবে যিনি মায়ের সংস্বরূটীর সাধনায় সিদ্ধ, তিনিই পার্থিব-সত্তম, অর্থাৎ পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীববৃন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন, এইরূপ দুইজন উচ্চস্তরের সাধক যখন গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, মহর্ষি সেই কথা প্রকাশ করিতে গিয়া বলিলেন—"তেন সহ যথান্যায়ং যথার্হং সংবিদং কৃত্বা উপবিষ্টৌ।" তাঁহার সহিত যথান্যায় যথাযোগ্য সমুদাচার করিয়া উপবেশন করিলেন।

"যথান্যায়" শব্দের অর্থ বিধি-অনুসারে এবং "যথার্হ" শব্দের অর্থ যথাযোগ্য। কিরূপ সমুদাচার যথাশাস্ত্র এবং যথাযোগ্য হইয়া থাকে, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে। গুরুর সমীপে উপস্থিত হওয়া মাত্র যেন মনে হয়—এই সাক্ষাৎ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। যিনি আমার জন্ম-জন্মান্তরের চিরসখা চিরসুহৃৎ, হৃদয়রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট, যিনি বিজ্ঞানময় সর্ব্বভূত-মহেশ্বর-মূর্ত্তিতে সর্ব্বভূতে বিরাজিত, সমগ্র জগৎ যাঁহাতে অবস্থিত, এক কথায়, আমি যাঁহাকে চাই, তিনি—সেই মা-ই আমার প্রতি স্নেহে, পরম কৃপায় শুধু আমারই জন্য আজ এই মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্ত্তেই আমার সর্ব্ববিধ বন্ধনমুক্ত করিয়া দিতে পারেন। ইনিই দয়া করিয়া আমার অজ্ঞান-অন্ধ নয়নে দিব্য জ্ঞানজ্যোতি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, বা দিতে পারেন; এইরূপ

জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তোমার প্রাণ যেমনটি করিতে চায়, তাহাই করিবে। যথাশক্তি বিনয় নম্রভাবে কায়িক বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ প্রণাম পূর্ব্বক, চরণস্পর্শের অধিকার দিলে, চরণস্পর্শ করতঃ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে। তিনি যতক্ষণ না কোন কথা বলেন, ততক্ষণ ধীরভাবে তাঁহার অনুমতি-অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিবে। এক কথায়, তুমি যদি সাক্ষাৎ ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হও, তবে তোমার মন প্রাণ ইন্দ্রিয় দেহ প্রভৃতির যেরূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে বলিয়া মনে কর, যদি গুরুদর্শনমাত্রেই সেইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা হইলেই বুঝিবে—তোমার যথান্যায় যথাযোগ্য সমুদাচার করা হইল। 'সম্বিদ্' শব্দের অর্থ সম্যক্ জ্ঞান। গুরুতে যথার্থ ভগবৎ-বুদ্ধি না হইলে প্রকৃত সম্বিদ্ হয় না। এই সম্বিদ্ যাহার যত সরলতাপূর্ণ, যত সত্যে ও বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তিনি তত শীঘ্র গুরুকৃপালাভে চরিতার্থ হইবেন। "গুরুর কৃপা হ'লে ভূমণ্ডলে জন্মমৃত্যু হয় না আর"। গুরু-গীতা বলেন— "মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা !"

সমুদাচারের পর উপবেশন—শ্রীগুরু আসন-গ্রহণের অনুমতি কিংবা ইঙ্গিত করিলে, তবে উপবেশন করিবে। উপবেশনেরও একটু বিশেষত্ব আছে : পদদ্বয় যেন বস্ত্রাদিদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, মেরুদণ্ড যেন সরলভাবে থাকে, মস্তকটী যেন ঈষৎ অবনত থাকে। উহার সমস্ত আদেশ পালন করিবার জন্য তুমি প্রতিমুহূর্ত্তে প্রস্তুত, এমনি একটা ভাব যেন তোমার উপবেশন হইতে প্রকাশ পায়। সর্ব্বপ্রকার ঔদ্ধত্য, বিতণ্ডা, পরিহাস পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার শ্রীমুখনির্গত প্রত্যেক বাণীটি দৃঢ় অভিনিবেশ-সহকারে শ্রবণ করিবার জন্য প্রতিক্ষণে উৎকর্ণ থাকিবে। গুরু আনন্দময় মহাপুরুষ, সর্ব্বদা বালকবৎ সরলভাবে অবস্থিত ; তাই হয়ত কোন কথা হাস্যজনক হইতেও পারে, তাহাতে তুমি এমন হাসিও না, যাহাতে একটা চঞ্চলতা প্রকাশ পায়। স্থূল কথা—ধীর স্থির শুশ্রূষু বিনীত এবং আদেশ পালনে উদ্যত, এই পঞ্চ-ভাব-প্রকাশক উপবেশনই শিষ্যযোগ্য।

আজকাল দেশে কি একটা বিপরীত ভাব আসিয়াছে, কেহই শিষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে চায় না; আগেই গুরু হইয়া বসিতে চায়। শিষ্যত্বের সাধনায় সিদ্ধ হইলেই যে সব লাভ হয়, এ কথা দেশ ভুলিয়া গিয়াছে। ওরে, শিষ্য ঠিক হইলে গুরু মৃণ্ময় মূর্ত্তি হইলেও মোক্ষলাভ অবশ্যম্ভাবী। শিষ্যত্বের সাধনা করিয়াছিলেন সত্যকাম, উপমন্যু, আরুণি, বেদ, কৌৎস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মহর্ষিগণ। মহাভারতে আর একটী সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে—চণ্ডালপুত্র একলব্য। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্যের নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া মৃণ্ময় গুরুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক এরূপ অভূতপূর্ব্ব অস্ত্রপ্রয়োগ-কৌশল শিক্ষা করিয়াছিল যে, একদিন দ্রোণাচার্য্যের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য সর্ব্বায়ুধ-বিশারদ অর্জ্জুনকেও তাহার নিকট অবনতমস্তক হইতে হইয়াছিল। ধন্য শিষ্যত্বের সাধনা! আগে হৃদয়ে হৃদয়ে গুরুর আসন রচিত কর। স্বয়ং শিষ্যত্ব-লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন কর। গুরুর জন্য আকুল হইতে হইবে না; গুরুর অভাব নাই! গুরু প্রতিনিয়ত তোমার মুখপানে চাহিয়া আছেন—কবে তুমি আসিবে, কবে তোমায় কৃতার্থ করিবেন। তুমি কেবল গুরুর বিচার করিয়া বেড়াইও না, নিজে শিষ্য হইয়াছ কি না দেখ। গুরু যে কেহ হইতে পারেন। ভাগবতে আছে—অবধূতের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত গুরু হইয়াছিল; সুতরাং শিষ্যত্বলাভ করাই প্রকৃত সাধনা।

দেখ, হিন্দুর ঘরের মেয়েরা কিরূপ করে? দশ বার বৎসরকাল পিতৃগৃহে অবস্থান করিয়া, মাতৃ-পিতৃস্নেহে লালিত পালিত হইয়া, সহোদর সহোদরা ও অন্যান্য প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন সহ একত্র কালযাপন করে। পরে একদিন এক মুহূর্ত্তে কে একজন অপরিচিত লোক আসিল, রাত্রিকালে ঘুমের ঘোরে ক্লান্ত দেহে হয়ত চারি চক্ষুর মিলনও হইল না। পুরোহিত মহাশয় কি দুই চারিটী সংস্কৃত কথা উচ্চারণ করিলেন। রাত্রি প্রভাতে উঠিয়া সেই মেয়েটী পূর্ব্বপরিচিত মাতাপিতা, বন্ধুবান্ধব, ভাই ভগিনী সব পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত পুরুষটীর সঙ্গে চলিল। মনে ভাবিল,—

উনিই আমার সর্ব্বস্ব। উনিই আমার ইহপরকালের গতি, আর যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সকলেই আত্মীয় বটে; কিন্তু ইহার মত প্রিয়তম, নিকট হইতে নিকটতম কেহ নয়। একবার দেখিল না, যাহার সঙ্গে সে চলিয়াছে, সে অন্ধ কি বধির, মূর্খ কি পণ্ডিত, সাধু কি তস্কর, কিছু বিচার নাই, কিছু সন্দেহ নাই, যেমন থাকুক না কেন, ইনিই আমার সর্ব্বস্ব। এই একমুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তন কি সুন্দর! কি তীব্র সাধনার ফল। ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

কেন এমন হয়? এত হঠাৎ কিরূপে এই পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়? কারণ আর কিছুই নহে। ঐ বালিকাটী বহুদিন হইতে পত্নীত্বের সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। সে জানিত—আমি একজনের ভার্য্যা হইব। সে যিনিই হউন না কেন, তিনিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। বহুদিনব্যাপী এইরূপ ধারণার ফলে, এইপ্রকার আকস্মিক পরিবর্ত্তনের সম্ভব হয়। ঠিক এমনি করিয়া প্রাণে প্রাণে গুরুর আসন রচনা কর। নিজে শিষ্য হও। এমন এক মুহূর্ত্ত আসিবে যে, আর তোমার গুরু-বিচার করিবার অবসর থাকিবে না। আর ভাবিবার সময় পাইবে না যে, ইনি আমার গুরু হইবার উপযুক্ত কি না, ইনি আমায় মুক্তিমার্গে লইয়া যাইতে পারিবেন কি না; ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া যিনি গুরুরূপে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবেন, তাঁহার নিকট তোমার প্রাণ স্বতঃই নমিত হইয়া পড়িবে। গুরু একটি আলম্বনমাত্র। সব নিজেকেই করিতে হয়। কাহারও মুক্তি কেহ করিয়া দেয় না, বা দিতে পারে না। যাঁহারা সমস্ত ভার গুরুর উপর দিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারেন, এরূপ মহাপুরুষ জগতে অতি বিরল। সে সকল ক্ষেত্রেও শিষ্যের অজ্ঞাতসারে গুরু মুক্তির অনুকূল কার্য্যগুলি সম্পাদন করাইয়া লন; কিন্তু গুরুর এমনি মহিমা যে, শিষ্য বুঝিতে পারে না—"আমি সাধনা করিতেছি।"

সে যাহা হউক, জীব বহুজন্মের সুকৃতির ফলে সমাধির সাক্ষাৎ পায় এবং উভয়ই উভয়ের অভাব বুঝিতে পারে। অভাব কিসের? জ্ঞানের। একবিন্দু জ্ঞান লাভ করিবার জন্য জীবকে কত প্রাণপাত

তপস্থা করিতে হয়। সাধারণতঃ জীব যাহাকে শ্রেয় বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহা প্রেয় হয় না, অথচ যাহা প্রেয়ঃ, তাহাকেও শ্রেয়োরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। যে জ্ঞানজ্যোতিঃ এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সমস্যা বিদূরিত করিয়া দেয়, সেই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রজ্ঞা বা শুদ্ধ বোধরূপী গুরুর সমীপস্থ হইতে হয়। প্রত্যেক জীবহৃদয়েই গুরুরূপে তিনি নিত্য বিরাজিত। তিনি অন্তর্যামী চিন্ময় মহাপুরুষ। যতদিন জীব এই হৃদয়স্থ গুরুর সাক্ষাৎ না পায়, ততদিন প্রকৃত শান্তির কেন্দ্র খুঁজিয়া পায় না। বাহিরে মনুষ্যমূর্ত্তি-গুরু যতদিন বিজ্ঞানময় মহেশ্বর-মূর্ত্তিতে প্রকটিত না হন, ততদিন যথার্থ গুরুলাভ হয় না। গুরুলাভ হইলে জীবের আর কোন ভয় থাকে না; তাহার মুক্তি সুনিশ্চিত।

একমাত্র অভিনিবেশের সাহায্যে এই হৃদয়স্থ গুরুর সমীপস্থ হইতে হয়। একটু একটু করিয়া সমাধি আসিলেই, জীব এই বোধময় গুরু মেধসের সমীপে উপনীত হইতে পারে। তাই, বৈশ্য সমাধি ও পার্থিব সুরথ আজ বড় আনন্দের সহিত বোধময় গুরুর চরণে উপসন্ন হইয়া "কাশ্চিৎ কথাঃ চক্রতুঃ" নিজেদের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। একটী গানে শুনিয়াছিলাম, "বল্‌বো যত দুঃখের কথা কৈলাসেতে গিয়ে।" কথাটি অতি সত্য। আগে কৈলাসেতে যাও, তার পর ত' দুঃখের কথা মাকে জানাইবে। মা যে আমার কৈলাসের সমুন্নত শিখরে—গুরুবক্ষে নিত্য বিরাজমানা। মাকে দেখিবে—কৈলাসে যাও। গুরুকে ধর। দেখিবে গুরুই মা, কি মা-ই গুরু বুঝিবার অবসর থাকিবে না। ওরে, গুরু যে বড় আপনার লোক, প্রাণের প্রাণ, সখা হইতে প্রিয়তম, বন্ধু হইতেও সমধিক স্নেহশীল, ভার্য্যা হইতেও সমধিক আনন্দদাতা, সে যে নিতান্ত অন্তরঙ্গ। তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবে না, কোথায় বলিবে?

মনে করিও না, গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা বা উপদেশ পাইলেই, গুরুলাভ হইল, গুরু যতদিন "আমার" না হন, একান্ত আত্মীয়—একান্ত অন্তরঙ্গ না হন, ততদিন গুরুলাভ হয় না। যথার্থ গুরুলাভ

হইলে শিষ্য অনসূয় হয়, অর্থাৎ গুরুর দোষদর্শনে অন্ধ হয়, গুরুর প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক ইঙ্গিতই তখন মহান্ উদ্দেশ্যপূর্ণ ঐশ্বরিক কার্য্য বা ইঙ্গিতরূপে শিষ্য-হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে থাকে। আদর্শ-শিষ্য অর্জ্জুন এইরূপ অসূয়াহীন হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান্ অপূর্ব্ব রাজগুহ্য যোগের উপদেশ প্রদানে তাঁহাকে ধন্য করিয়াছিলেন।

রাজোবাচ।

ভগবংস্ত্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ ॥২৭॥

অনুবাদ। রাজা বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার নিকট একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করি, আপনি (অনুগ্রহ করিয়া) বলুন।

ব্যাখ্যা। সমাধি-সহায় জীবাত্মা বোধময় গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে সম্বোধন করিলেন—"ভগবন্"! শিষ্যের গুরুকে যে কি ভাবে দর্শন করিতে হয়, তাহা এইস্থানেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক দর্শনেও দেখিতে পাওয়া যায়, জীবাত্মা যখন প্রজ্ঞানের সমীপস্থ হয়, তখন ত' তাহাকে ভগবান্ বলিতে বাধ্য হইবেই; কারণ, প্রজ্ঞানই যে ব্রহ্ম। গুরু ও ব্রহ্ম অভিন্ন; সুতরাং সে অবস্থায় ভগবান্ বলা একান্ত স্বাভাবিক। ব্যবহারিক জগতেও যখন কোন শিষ্য গুরুর সমীপস্থ হন, তখনও যে গুরুকে প্রত্যক্ষ-ঈশ্বররূপে দর্শন করা উচিত, তাহা বুঝাইবার জন্যই মন্ত্রে "ভগবন্" শব্দটীর প্রয়োগ হইয়াছে। বিচার বা বিবেকের সাহায্যে কল্পনার দ্বারা গুরুকে ঈশ্বররূপে দর্শন নিম্নাধিকারিতার সূচনা করে। গুরুমূর্ত্তি-দর্শন অথবা গুরুর নাম-স্মরণ বা শ্রবণ করা মাত্র সরলপ্রাণ শিশুর মত মনে হওয়া উচিত, উনিই আমার ভগবান্। যেরূপ নিজের মা বিকলাঙ্গ হইলেও "আমার মা" বলিয়া একটা কি যেন অব্যক্ত সরল সত্যসম্বন্ধ প্রকাশ করে; ঠিক সেইরূপ, গুরু যেমনই হউন না কেন, তিনিই আমার ইহপর-কালের গতি, তিনিই সমগ্র জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা, শুধু

আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া মনুষ্যমূর্ত্তিতে বিরাজিত। হইতে পারে তিনি বহুলোকের গুরু, আমার তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই। তিনি আমার গুরু—ব্রহ্ম। ইহা যে কেবল ধারণা বা কল্পনা করিয়া লইতে হইবে, তাহা নহে; যথার্থই ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও গুরু হইবার অধিকার নাই। যদি কোন জীবভাবাপন্ন মানুষ নিজেকে গুরু মনে করেন, তবে তিনি অনায়াসে "উ"কারটী পরিত্যাগ করিয়া লইতে পারেন; কারণ, তিনি অজ্ঞানান্ধ। গুরুগীতার প্রত্যেক মন্ত্রটি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবে—গুরু কে? মনুষ্যদেহ গুরুর আসনমাত্র, যেরূপ শালগ্রামশিলা যে সিংহাসনে থাকে, সেই আসনখানাও আমাদের পূজা, সেইরূপ যে দেহ আশ্রয় করিয়া গুরুশক্তি প্রকাশ পায়, সে দেহটিও আমাদের পূজ্য। গুরু—একজন। কেহ কখন কাহারও গুরু-নিন্দা করিও না; কারণ, তোমার গুরু ও আমার গুরু পৃথক্ নহেন। বৈষ্ণব শাক্ত শৈব প্রভৃতি বাহ্য আবরণগুলি গুরুর ভেদক চিহ্ন নহে। যেরূপ সকল কাচাধারের মধ্যে একই বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে, কেবল আধারগত বর্ণগত বৈচিত্র্য-বশতঃ আলোর বিচিত্রতার উপলব্ধি হয়, সেইরূপ একই গুরু বিভিন্ন আধারে অবস্থিত হইয়া, বিভিন্ন অধিকারীর মঙ্গলের জন্য বিভিন্নভাবে আত্ম-প্রকাশ করেন। সর্ব্বদা মনে রাখিবে—"মদ্‌গুরুঃ—শ্রীজগদ্‌গুরু "

এস্থলে গুরুর শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ বলা হইতেছে। অধীতবেদ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ, এই উভয়গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সদ্‌গুরুপদবাচ্য। শাস্ত্রজ্ঞান থাকিয়া যদি ব্রহ্মনিষ্ঠ না হন, কিংবা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া যদি শাস্ত্রজ্ঞানহীন হন, তবে তিনি সম্যক্‌ভাবে শিষ্যের অজ্ঞান দূর করিতে সমর্থ নহেন। শাস্ত্র এবং যুক্তিবলে, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-প্রতিপাদন, এবং সাধনাদ্বারা তাহা শিষ্যহৃদয়ে সমুদ্দীপিতকরণ; এই উভয়শক্তি যাঁহাতে পূর্ণভাবে প্রকটিত, তিনিই শিষ্যের অনেক জন্মসঞ্চিত কর্ম্ম-বন্ধ বিদাহ করিতে সমর্থ; বহু সৌভাগ্যবলে এরূপ গুরু লাভ হয়। যাঁহারা কৌলিক নিয়মানুসারে মাত্র তান্ত্রিক মন্ত্রাদি প্রদান করেন, তাঁহারাও শিষ্যকে সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিয়া, জীবের আত্মোন্নতির পথ উন্মুক্ত

করিয়া দেন; সুতরাং তাঁহারাও প্রত্যক্ষ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজনীয়। মন্ত্রদাতা ও মুক্তিদাতা ভেদে গুরুশ্রেণীতে দ্বিবিধ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যে শক্তি মন্ত্রদাতা-রূপে আবির্ভূত হইয়া লৌকিকী দীক্ষা-প্রদানে জীবের মঙ্গল-দ্বার উদ্ঘাটিত করেন, সেই গুরুশক্তিই আবার মুক্তিদাতারূপে, হয়ত অন্য কোন মনুষ্য-দেহ আশ্রয় করিয়া মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। তাই বলিতেছিলাম—গুরু বহু নয়, একজন।

আজকাল কেহ কেহ গুরুশক্তির এই রহস্য অবগত হইতে না পারিয়া, কৌলিক গুরু পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন সাধু মহাপুরুষের অথবা কোন দণ্ডকমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর শিষ্য হইয়া, পূর্ব্বপুরুষের গুরুকে নানারূপ আপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন; ইহা অতীব অজ্ঞানতার পরিচায়ক। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়া যথারীতি আশ্রম-ধর্ম্ম পরিপালন ও গৃহস্থ গুরুর শরণাপন্ন হইয়া, তদুপদিষ্ট উপায়ে অভ্যুদয়-লাভের জন্য যত্নবান্ হওয়াই গৃহস্থের কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যলঙ্ঘন অনেক স্থলে উন্মার্গগমন ও অধঃপতনের সূচনা করে। তবে ইহাও স্থির, যেরূপ ভ্রমরগণ মধুর জন্য পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করে, সেইরূপ আত্মজ্ঞানলাভের জন্য বহু গুরুর শরণাপন্ন হওয়াও শাস্ত্রে অবিহিত নহে। যতদিন অধীতবেদ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুলাভ না হয়, ততদিন তাদৃশ গুরুরূপে আবির্ভূত হইবার জন্য কাতরপ্রাণে মায়ের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে একদিন দেখিবে—তোমারই প্রাণের মত গুরু মিলিয়াছে। অভূতপূর্ব্ব উপায়ে অচিন্তনীয় ঘটনায় এই শুভ সম্মিলন হয়। মা-ই আমার গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। লীলাময়ীর প্রত্যেক লীলাই অভূতপূর্ব্ব ও অচিন্তনীয়। আসল কথা—ঐ কাতর প্রার্থনা; "আমি যথার্থই চাই" এই ভাবটী যতদিন প্রাণে না জাগিবে, ততদিন গুরু কেন, জগতের ধনৈশ্বর্য্যও লাভ করা যায় না। এই যে দেখিতে পাও—যাহারা দরিদ্র, তাহারা মুখে বলে ধন চাই; কিন্তু যথার্থ প্রাণের অন্তস্তল অন্বেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়—সে ধন চায় না। ঐ দরিদ্র অবস্থাই তাহার প্রীতিকর,

তাই সে ধন পায় না। যাহার প্রার্থনা যত সত্য, তাহার অভীষ্টলাভও তত সহজ। মা যে আমার কল্পতরু, যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। ইহা ধ্রুব সত্য; সুতরাং প্রথমে মায়ের নিকট গুরুরূপে আবির্ভূত হইবার জন্য প্রার্থনা কর; তিনি সদ্‌গুরুরূপে আসিয়া কি চাহিতে হইবে, কেমন করিয়া চাহিতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিবেন, অথবা অভীষ্টপ্রদানে কৃতার্থ করিবেন।

গুরুলাভ হইলে শিষ্যের কর্ত্তব্য কি? এ বিষয়েও শাস্ত্র বলিয়াছেন—তনু, মন, ধন ও বাণী, এই চারিটি যথাসম্ভব শ্রীগুরুচরণে অর্পণ করিতে হয়। সর্ব্বতোভাবে গুরুর আদেশ পালনের জন্য দেহটি শ্রীগুরুর চরণে অর্পণ করার নাম তন্বর্পণ। প্রত্যক্ষ ঈশ্বররূপে দর্শন করার নাম মনার্পণ। ঈশ্বরের সেবা পূজাদির ফল অনেকস্থলেই অপ্রত্যক্ষ; কিন্তু মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ গুরুর সেবা পূজাদির ফল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়ই। এই হিসাবে গুরুকে ঈশ্বরেরও উচ্চে আসন দেওয়া যাইতে পারে। গুরু যদি সংসার-আশ্রমী হন, তবে ধন বস্ত্র ভূষণ পশু প্রভৃতি যাহা কিছু নিজের আছে, সে সমস্তই তাঁর চরণে নিবেদন করার নাম ধনার্পণ। ভয় নাই! ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু তোমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া তোমায় পথের কাঙ্গাল করিবেন না। যদিই বা করেন, তাহা অম্লান বদনে সহ্য করিবে। বৎস! একটু কষ্ট না করিলে, ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। জিনিষটা নিতান্ত সহজ নয়। যাহা লাভ করিলে তুমি অমর হইবে, নিত্যানন্দ ভোগ করিবে, পৃথিবীতে থাকিয়া অপার্থিব জীব হইবে, তাহা শুধু মৌখিক ভক্তিতে লাভ করা যায় না। তোমার প্রাণ সংসারের নশ্বর বস্তুতে আসক্ত হইয়া রহিয়াছে, সেই সমগ্র প্রাণটা তুলিয়া লইয়া গুরুর চরণে অর্পণ করিতে হইবে। সর্ব্বধন-অর্পণ তাহার প্রথম আয়োজন মাত্র। আর যদি গুরু সন্ন্যাসী হন, তবে শিষ্যকেও সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইতে হইবে। অনন্তর তিনি যদি পুনরায় গৃহে অবস্থান করিতে আদেশ করেন, তবে সে আদেশ পালন করিবে। সর্ব্বদা গুরুর গুণগান করার নাম বাণী-অর্পণ। এইগুলি করিতে

পারিলে, শিষ্যের কর্ত্তব্য শেষ হয়। তখন গুরুর কর্ত্তব্য আরম্ভ হয়। একদিনের চেষ্টায় না হইতে পারে—কিছুদিনের যত্নে শিষ্যত্ব অর্জ্জন, গুরুর উপরে সমস্ত ভার-অর্পণ—নিতান্ত অসম্ভব নহে। ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু তোমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়া তোমায় অমৃতধনে বঞ্চিত করিবেন, এরূপ আশঙ্কা মনে স্থান দিও না। ওরে, যতদিন না শিষ্য মুক্ত হইতে পারে, ততদিন গুরুর মুক্তি নাই, বিশ্রাম নাই; বড় ভীষণ দায়িত্ব। জান, গুরু কি জিনিষ দিয়া থাকেন? "একমপ্যক্ষরং যং তু গুরুঃ শিষ্যং প্রবোধয়েৎ। পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্ দ্রব্যং যদ্ দত্ত্বা সোহনৃণী ভবেৎ॥" গুরু শিষ্যকে এক অদ্বিতীয় অক্ষর পুরুষে প্রবোধিত করেন; পৃথিবীতে এমন কোন জিনিষ নাই, যাহা তাহার বিনিময়ে অর্পণ করিয়া শিষ্য অঋণী হইতে পারে। জানিস্, গুরু শিষ্যকে কি জিনিষ দেন—এক অক্ষর দেন, প্রবোধিত করেন—জাগান। জানিস্, গুরু শিষ্যকে কি দেন—প্রাণ! নিজের প্রাণ, যাহা পুত্রকেও দিতে কুণ্ঠিত, সেই প্রাণ নিজের হাতে তুলিয়া শিষ্যের বুকে বসাইয়া দেন। জানিস্, গুরু শিষ্যকে কি দেন—নিজে মরিয়া শিষ্যকে বাঁচান। যে ব্রহ্মানন্দে অবস্থান করিলে, জগৎ বলিয়া, শিষ্য বলিয়া, দীক্ষা বলিয়া আর কিছু থাকে না, ওরে সেই ব্রহ্মানন্দ হইতে নিম্নে অবতরণ করেন। শিষ্যের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, স্নেহে আকুল হইয়া, সেই আনন্দ শিষ্যদের মধ্যেই বিতরণ করেন। তাহাতেই তাঁহার সুখ। নিজের সুখ তাঁহারা চান না। জানিস্, গুরু শিষ্যকে কি দেন? শিষ্যের যত কিছু মলিনতা, যত কিছু সন্তাপ, যত কিছু পাপ, নিজে গ্রহণ করিয়া স্বকীয় পবিত্রতায়, পুণ্যের উজ্জ্বল আলোকে শিষ্যকে কৃতার্থ করেন। আর জানিস্, গুরু শিষ্যকে কি দেন? না সে আর বলা চলে না। যে শিষ্য, সে প্রাণে প্রাণে বুঝিবে।

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—"যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মভিঃ॥" যাঁহার গুরুতে ঈশ্বর-জ্ঞান আসিয়াছে, যিনি গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞানেই ভক্তি করিতে পারেন, একমাত্র তাঁহার নিকটেই গুরূপদিষ্ট সাধনরহস্যসমূহের যথার্থ

তত্ত্ব উদ্‌ভাসিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, জীবাত্মা সমাধির সাহায্যে শুদ্ধবোধে সমাহিত হইয়া, চিত্তবিক্ষেপের কারণ নির্ণয় করিতে উদ্যত হইলেন। ইহাই এই মন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ। "বদস্ব তৎ" তাহা বল। এই অংশটুকু গুরুর অনুমতি। রাজা বলিলেন "প্রষ্টু মিচ্ছামি"; মুনি অনুমতি দিলেন—'বদস্ব তৎ'। তারপর রাজা স্বকীয় বক্তব্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রটীর এইরূপ অর্থ করাও অসঙ্গত নহে।

দুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা।
মমত্বং মম রাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি॥
জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম॥২৮॥

অনুবাদ। হে মুনিসত্তম! আমার মন (পরমাত্মায় নিরুদ্ধ না হওয়ায়) নিতান্ত অবশীভূত, তজ্জন্য আমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে। এই দেখুন, আমার পরিত্যক্ত রাজ্য (দেহাদিপুর) এবং অখিল রাজ্যাঙ্গ (বৃত্তিসমূহ), এই সকলের প্রতি আমার মমতা কত! আমি জানি—ইহার কিছুই আমার নহে, তথাপি অজ্ঞের মত আমার চিত্ত তাহাতে আসক্ত! ইহা কিরূপ, অর্থাৎ কেন এইরূপ হয়?

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে সমাধির সহিত সুরথ যে সকল আলোচনা করিয়াছিলেন, যে চিত্তবিক্ষেপের হেতু নির্ণয় করিতে না পারিয়া, গুরু মেধসের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, এস্থলে তাহাই পরিব্যক্ত করিলেন। বোধময় গুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া বিষয়াসক্তির কেন্দ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এস্থলে "জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য" "জ্ঞান থাকিতেও অজ্ঞ" এই কথাটির মধ্যে একটী সুন্দর রহস্য আছে। আমরা অনেকেই জ্ঞানে বেশ বুঝিতে পারি—সংসার আমার নহে, দেহেন্দ্রিয়াদি আমার নহে, অন্যকে বুঝাইবার সময়েও বেশ বলিতে ও বুঝাইতে পারি; কিন্তু কাজের বেলায় আমরা সকলেই অজ্ঞ। জ্ঞানে যাহা বুঝি, অনেক সময়ে কার্য্যে তাহা

করিয়া উঠিতে পারি না। সাধকমাত্রেরই এইরূপ একটা সঙ্কটাপন্ন অবস্থা উপস্থিত হয়। বুদ্ধির নির্ম্মল জ্যোতিতে হৃদয় যতই আলোকিত হইতে থাকে, সংসারসংস্কার-শ্রেণীর ততই অকিঞ্চিৎকরত্ব-বোধ হইলেও, চিত্তের চিরাভ্যস্ত বিষয়াসক্তি কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। মা আমার একদিকে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া সাধক-হৃদয়ে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক যতই উদ্ভাসিত করিয়া দিতে থাকেন, ততই সে দেখিতে পায়—তাহার চিত্ত পূর্ব্বে যেরূপ বিষয়বিমূঢ় ছিল, দেহাত্মজ্ঞানে মুগ্ধ ছিল, এখনও প্রায় সেইরূপ আছে। জ্ঞানে বেশ বুঝিতে পারে—দেহ কিছু নয়, সংসার কিছু নয়, সংস্কার কিছু নয়; ও সব মায়েরই স্বেচ্ছাকৃত একটা ক্ষুদ্রতার খেলামাত্র; কিন্তু মন যে ঐ ক্ষুদ্রত্বেই মুগ্ধ, তাহাকে ত' ছাড়াইবার উপায় নাই! এ সকল দোষ যে পূর্ব্বে ছিল না, তাহা নহে, তবে তখন ইহা যন্ত্রণাদায়ক হয় নাই, তখন এই সংসার-কূপে—বিষাক্ত বায়ুপূর্ণ অন্ধকারময় স্থানে বেশ সুখেই অবস্থান করিতেছিল; কিন্তু জীব এখন মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছে—সমাধির সহায়তা লাভ করিয়াছে, শুভ্র আলোকমণ্ডিত সেই উদার অনন্ত চিন্ময় আকাশ চক্ষে পড়িয়াছে, আর ত' সেই পূর্ব্বের অবস্থা প্রীতিকর হয় না! "ত্যক্তুম্ ভোক্তুমশক্তা যে দুঃখিনস্তে হ্যহর্নিশম্।" এই অবস্থায় বিষয়াসক্তি-পরিহার অথবা বিষয়-ভোগ-জনিত প্রীতিলাভ, এই উভয়েরই অভাব বশতঃ জীব অতিশয় দুঃখিত হইয়া পড়ে। তাই, মন্ত্রের প্রথমেই "দুঃখায়" কথাটী উক্ত হইয়াছে।

অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ।
স্বজনেন চ সন্ত্যক্ত স্তেষু হার্দ্দী তথাপ্যতি ॥২৯॥
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।
দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ ॥৩০॥

অনুবাদ। কেবল আমি একা নহি, এই যে সমাধি, ইনিও পুত্র দারা স্বজন এবং ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত—পরিত্যক্ত হইয়াও

তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল! এইরূপে আমি এবং সমাধি দুইজনেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি; যেহেতু দৃষ্টদোষ-বিষয়েও আমাদের মন মমতায় আকৃষ্ট হইতেছে।

ব্যাখ্যা। ঐটুকুই দরকার! মা আমার ঐটুকুরই অপেক্ষা করিতেছেন,—ঐ "অত্যন্তদুঃখিতৌ"। বহু জন্মান্তর, বহু যুগ যুগান্তর ধরিয়া, পুত্রকে বক্ষে করিয়া অনন্ত জন্মমৃত্যু-প্রবাহের ভিতর দিয়া, পুত্রেরই অভিলাষ-সিদ্ধির অন্তর্নিহিত স্বকীয় মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছা পরিচালিত করিয়া, মা আজ সন্তানকে এমন এক অবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন যে, সে বলিতেছে—আমরা বড় দুঃখিত। দেখিতে পাইতেছি—বিষয়সমূহ দোষযুক্ত—নশ্বর পরিণামী অকিঞ্চিৎকর পরিচ্ছিন্ন পরিণাম-বিরস; এত দোষ এখন দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। এতদিন দেখিতে পাই নাই, বেশ ছিলাম, এখন দেখিতে পাইতেছি—"বহুদোষা হি বিষয়াঃ"। তথাপি মমত্বাকৃষ্ট-মানস—মন তাহাতেই আসক্ত। ইহা হইতে পরিত্রাণেরও কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না; সুতরাং ইহা অপেক্ষা কষ্টদায়ক আর কি আছে?

সত্য-সত্যই জীব যখন দেখিতে পায়—বিষয় বিষমাত্র, তথাপি কি যেন অজ্ঞেয় শক্তির তাড়নায় সেই বিষ গলাধঃকরণ করিতে হয়, তখন ইহা অপেক্ষা নরকযন্ত্রণা আর কি হইতে পারে? প্রথম প্রথম এই যন্ত্রণা সামান্য মাত্রায় অনুভূত হয়। মা আমার যতই দয়া করিয়া বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থানের সুযোগ ও সময় বেশী করিয়া দিতে থাকেন, ততই যেন এই যন্ত্রণার মাত্রা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। জগতের কাজ করিতে হয়, করে; কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি পায় না। এমনি একটা মর্ম্মপীড়া অন্তরে অন্তরে হইতে থাকে, ইহা সাধক ভিন্ন অপরে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তাই বলিতেছিলাম—সাধক হওয়া অপেক্ষা না হওয়া বরং এক পক্ষে সুখের বলা যায়। যে জানে না—ইহা বিষ, সে অনায়াসে খাইতে পারে; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বিষ খাওয়া যে কি কষ্ট, তাহা অবর্ণনীয়।

যাহা হউক, আজ মা আমার গুরুরূপে, শুদ্ধ-বোধরূপে, বিজ্ঞানময় মহেশ্বররূপে আশুতোষ-মূর্ত্তিতে উপবিষ্ট হইয়া পুত্রের মুখে শুনিতেছেন, "আমরা অত্যন্ত দুঃখিত।" একদিন মা আমার গীতাচ্ছলে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন—"অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাং।" এই অনিত্য অসুখময় সংসার পাইয়া আমাকে ভজনা কর। আজ আমরা দেবীমাহাত্ম্যে আসিয়া তাহারই কার্য্যকরী অবস্থা দেখিতে পাইতেছি। সুরথ ও সমাধির ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এই লোককে অনিত্য বোধ হইয়াছে; নতুবা "দৃষ্টদোষেঽপি বিষয়ে" কেন বলিবেন? অসুখ-বোধও যথেষ্ট হইয়াছে; নতুবা "অত্যন্তদুঃখিতৌ" কেন বলিলেন? সত্য সত্যই দুঃখ জিনিসটা বড় ভাল। দুঃখই মাকে আনিয়া দেয়। দুঃখের মত বন্ধু আর কেহ নাই। দুঃখ দিয়াই জীব সুখ কিনিয়া থাকে। দুঃখই যেন মায়ের অগ্রদূত; তবে কথা এই যে, দুঃখের বোধ হওয়া চাই—অনুভব হওয়া চাই। অনেকে আছেন—দুঃখ ত' দুঃখ, পরিধানে বস্ত্র নাই, বাসগৃহ নাই, উদরে অন্ন নাই, ভার্য্যা অপ্রিয়বাদিনী, পুত্র অপ্রিয়, বন্ধুগণ উচ্ছৃঙ্খল, তথাপি বেশ আছেন। উহারই মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কোন বকমে দিনযাপন করিতে পারিলেই হয়। কই, তাহাদের দুঃখের অনুভূতি কোথায়? যাহার দুঃখের যথার্থ অনুভূতি আসিয়াছে, সে অচিরাৎ দুঃখমুক্ত হইবেই। মা ঐ অনুভূতির জন্যই ত' দুঃখরূপে আসেন। সাংসারিক দুঃখের অনুভূতি জাগাইয়া, তবে সাধনাক্ষেত্রে জীবকে প্রবেশ করান; তারপর মাতৃ-স্নেহরসে অভিষিক্ত করিয়া, ধীরে ধীরে সাধনাক্ষেত্রের দুঃখগুলি ফুটাইয়া তুলেন।

জানি মা দুঃখরূপেও তুমি অনুভূতিরূপেও তুমি, আবার দুঃখের সংহন্ত্রীরূপেও তুমি, তথাপি বলিতেছি—আমাদের দুঃখের অনুভূতি থাকুক বা না-ই থাকুক, তুমি ত' দেখিতেছ মা! অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অত্যন্ত দুঃখিত সন্তান আমরা হতাশ-প্রাণে পথভ্রান্ত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছি; যাহা আপাত-মধুর পরিণাম-বিরস,

তাহাকেই যথার্থ সুখ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছি ; যাহা বাস্তবিক আত্ম-মোহজনক, সেই তামসিক সুখকেই ভূমা সুখ মনে করিয়া, নিদ্রা আলস্য মোহ অজ্ঞানতা প্রভৃতিকে জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা-জ্ঞানে আলিঙ্গন দিতেছি ; আর যাহা প্রকৃত সুখ, প্রকৃত শান্তি তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকাই না ; তাহারই ফলে নানাবিধ সন্তাপে নিয়ত সন্তপ্ত হইতেছি। ঐ দেখ্ মা, তোর ত্রিতাপদগ্ধ পুত্রগণ একবিন্দু স্নেহবারির আশায় শুষ্ককণ্ঠে "মা মা" বলিয়া ছুটিতেছে, আর তুই বিশ্বের জননী, বিশ্ববিধাত্রী মা হইয়া পাষাণের মত স্থির ধীর অচল মূর্ত্তিতে বসিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিস্ কোন্ প্রাণে ? বড় অন্ধ জগৎ, বড় সন্তপ্ত জগৎ, ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীন, মাতৃ-বিমুখ সন্তান আমরা পরিচ্ছিন্নে মুগ্ধ, চঞ্চলতা ও দুর্ব্বলতাই আমাদের একমাত্র সম্বল। এই দুর্দ্দিনে, এই যুগসন্ধির মহাক্ষণে তুই একবার স্নেহময়ী মূর্ত্তিতে দাঁড়া দেখি মা ! আমাদের আমিত্ব-ভার একবার জোর ক'রে কেড়ে নে ! আর একবার—একবারমাত্র তোর ঐ পীনোন্নত পয়োধরবৃন্ত সন্তানের মুখে প্রবিষ্ট করাইয়া দে। আমাদের বিশুষ্ক কণ্ঠ রসার্দ্র হউক—আমাদের ত্রিতাপ-জ্বালা নির্ব্বাপিত হউক, ধন্য দেশ আবার ধন্য হউক।

তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা ॥৩১॥

অনুবাদ। হে মহাভাগ! আমরা সদসদ্ বিচার-জ্ঞানসম্পন্ন, তথাপি এই মোহ কেন ? আমি এবং ইনি উভয়ই বিবেকান্ধ হইয়াছি। আমাদের এই মূঢ়তার কারণ কি ?

ব্যাখ্যা। জীব সমাধি সহযোগে নিত্য পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করিতে প্রয়াসী ; কিন্তু মন সর্ব্বদা বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগজন্য পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানেই পরিতৃপ্ত। কিছুতেই তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারা যাইতেছে

না দেখিয়া, সাধক স্বকীয় অজ্ঞান-অন্ধতা, মোহমূঢ়তা, সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে ; তাই, শুদ্ধবোধরূপী গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহারই কৃপায় এই মূঢ়তা বিদূরিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে।

যতদিন এই মোহ জিনিষটা ধরা না পড়ে, ততদিন প্রকৃত অভাব যে কি তাহা সাধক বুঝিতে পারে না। শাস্ত্রে আছে, "তেষাং মোহঃ পাপীয়ান্ নামূঢ়স্যেতরোৎপত্তেঃ।" কাম ক্রোধাদি রিপুগণের মধ্যে মোহই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপ ; কারণ, যে ব্যক্তি অমূঢ় অর্থাৎ মোহাচ্ছন্ন নয়, তাহাকে অন্য রিপুগুলি আক্রমণ করিতে পারে না। "মোহ" শব্দ "মুহ" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। "মুহ" ধাতুর অর্থ বৈচিত্ত্য। মমত্ব অর্থাৎ আমার দেহ, আমার গেহ, ইত্যাকার জ্ঞানই মোহ। অজ্ঞান—বৈচিত্ত্য-মূলক। সাধনা-ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিয়া অনেকেই মনে করেন—স্ত্রী পুত্র সংসার কাম কাঞ্চন, এইগুলিই আমার সাধনার পক্ষে মহান্ অন্তরায়। এইগুলি হইতে দূরে থাকিতে না পারিলে মাতৃ-লাভ হইবে না ; কিন্তু একটু অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাওয়া যায়—সংসারটা কোথায়—বাহিরে না অন্তরে ? বাসনার কেন্দ্র কত-দূরে অবস্থিত ? ক্রমে যত অন্তর্দৃষ্টি খুলিতে থাকে, ততই বুঝিতে পারে, মায়ার কেন্দ্র যে আমার অন্তর হইতে অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। সে মূল উৎপাটন করিতে গেলে, আমিও যে থাকে না ! অথচ আমরা চাই—"আমিটি থাকুক, আমারটা ধ্বংস হউক !" কিন্তু "আমার ধ'রে টান দিলে, আমি পর্য্যন্ত উপ্‌ড়ে আসে যে !" তখন আর উপায় নাই—সমগ্র সাধনশক্তি, যোগশক্তি, তপস্যা-বল, যত কিছু উপায় সমস্ত প্রয়োগ করিয়াও ইহার বিহিত বিধান করিবার ক্ষমতা থাকে না। সে যে অসহনীয় যাতনা। জীব চায়—পরমাত্ম-সমুদ্রে চিরনিমগ্ন হইতে ; কিন্তু দেহাত্মবোধ তাহাকে জোর করিয়া নিম্নাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে। যাঁহারা চিৎক্ষেত্রের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারাই এ যাতনার সম্যক্ অনুভব করিয়াছেন। তাই শুনিতে পাই—গাজিপুরের পওহারী বাবা দেহটী পর্য্যন্ত "ব্রহ্মার্পণং" করিয়া, এই যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব এই যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই কি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন? মহারাষ্ট্রীয় সিদ্ধ মহাপুরুষ তুকারাম বোধ হয় এই পরিচ্ছিন্নতার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্যই ইন্দ্রায়ণী-নদী নীরে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। আরে, মনে কর না—সম্মুখে অমৃতের সমুদ্র; ইচ্ছা করিলেই চিরনিমগ্ন হইয়া চিরশান্তি লাভ করা যায়; অথচ কি অজেয় মোহ—অনন্ত জীবনের কর্ম্ম-সংস্কার-শ্রেণী পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে টানিয়া নিয়া আসে। এরূপ অবস্থায় দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাব স্বতঃই উপস্থিত হয় না কি?

একমাত্র গুরুকৃপায় ঐ পরিচ্ছিন্নতার প্রতি বিদ্বেষ বিদূরিত হয়। যখন জীব নিজেকে বিবেকান্ধ মূঢ় বলিয়া সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারে, তখন কোন চক্ষুষ্মান্ জ্ঞানীর চরণে আত্ম-সমর্পণ করাই উহার একমাত্র প্রতীকার। তিনি ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিবেন যে, ঐ পরিচ্ছিন্নতার প্রতি বিদ্বেষ বা আসক্তিরূপ যে মোহ, উহাও মায়েরই অঙ্গ-ভূষণ। মা আমার লীলা-কৈবল্য বশতঃ এই অনুরাগ ও বিদ্বেষের আকারে প্রকাশ পাইতেছেন, ইহা অনুভব করিতে পারিলেই এই মোহ বিদূরিত হয়; কিন্তু শান্তভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, অধীর হইলে চলিবে না। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে—'শান্ত উপাসীত'। বড় সুন্দর উপাদেয় উপদেশ। জীবত্বের বন্ধন হইতে চির বিমুক্তি, ইহা অতি দূরের কথা—উচ্চস্তরীয় জ্ঞানলভ্য। ধীর-স্থিরভাবে গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে অগ্রসর হইতে হয়। অধীর হইলে উপাসনা চলে না। সর্ব্বদা মনে রাখিবে—একদিনে মোহ কাটে না! পুনঃপুনঃ অনুশীলনরূপ অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের ফলে ধীরে ধীরে মোহ বিদূরিত হয়।

এই মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই—সুরথ ও সমাধি উভয়েই গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাদিগকে বিবেকান্ধ এবং মূঢ় বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। উহাই প্রয়োজন। যত বড় জ্ঞানী, যত বড় আভিজাত্যবিশিষ্ট হউন না কেন, গুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে হয়—"আমি অজ্ঞানান্ধ মূঢ় বালক, আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত

করুন।” এইরূপ ভাব প্রাণে প্রাণে পোষণ না করিলে, যথার্থ গুরু-কৃপা লাভ হয় না। গীতায় উক্ত হইয়াছে—“তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।” তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ তোমায় জ্ঞানের উপদেশ করিবেন, তুমি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন এবং সেবাদ্বারা তাহা গ্রহণ করিবে। প্রণিপাত শব্দে কেবল কায়িক বাচিক ও মানসিক প্রণামমাত্র নহে। প্রণিপাত তখনই পূর্ণাঙ্গ হইবে, যখন তুমি স্বকীয় অহংজ্ঞানকে অম্লানবদনে বিনা বিচারে গুরুর চরণে প্রকৃষ্টরূপে নিপাতিত করিতে পারিবে। আমি যাহা বুঝিয়াছি বা জানি, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর, সে জ্ঞান আমার প্রাণে যথার্থ শান্তি আনিতে পারে না; সুতরাং তত্ত্বদর্শী গুরু আপনি আমায় এমন জ্ঞান উপদেশ করুন, যাহাতে শোক ও মোহের পরপারে উপনীত হইতে পারি! এইরূপ সরল ভাব অন্তরে পরিপোষণ করার নামই যথার্থ প্রণিপাত।

সুরথ ও সমাধি এখনও পর্য্যন্ত ততটা প্রণিপাত করিতে সমর্থ হন নাই; কারণ, তাঁহারা বলিলেন—“জ্ঞানিনোরপি।” “আমরা বুঝি কিন্তু পারিনা।” এই কথাটীর মধ্যেও জ্ঞানের অহংকার বিদ্যমান রহিয়াছে! তাই, মহর্ষি প্রথমেই সেই অহঙ্কার সমূলে উন্মূলিত করিবার জন্য যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, তাহা অতি সুন্দর ও অপূর্ব্ব। “বুঝি কিন্তু পারি না।” কথাটাই ভূল। বুঝিলে নিশ্চয়ই পারা যায়। ‘পারি না’ কথাটীর দ্বারা বেশ প্রতীতি হয়—ঠিক বোঝা হয় নাই। আরে, যে যথার্থ বুঝিতে পারে যে, সংসারসংস্কারশ্রেণী আমার—আত্মার স্বরূপ নহে, সে কি আর তাহাতে মুগ্ধ হয়? আসল কথা ঐ বোঝাটিই বাকী। ঐটি শ্রীগুরুর কৃপা ব্যতীত হয় না। ধ্রুব প্রহ্লাদকে, এমন কি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও গুরুকরণ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সরলপ্রাণে প্রণিপাত অভ্যাস কর, গুরুর চরণে শরণাগত হও, নিজেকে বিবেকান্ধ মূঢ় বলিয়া পূর্ণ-ভাবে উপলব্ধি কর, গুরু নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। তুমি ধন্য হইবে! জগৎ পবিত্র হইবে!

ঋষিরুবাচ

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্॥৩১॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—হে মহাভাগ। সমস্ত প্রাণীরই জ্ঞান আছে; কিন্তু উহা বিষয়গোচরমাত্র, এবং বিষয় সকলও পৃথক্ পৃথক্ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। সুরথ ও সমাধি যে তত্ত্বজ্ঞানের সমীপস্থ হইয়াছে, এই অপূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞান ঋষি ব্যতীত অন্য কেহ উন্মেষিত করিতে পারেন না। সত্যদর্শী ঋষিগণই প্রত্যক্ষবৎ জ্ঞানসাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। "ঋষ্" ধাতুর অর্থ গতি। যাঁহারা পরমাত্মক্ষেত্রে নিত্য-বিচরণশীল তাঁহারাই ঋষি, তাঁহারাই সত্যদর্শী, তাঁহারাই মন্ত্রদ্রষ্টা। সত্যস্থ হইয়া তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল। উহা অধ্যয়ন কিংবা উপদেশজনিত জ্ঞান নহে। তাঁহাদের সেই ধর্ম্মবাণীসমূহই মন্ত্র বা বেদ। উহা পুনঃ পুনঃ মনন করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ইহা ধ্রুব সত্য। যদিও দেশ হইতে বহুদিন "ঋষি" শব্দটি পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তথাপি ভারতবর্ষ এখনও ঋষিশূন্য হয় নাই। এখনও স্বয়ং ভগবান্ ঋষিরূপে জগজ্জীবের পরম কল্যাণের নিমিত্ত সত্যের বিজয় বৈজয়ন্তী বহন করিতেছেন। অন্বেষণ আসিলে নিশ্চয়ই মিলিবে। ঋষির অভাব হয় নাই, পিপাসার অভাব হইয়াছে। ওরে, ঋষি শব্দটি দুই চারিবার উচ্চারণ করিলেও মন পবিত্র হয়! সে স্থানের বায়ু ব্যোম পর্য্যন্ত পূত হইয়া যায়; এমনি জিনিষ ঋষি! ঋষি মায়ের বড় আদরের ছেলে। ঋষি সদানন্দময় মহাপুরুষ। ঋষি ব্রহ্মলিপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ। বাহ্য লক্ষণে ঋষি চেনা বড় কঠিন। কাহাকেও আত্মপরিচয় দিবার জন্য তাঁহারা কোনওরূপ মিথ্যা-আড়ম্বর লইয়া থাকেন না।

সে যাহা হউক, ঋষি বলিলেন—সকল প্রাণীর জ্ঞান আছে; কিন্তু ঐ জ্ঞান বিষয়গোচর। "বিষয়" শব্দের অর্থ—রূপরসাদি। "গো" শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় এবং "চর" ধাতুর অর্থ বিচরণ। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়-পথে

বিচরণ করিয়া বিষয়াকারে প্রকটিত হয়, তাহাকেই বিষয়গোচর জ্ঞান কহে। বৎস সুরথ! তুমি যে নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেছ, ঐরূপ জ্ঞান প্রাণিমাত্রেরই আছে। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি-বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ। ঐ সকল জ্ঞান যেরূপ বিষয় ও ইন্দ্রিয়-সংযোগে প্রকাশ পায়, তোমার যে রাজ্যাদিবিষয়ক জ্ঞান কিংবা সমাধির যে স্ত্রী পুত্রাদিবিষয়ক জ্ঞান, উহাও সেইরূপ বিষয়গোচর জ্ঞানমাত্র। যে জ্ঞান লাভ করিলে নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করা যায়, সেই গোচরাতীত জ্ঞানের সন্ধান না পাইয়াও, আপনাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করিতেছে; উহা অজ্ঞানমাত্র।

এইবার আমরা সর্ব্বপ্রাণিসাধারণে যে জ্ঞান বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ জ্ঞানের স্বরূপ কি, তাহার আলোচনা করিব। দেখ, জীবগণ এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটী অবস্থা ভোগ করে। প্রথমে জাগ্রত অবস্থা ধর—এই অবস্থাটী কতকগুলি বিশিষ্ট-জ্ঞানের সমষ্টিমাত্র। দর্শন শ্রবণ আহার বিহার অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি যাহা কিছু জাগ্রতকালে অনুষ্ঠিত হয়, সে সকলই জ্ঞানমাত্র। রূপবিষয়ক জ্ঞান, রসবিষয়ক জ্ঞান, স্পর্শবিষয়ক জ্ঞান ইত্যাদি। একই জ্ঞান কতকগুলি বিশেষণযুক্ত হইয়া বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। ঐ বিশেষণ-অংশ পরিত্যাগ করিলে, যে অখণ্ড শুদ্ধ জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, তাহাই জাগ্রতকালে জ্ঞানের স্বরূপ। এইরূপ স্বপ্নাবস্থায়। তখন মাত্র অন্তঃকরণচতুষ্টয় ক্রিয়াশীল থাকে। সে অবস্থায়ও দর্শনাদি ব্যাপার জাগ্রতবৎ বিদ্যমান থাকে; সুতরাং রূপ রসাদি বিশেষণবিশিষ্ট হইয়াই জ্ঞান প্রকাশ পায়। ঐ বিশেষণ-অংশ পরিত্যাগ করিলে, বিশুদ্ধ অখণ্ড জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ পায়। তারপর সুষুপ্তি-অবস্থা। এই অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণের সহিত লয়প্রাপ্ত হয়, কোনরূপ জ্ঞানের প্রকাশ থাকে না বটে; কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গে এরূপ প্রতীতি হয় যে, "আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, এত ঘটনা হইয়া গেল, কিছুই ত' জানি না।" এই যে জানিনা বা অজ্ঞান, ইহাও একপ্রকার জ্ঞান। সুষুপ্ত অবস্থায়

ঐ অজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান বিদ্যমান থাকে বলিয়াই, জাগ্রৎকালে তাহার স্মৃতি হয়। পূর্ব্বে যাহা কখনও অনুভূত হয় নাই, তাহার স্মৃতি অসম্ভব, সুতরাং বুঝিতে পারা গেল—ত্রিবিধ অবস্থায়ই জীব জ্ঞানে অবস্থিত। জ্ঞানের অভাব কখনই হয় না। দিন সপ্তাহ পক্ষ মাস বৎসর যুগ জন্মজন্মান্তর ধরিয়া জীবসমূহ এই এক অখণ্ড জ্ঞানে অবস্থিত। তাই মহর্ষি বলিলেন "জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোঃ"। কিন্তু এই জ্ঞান বিষয়গোচর, অর্থাৎ বিশেষণযুক্ত বা বিশিষ্ট হইয়াই এই জ্ঞান প্রকাশ পায়। ঘটবিষয়ক জ্ঞান, পটবিষয়ক জ্ঞান, পুত্রবিষয়ক জ্ঞান ইত্যাদি আকারে আকারিত হইয়া দিবারাত্র একই জ্ঞান বিভিন্নভাবে উপলব্ধ হয়। জ্ঞানের এই বিশিষ্টভাবে প্রকাশের নামই বিষয়গোচর জ্ঞান।

আচ্ছা, একবার ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থায় জ্ঞানের উপরে ঐ যে বিশেষণ অংশ দেখিতে পাও, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া, যে অখণ্ড একরস জ্ঞানের সন্ধান পাইলে তাহা তোমারই ত'! না অন্যের নিকট হইতে ধার করা? তোমারই। তোমার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ একটি অখণ্ড জ্ঞান নানাভাবে বিশেষিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। কখনও কামিনী কাঞ্চন, কখনও বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ; অর্থাৎ ভোগ এবং অপবর্গ ঐ একই জ্ঞানের বিভিন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। এইরূপ অনাদি জন্ম মৃত্যু ঐ জ্ঞানের অঙ্কেই সংঘটিত হইতেছে। জ্ঞান-বক্ষে তুমি জাত, অবস্থিত এবং মৃত।

গীতায় উক্ত হইয়াছে, "জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিং ন চিরেণাধিগচ্ছতি"। জ্ঞানলাভ করিলে অচিরে শান্তিলাভ হয়। জ্ঞানেই প্রকৃত শান্তি। জ্ঞানেই সর্ব্বকর্ম্মের অবসান। জ্ঞানই অমৃত। জ্ঞানলাভ করিলেই যাবতীয় ভয় বিদূরিত হয়। এইবার বুঝিতে পারিলে—কোন্ জ্ঞান লাভ করিলে শান্তিলাভ হয়, সর্ব্বকর্ম্মের অবসান হয়? বেদান্তশাস্ত্র জ্ঞানকেই যে মুক্তির কারণ বলেন, এইবার বুঝিতে পারিলে, উহা কোন্ জ্ঞান? ঐ সর্ব্বজীবে প্রতিনিয়ত উপলব্ধ যে

জ্ঞান, উহা সেই জ্ঞান ; উপদেশ বা অধ্যয়নজন্য জ্ঞান নহে। উহা সর্ব্বজীবে সমভাবে অবস্থিত ; সুতরাং অতিবড় মূর্খ, অতিবড় দুরাচার ব্যক্তিও ইচ্ছা করিলে এই জ্ঞানকে লাভ করিতে পারে। ইহারই নাম প্রজ্ঞান বা ব্রহ্ম। ইহা যতদিন শুধু বাচনিক জ্ঞানে পর্য্যবসিত থাকে, ততদিন বিশেষ কিছুই লাভ হয় না ; এই জ্ঞান অতি প্রত্যক্ষ। এই জ্ঞানের উদয়ে জগৎসত্তা বিলুপ্ত হয়, তাই আচার্য শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন। এ জ্ঞান এত ঘন যে, প্রস্তরও ইহার নিকটে পরাজিত হয়। এ বিষয়ে একটী আত্ম-সম্বেদন আছে—"আকাশাদপি তৎ সূক্ষ্মং ঘনং তৎ সৈন্ধবাদপি ! শৈলাদপ্যচলং বিদ্যাৎ চিন্মাত্রং পূর্ণমদ্বয়ম্॥" এই জ্ঞান একটী তত্ত্বমাত্র নহে, উহার ব্যক্তিত্ব আছে। উনি একজন। উহাকে ভালবাসিতে হইবে, সেবা করিতে হইবে, আত্মপ্রাণ নিবেদন করিতে হইবে, তবে উনি—"সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্। অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নিগু´ণং গুণভোক্তৃ চ" এই মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইবেন। তখন তুমি দেখিতে পাইবে—"অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা তমাহুরাদ্যং পুরুষং প্রধানম্" রূপে সর্ব্বভূতমহেশ্বর-মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমাকে চরিতার্থ করিয়া দিবেন। ওরে, সত্যই এই জ্ঞানকে ধরা যায়। মানুষমাত্রেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে ! ইহা শুধু ভাষার ঝঙ্কার নহে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলেই এই জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে ; সুতরাং জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সকলেই এই জ্ঞানের সাধনা করে ; কিন্তু—ঐ বিষয়গোচর ! যতদিন জগতের ধূলি বা জ্ঞানের পরিচ্ছিন্নতামাত্র প্রিয়তম বোধ করে, ততদিন ঐ জ্ঞান বিষয় ও ইন্দ্রিয়সংযোগ-নিবন্ধন খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ পায়।

অসংখ্যভাবে, অসংখ্য বিশেষণে ঐ জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইলেও, উহার শ্রেণীবিভাগ করিলে, মাত্র পাঁচটী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পঞ্চবিধ জ্ঞানতরঙ্গ প্রতিনিয়ত প্রত্যেক জীবের অন্তরে প্রকাশ ও লয় পাইতেছে। এইবার বোঝ, একটী অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্র তাহাতে অসংখ্যতরঙ্গ, ঐ তরঙ্গগুলি ধরিবার জন্য আমাদের

পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে। এই জ্ঞানেরই নাম গুরু বা শিব। স্থূলমূর্ত্তি গুরু এই জ্ঞানেরই ঘনীভূত প্রত্যক্ষ বিকাশ। পাঁচ প্রকারে জ্ঞান প্রকাশ পায় বলিয়া, শিবের পঞ্চ বদন। এখানে বলিয়া রাখি—কেহ মনে করিও না, শিবনামে পঞ্চবদন কোন দেবতা নাই। এই জ্ঞানের সাধনা করিলে এবং বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইবার জন্য ভক্তের প্রাণে কাতর প্রার্থনা উপস্থিত হইলে, ভক্তির প্রবলহিমে ঘনীভূত হইয়া ঐ অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্র হইতে রজতগিরিনিভ শুভ্র, নিখিলভয়হর, আশুতোষ পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনেত্র, বরদমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া দয়ার পরাকাষ্ঠায় সাধকের অজ্ঞানান্ধ নয়ন চিরতরে উন্মীলিত করিয়া দেন।

এই জ্ঞানেরই অন্য নাম চিৎ। প্রতিমুহূর্ত্তেই ত' আমরা ইহাকে —আমাদের চিন্ময়ী মাকে, আমাদের অজ্ঞানান্ধ-নেত্র-উন্মীলনকারী গুরুকে পাইতেছি। প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে, প্রতি ইন্দ্রিয়সঞ্চালনে, তাঁহাকে গ্রহণ করিতেছি ; কিন্তু কই, একদিনও কি তাঁহাকে মা বলিয়া আদর করিয়াছি ? ওগো, তুমি আমার সর্ব্বস্ব, ওগো, তুমি না থাকিলে যে আমার কিছু থাকে না ! তুমি একটু দাঁড়াও, একটা অবজ্ঞার প্রণাম নিয়া যাও বলিয়া কি একদিনও ঠিক ঠিক বলিয়াছি যে তাঁহাকে পাইব ! তিনি আসেন, প্রতি পাদক্ষেপে তাঁহার আবির্ভাব হয় রে ! কিন্তু আমরা তাঁহাকে আদর করি না। তিনি উপেক্ষিত হইয়া কুটিল কটাক্ষে চলিয়া যান, আবার স্নেহের পীড়নে বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসেন, আবার অনাদৃত হইয়া চলিয়া যান। এইরূপ কত যুগ যুগান্তর চলিয়াছে। এখন মানুষ হইয়া ইহা বুঝিতে পারিয়াছ, এখনও কি তাঁহাকে অনাদর করিবে ! একবার ইন্দ্রিয়দ্বারে অপেক্ষা কর, তাঁকে ধরিব বলিয়া অপেক্ষায় বসিয়া থাক। জানি বহুবার বিফল হইবে ; কিন্তু ঐ বিফলতাই তোমাকে সফলতা আনিয়া দিবে। তাঁহার ত আর আসিবার বিরাম নাই ! অহর্নিশ আসেন, অহর্নিশ চলিয়া যান। একবার নিশ্চয়ই তাঁহাকে ধরিতে পারিবে। যদি না পার তাঁহার আগম-নির্গম অনুভব করিয়া ইন্দ্রিয়পথে বসিয়া কাঁদ। এই পথে তিনি আসেন, এই পথে তিনি চলিয়া যান। না-ই বা তাঁহাকে

দেখিলে, তাঁহার যাতায়াতের পথ তাঁহারই চরণধূলায় পবিত্রীকৃত। ঐখানে বসিয়া কাঁদ, ঐ পথের ধূলা গায়ে মাখ—জীবন ধন্য হইবে! তিনি দেখা দিবেন।

সুরথ একটু জ্ঞানের গর্ব্ব করিয়াছিল, তাই মহর্ষি প্রথমে একটী কথাতেই তাহার সে গর্ব্ব বিদূরিত করিয়া, যে মহান্ তত্ত্ব সম্মুখে ধরিলেন, তাহাতে সুরথ ও সমাধি ধন্য হইয়াছিল। বহু যুগ যুগান্তর পরে, তাহার একবিন্দু আস্বাদ লইয়া আমরাও ধন্য হইতেছি। সে যাহা হউক, জীব সাধারণতঃ এই বিষয়গোচর জ্ঞানেই বিচরণ করে। যতদিন এই সহজ অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধান না পায়, ততদিন সে যত বড় বিদ্বান্, যত বড় তপস্বী, যত বড় যোগী, যত বড় শক্তিশালী হউক না কেন, সে অজ্ঞান শিশু। এই এক অখণ্ড জ্ঞান ব্যতীত যত জ্ঞান, উহা বিশেষ জ্ঞান বা জ্ঞানাভাসমাত্র। সমুদ্র ও তরঙ্গে যে প্রভেদ, জ্ঞান ও বিশিষ্ট-জ্ঞানে সেই প্রভেদ। যতদিন উহার লাভ না হয়, ততদিন মনুষ্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সাধারণ প্রাণী অপেক্ষা বিশেষ শ্রেয়ান্ নহে। এই কথাটী বুঝাইবার জন্যই মহর্ষি "সমস্তস্য জন্তোঃ" শব্দটীর প্রয়োগ করিলেন।

এই অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গসমূহই বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন বিষয়রূপে প্রতিভাত। তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈব পৃথক্ পৃথক্।" বিষয় কি? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। "ষিঞ্" ধাতুর অর্থ বন্ধন। বিশেষরূপে বন্ধন করে বলিয়াই ইহার নাম বিষয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটী বিষয়। পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ইহারা গৃহীত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—জ্ঞান অখণ্ড। এই অখণ্ড বস্তুর পঞ্চবিধ ভেদ কিরূপে হয়? সমুদ্রে যতই তরঙ্গ উঠুক না কেন, সকলই যেরূপ জলরূপে প্রতীত হয়, ঠিক সেইরূপ জ্ঞানসমুদ্রের যে পাঁচ প্রকার তরঙ্গ-বিভাগ আছে, তাহাও জ্ঞানের আকারেই প্রতীয়মান হওয়া উচিত; অথচ তাহা না হইয়া, রূপ রসাদি আকারে তাহার উপলব্ধি হয় কেন? জ্ঞানরূপে অর্থাৎ রূপবিষয়ক জ্ঞান, রসবিষয়ক জ্ঞান ইত্যাদিরূপে

প্রতীতিযোগ্য হয় না কেন ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হয়—যদিও এরূপ প্রতীতিই যথার্থ, তথাপি জ্ঞান সাধারণতঃ রূপ-রসাদি-রূপেই গৃহীত হয়; কারণ, জ্ঞানরূপ বিশেষ্য-অংশ তিরস্কৃত বা আচ্ছাদিত থাকে; মাত্র বিশেষণ অংশটী সর্ব্বজীবে সাধারণভাবে প্রতীত হয়। ইহারই বা কারণ কি ? আমি চাহিয়াছি। একদিন আনন্দের উচ্ছ্বাসে বহুত্বের ক্রীড়া করিব বলিয়া অভিলাষ করিয়াছিলাম, সেইজন্যই জ্ঞান অখণ্ড এবং একরসস্বরূপ হইয়াও, বহু আকারে আমার প্রতীতিযোগ্য হইতেছে। যতদিন বহু চাহিব, ততদিন ইহা এক হইয়াও বহু নামে, বহু রূপে, বহু ব্যবহারে আমার বহুত্বের সাধ মিটাইবে। যে দিন বলিব—আর বহুত্ব চাই না মা, এক হও, এক কর! এই কথাটা যে দিন সত্য সত্য প্রাণের অন্তস্তল হইতে বলিয়া উঠিব, সেই দিন হইতেই ইনি আমার নিকট একরূপেই বিরাজ করিবেন। একই শর্করাদি-নির্ম্মিত সন্দেশ বিভিন্ন ছাঁচে প্রস্তুত হইয়া কোনটা আতা-সন্দেশ, কোনটা আম-সন্দেশ, কোনটা বা বর্ত্তুলাকার, কোনটা বা চতুষ্কোণ ইত্যাদি বহু নামে ও বহু আকারে পরিচিত হয়। অল্পবয়স্ক বালক বলে—আমি আতা-সন্দেশ চাই না, আম-সন্দেশটী চাই। তাহার চক্ষে শুধু ঐ আকৃতিগত বৈচিত্র্যই প্রীতি বা অপ্রীতির বিষয় হয়; কিন্তু বর্ষীয়ান্ ব্যক্তি উহাদের আকৃতিগত বহুত্বের মধ্যে একই জিনিব দেখিতে পায়। গঠনবৈচিত্র্য তাহার প্রীতির বা অপ্রীতির বিষয় হয় না। এইরূপ এক অখণ্ড জ্ঞানই সর্ব্বজীবে সাধারণভাবে অবস্থিত; তথাপি অজ্ঞানপ্রভাবে সংস্কারগত বৈচিত্র্যবশতঃ উহা বিভিন্নভাবে পরিগৃহীত হয়।

শোন, একমাত্র বিষ্ণুর পরম পদ সর্বত্র অবস্থিত, তাহা হইতে বিভিন্ন স্পন্দনসমূহ ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া জীবের সংস্কারপুঞ্জে উপস্থিত হয় এবং তৎসমজাতীয় সংস্কারকে উদ্‌বুদ্ধ করে। ইহাই পরমপদের অর্থ বা পদার্থ। সংস্কার বিষয় আকারে বাহিরে প্রকাশ পায়। পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম জগৎ বাহিরে নহে, আমারই জ্ঞানে অবস্থিত। আমারই জ্ঞান জগদাকারে আকারিত হইয়া রহিয়াছে। যে শক্তিপ্রভাবে ঐ

অখণ্ড জ্ঞান খণ্ড খণ্ড হয়—বিষয়ের আকারে প্রকাশ পায়, তাহাই এই চণ্ডীতে মহামায়ারূপে ব্যাখ্যাত। সাধক রামপ্রসাদও গাহিয়াছেন—"জ্ঞানসমুদ্রের মাঝে রে মন শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।" যখন গুরুকৃপায় জীবের তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়—বিষয় বলিয়া পৃথক কিছু নাই, একটী শক্তিই বিভিন্ন বিষয়-আকারে প্রকাশ পাইতেছে। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, পরিদৃশ্যমান এ জগৎ একটি শক্তিমাত্র। প্রত্যেক পরমাণুই শক্তি। বিষয়সমূহ যে শক্তিমাত্র, ইহা আধুনিক জড় বিজ্ঞানেও প্রমাণীকৃত হইতেছে। যতদিন জীব শিশু থাকে ঐ অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধান না পায়, ততদিনই শক্তিরূপিণী মহামায়া মা আমার একই জ্ঞানকে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন রসে আস্বাদিত করাইয়া থাকেন। একই জ্ঞান বিভিন্ন জীবনে বিভিন্ন রসময় করিয়া আমাদের মুখরোচক করাইয়া থাকেন। সে যাহা হউক, মনে রাখিও—একই জ্ঞান এবং বহু বৈচিত্র্যকারিণী বিষয়-আকারে প্রকটিতা মহাশক্তি, ইহাই মূল তত্ত্ব। এই জ্ঞান এবং শক্তি বস্তুতঃ অভিন্ন, ইহাও পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, পরে আরও বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে।

দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিৎ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥৩৩॥

অনুবাদ। কতিপয় প্রাণী দিবান্ধ, কোন কোন প্রাণী রাত্র্যন্ধ, আবার কতকগুলি দিবারাত্র উভয়ত্র তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জ্ঞান অভিন্ন হইলেও বিষয়গোচর-হেতু উহা বহুরূপে প্রকাশ পায়; সুতরাং বিষয়সমূহও পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রতীতিযোগ্য হয়। এক্ষণে এই বিষয়ভোগ বা অনুভূতিগত বিভিন্নতা পরিব্যক্ত হইতেছে। কতিপয় প্রাণী (প্রাণী শব্দে এখানে আমরা মানবই বুঝিব) দিবান্ধ। দিবা শব্দের অর্থ প্রকাশাত্মক বস্তু—জ্ঞান, তাহাতে অন্ধ—দেখিতে পায় না। একমাত্র জ্ঞানই যে বিষয়রূপে

প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহারা দেখিতে পায়—রূপ রসাদি বিষয় বা জগৎ। উহা যে জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নহে, শত সহস্রবার বুঝাইয়া দিলেও তাহারা উহা গ্রহণ করিতে পারে না। এইটী সাধারণ জীব জগতের অবস্থা।

দ্বিতীয় এক শ্রেণী আছেন, তাঁহারা রাত্রিতে অন্ধ, অর্থাৎ দিবায় দেখিতে পান। এই শ্রেণী জগৎ-মিথ্যাবাদী নামে অভিহিত। যেহেতু ইহারা সত্য পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বেই মুখে বলেন—অখণ্ডজ্ঞানসমুদ্রে তরঙ্গরূপে ঐ যে বিষয়রূপিণী মহাশক্তি প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, উহা ভ্রান্তি বা মিথ্যা; সুতরাং দর্শনের অযোগ্য। ফলে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ-অংশ তাঁহাদের নিকট রাত্রিতুল্য অর্থাৎ অজ্ঞাতই থাকে। বিশেষ কথা এই যে, ইঁহারা জগৎকে মিথ্যা বলিতে গিয়া কার্য্যতঃ জগদীশ্বরকেও মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। অথচ স্বয়ং কিন্তু সতত জগৎজ্ঞানেই বিচরণ করিতে বাধ্য হন। ইহারাই বাস্তবিক রাত্র্যন্ধ।

তৃতীয় আর এক শ্রেণী আছেন, তাঁহারা উভয়ত্র তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন। ইঁহারা সত্যদর্শী, ঋষি নামে অভিহিত। চিৎ অচিৎ, সৎ অসৎ, জ্ঞান অজ্ঞান, জ্ঞাতা জ্ঞেয় সর্ব্বত্র এক অখণ্ড পরমাত্মসত্তা-দর্শনেই তাঁহারা অভ্যস্ত। তাই, ইঁহারা দিবারাত্র উভয়ত্র অভেদদর্শী, তুল্যদর্শী। অজ্ঞান যে জ্ঞানেরই এক প্রকার প্রকাশ, তাঁহারা ইহার উপলব্ধি করিতে পারেন। এক অখণ্ড জ্ঞানই যে অখণ্ড শক্তিময় এবং সেই অখণ্ড শক্তি যে আনন্দলীলার নাম-রূপ ব্যবহারাত্মকর বিষয়ের আকারে জীবজগৎরূপে প্রতিভাত, ইহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ঋষিগণ এই সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য তত্ত্বে নিয়ত অবস্থিত; সুতরাং দিবা রাত্রি অর্থাৎ জ্ঞান অজ্ঞান, প্রকাশ অপ্রকাশ, উভয়ত্রই ইহারা তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন।

গীতায়ও ঠিক এই ভাবের একটী শ্লোক আছে—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥" যাহা সর্ব্বভূতের পক্ষে নিশা অর্থাৎ অপ্রকাশ, সংযমী সাধক

সেই আত্মজ্ঞানরূপ নিত্যপ্রকাশাত্মক বস্তুতে সর্ব্বদা জাগ্রত। তাঁহারা সর্ব্বদাই জ্ঞানে বিচরণ করেন। আর সমস্ত প্রাণী যে বিষয়জ্ঞানরূপ পরিচ্ছিন্নতায় বিচরণ করে, সত্যদর্শী সাধকের পক্ষে তাহাই নিশা অর্থাৎ অদৃশ্য। যেহেতু সাধারণ মানবের মত তাঁহারা বিষয়কে বিষয়-মাত্ররূপে গ্রহণ করেন না। "আত্মা—জ্ঞানরূপিণী মা আমার বিষয়-আকারে স্বেচ্ছায় প্রকাশিত," এইরূপ দর্শনেই তাঁহারা অভ্যস্ত। কিঞ্চ যাঁহারা জগৎকে মিথ্যা বলেন, তাঁহারাও যথার্থ-বাদী ; ঐ উক্তিও সম্পূর্ণ সত্য ; যেহেতু জগৎকে মাত্র জগৎরূপে দর্শনের নামই মিথ্যা-দর্শন। ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতিভাত, এই দর্শনই সত্যদর্শন! কিন্তু কেহ কেহ শাস্ত্রের নানারূপ কূটার্থ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানকে একটী নীরস কিম্ভূত কিমাকার পদার্থ করিয়া তুলেন। ওরে, যে ব্রহ্মশব্দ স্মরণমাত্র শরীর পুলকিত হয়, ইন্দ্রিয়সকল স্তব্ধ হয়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়, চক্ষু শব-চক্ষুবৎ নিষ্প্রভ হয়, নেত্রপ্রান্তে বিন্দু বিন্দু আনন্দাশ্রু পরিলক্ষিত হয়, আরও কত কি বহির্লক্ষণ প্রকাশ পায় ; সেই ব্রহ্ম পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দ এখন মুখে মুখে এত অবজ্ঞাত হইতেছে যে, তাহা দেখিলে যথার্থই মর্ম্মপীড়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সে অন্য কথা :—

মা যেরূপ জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম বা ক্ষর, অক্ষর ও পুরুষোত্তম, এই ত্রিবিধ আকারে আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিয়াছেন, তাঁহার দর্শনও সেইরূপ তিন ভাবে পরিব্যক্ত। এইরূপ দর্শন অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং অনন্তকাল চলিবে। এই ত্রিবিধ দর্শীর মধ্যে কাহারও দর্শনে ভ্রম নাই—কাহারও নেত্রপীড়া জন্মায় নাই যে তিনি ভ্রান্তি দেখিবেন। ভ্রান্তি যে আমার মা। তাই বলিয়াছিলাম, সকলেই সত্যদর্শী। যাহারা বিষয়মাত্রদর্শী জ্ঞানে অন্ধ, তাহারাই দিবান্ধ ; তাহাদের নিকট মা আমার সেই রূপেই প্রকাশমানা। যাঁহারা জ্ঞানমাত্র দর্শন করেন, বিষয়কে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহারা রাত্র্যন্ধ ; তাঁহাদের নিকট মা আমার সেইভাবেই প্রকটিতা। আর তৃতীয়—যাঁহারা সর্ব্বত্র সত্যদর্শন করেন—জ্ঞান অজ্ঞান উভয়ই যাঁহাদের নিকট তুল্যভাবে ব্রহ্মসত্তার অববোধক, মা আমার

তাঁহাদের নিকট সেইরূপ ভাবেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। জীবের ক্রমগতিও ঠিক এই-রূপেই হইয়া থাকে। প্রথমে বহুত্বপ্রিয় জীব বিষয়মাত্রদর্শনে পরিতৃপ্ত থাকে, জগৎ-ধূলি গায়ে মাখিয়াই আনন্দ পায়। তারপর বিষয়কে দূর করিয়া দিয়া, মাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্য-সত্তা গ্রহণে উদ্যত হয়। ইহা জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর। অবশেষে যখন যথার্থ জ্ঞানলাভ হয়, তখন দেখে—সবই এক—সবই মধু। কিছুই ত্যাজ্য নহে, কিছুই গ্রাহ্য নহে। ত্যাগ ও গ্রহণ বলিয়া কিছুই নাই। আমারই অনন্ত আনন্দময় সত্তা সর্ব্বত্র পূর্ণভাবে বিরাজিত।

মা আমার সচ্চিদানন্দময়ী। তাঁহার সৎস্বরূপটী বিশেষভাবে প্রকটিত করিবার জন্যই তিনি জড়-আকারে প্রকটিতা। যতদিন জীব এই জড়ের বা মায়ের আমার ঘনীভূত সৎস্বরূপের সেবায় পরিতৃপ্ত, ততদিন সে দিবান্ধ বা প্রথম শ্রেণীর জীব। দ্বিতীয়তঃ মা আমার বিশিষ্টভাবে চিৎ স্বরূপটি প্রকটিত করিবার জন্য প্রাণিরূপে—চৈতন্য-রূপে সর্ব্বত্র বিরাজিতা। যখন জীব ঐ সৎস্বরূপটী পরিত্যাগ করিয়া, কেবল মায়ের শুদ্ধ চৈতন্যময়ী মূর্ত্তিদর্শনে অগ্রসর হয়, তখন তাহারা রাত্র্যন্ধ বা দ্বিতীয় স্তরের জীব। আর যাঁহারা মায়ের আনন্দঘন মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানে অজ্ঞানে, জড়ে চৈতন্যে, সর্ব্বত্র মায়ের সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি দর্শন করেন। ইহারাই দিবারাত্র উভয়ত্র তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন বা তৃতীয় স্তরের জীব। জীবমাত্রকে এই ত্রিবিধ দর্শনের ভিতর দিয়া ব্রহ্মত্বে উপনীত হইতে হয়। ইহার একটীকে পরিত্যাগ করিয়া অপরটীর লাভ হয় না; সুতরাং এই মন্ত্রে কাহারও নিন্দা বা প্রশংসা করা হয় নাই। পূর্ব্বমন্ত্রে যে অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই জ্ঞান কিরূপভাবে জীবজগতে প্রকটিত ও উপলব্ধিযোগ্য হয়, তাহাই এই মন্ত্রে প্রকাশ করা মহর্ষির অভিপ্রায়।

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥৩৪॥

অনুবাদ। হে সুরথ! মনুজগণ জ্ঞানী, একথা সত্য; কিন্তু কেবল তাহাদেরই যে জ্ঞান আছে, তাহা নহে; যেহেতু পশু মৃগ প্রভৃতি সকল প্রাণীরই জ্ঞান বিদ্যমান।

ব্যাখ্যা। জীবসমূহ যে জাগ্রতাদি ত্রিবিধ অবস্থায় একমাত্র জ্ঞানেই অবস্থিত, ইহা পূর্ব্বে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। ঐ জ্ঞানসত্তা যে কেবল মনুষ্যগণেরই আছে, তাহা নহে; পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিমাত্রই জ্ঞানসত্তায় সত্তাবান্। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি-ব্যপদেশে উহা বিষয়গোচররূপে প্রকটিত। এক কথায় জগৎ একমাত্র জ্ঞানেই সঞ্জাত, জ্ঞানেই অবস্থিত এবং জ্ঞানেই পুনঃ প্রলীন হয়। জ্ঞান ভিন্ন কোথাও কিছু নাই। যাহা জড়পদার্থরূপে আমাদের নিকট প্রতীয়মান উহাও জ্ঞানের ঘনীভূত অবস্থা; জ্ঞানই জগতের আকারে আকারিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। মা আমার জ্ঞানময়ী মূর্ত্তিতে সর্ব্বত্র সুপ্রকট হইলেও, পশু পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর প্রাণিগণ উহার উপলব্ধি করিতে পারে না; কারণ, উহারা এখনও তাদৃশ সমুন্নত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ইন্দ্রিয়াদি লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু মনুজসন্তানগণকে মা এমন ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, এরূপ পূর্ণকরণ-সমূহ প্রদান করিয়াছেন যে, ইচ্ছা করিলেই, সে এই চিন্ময়ী মূর্ত্তি সাক্ষাৎ করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারে। সত্যসত্যই মায়ের এই সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণ অখণ্ড জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলে, মানুষ বুঝিতে পারে—"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।" শস্ত্রসমূহ ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অনল ইহাকে ভস্ম করিতে পারে না, জল ইহাকে নষ্ট বা আর্দ্র করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে পারে না; সুতরাং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ"; আমি জন্ম-মৃত্যুর অতীত। মায়ের এই জ্ঞানময়ী মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার লাভ

করিলে, তবে এই সকল উপলব্ধি আসিতে থাকে, তৎপূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ সকল বাক্যের অর্থ-বোধই হয় না। শুধু পক্ষীর রাধাকৃষ্ণ বুলির ন্যায় মৌখিক আবৃত্তি করা হয় মাত্র। যতদিন মানুষ এই সহজ জ্ঞানলাভে বিমুখ থাকে, ততদিন সে যত বড় বিদ্বান্, যত বড় ধনী, যত বড় যশস্বীই হউক না কেন, পশুর সহিত তাহার বিশেষ পার্থক্য থাকে না ; এই কথাটী বুঝাইবার জন্যই মহর্ষি মহারাজ সুরথকে পশু পক্ষীর তুল্য জ্ঞানবানরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছেন।

জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যত্তথোভয়োঃ ॥৩৫॥

অনুবাদ। মৃগপক্ষী প্রভৃতির যেরূপ জ্ঞান, মনুষ্যদিগেরও ঠিক সেই জ্ঞান (পরিদৃষ্ট হয়)। আবার মনুষ্যগণের যেরূপ জ্ঞানপ্রিয়তা, মৃগপক্ষী প্রভৃতিরও সেইরূপ জ্ঞানপ্রিয়তা (পরিলক্ষিত হয়)। এতদ্ভিন্ন (অজ্ঞানাংশেও) উভয়ই তুল্য।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বমন্ত্রে সামান্যভাবে বলা হইয়াছে—কেবল মনুষ্যই জ্ঞানী নহে, পশু পক্ষী প্রভৃতিরও জ্ঞান আছে। এক্ষণে 'জ্ঞানঞ্চ' ইত্যাদি বাক্যে, তাহাই বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতেছেন। এই মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে মৃগপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ জাতির জ্ঞানের সহিত মনুষ্যদিগের জ্ঞানতুল্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ঐ তুল্যতা আহার নিদ্রা ভয়াদি-বিষয়ক ; কারণ পশুদিগের জ্ঞান যেরূপ কেবল আহারাদি ব্যপদেশে—পরিচ্ছিন্ন আকারেই প্রতিভাত ; সাধারণ মনুষ্যদিগের জ্ঞানও ঠিক সেইরূপ। পশুদিগের ন্যায় তাহারাও একবার আহার করে, পুনরায় আহারের চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়সমূহ অবসন্ন হইয়া পড়িলে নিদ্রিত হয়। মৃত্যু হইতে সর্ব্বদাই ভয় প্রাপ্ত হয়। নিজের মরণ স্মৃতিপথে ফুটিয়া উঠিলেই অজ্ঞাতসারে বুকের ভিতর কেমন একটা ত্রাস উপস্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন আর একটী

কার্য্য আছে—ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা। এই যে দেখিতে পাও—বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বহুল প্রচারে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার সর্ব্বদিগ্‌ব্যাপী ও বিস্ময়কর হইয়া উঠিতেছে; আর্ষ দৃষ্টিতে উহাও পশূচিত জ্ঞানরূপে প্রতীয়মান হয়। যে জ্ঞানের সীমা মাত্র ভৌতিক জগৎ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত, তাহা যতই মার্জ্জিত, সুসংস্কৃত ও অভ্যুদয়সম্পন্ন হউক না কেন, উহা অজ্ঞান নামেই অভিহিত। অজ্ঞান শব্দে জ্ঞানের অভাব অথবা জ্ঞানবিরোধী অনির্ব্বচনীয় কিছু বুঝায় না! ঈষৎভাবে প্রকটিত জ্ঞানকেই অজ্ঞান কহে। সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ পূর্ব্বকথিত সেই অখণ্ড সহজ জ্ঞান, যখন পরিচ্ছিন্নরূপে অর্থাৎ নাম ও রূপাদিবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়, তখন তাহাকেই অজ্ঞান কহে। এই অজ্ঞানে বা অল্প জ্ঞানাংশে পশু এবং মনুষ্য উভয়ই তুল্য। পশুর ইন্দ্রিয়গুলি অপূর্ণ ও সামঞ্জস্যহীন; তাই তাহাদের ভিতর দিয়া যে জ্ঞান প্রকাশ পায়, মনুষ্যের চক্ষুতে তাহা অজ্ঞান। মনুষ্যের করণবর্গ সমধিক সমুন্নত; তাই, জ্ঞানও সুসংস্কৃতভাবে প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ উভয়ত্রই গোচরজ্ঞান; সুতরাং অজ্ঞানমাত্র। এই মনুষ্যস্তর ঠিক সন্ধিস্থল। একদিকে দেবক্ষেত্র, অন্যদিকে পশুক্ষেত্র। মানুষ পূর্ণ হইলেই দেবতা এবং পশু পূর্ণ হইলেই মানুষ হয়। এই পূর্ণত্ব শুধু জ্ঞানাংশ নিয়া; তাই, নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"।

আমাদের যত দেবদেবী মূর্ত্তি আছে, তাহাদের প্রায় সকলেরই বাহনগুলি পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্য্যকজাতীয়। হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিজ্ঞানের ইহা একটী সুন্দর অপূর্ব্ব রহস্য। এস্থলে বাহনতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যে দেবশক্তি যেরূপ পশুশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত, তাহাই সেই দেবতার বাহনরূপে পরিচিত। প্রথমেই ধর, গণেশ—সিদ্ধিদাতা। তাঁহার বাহন—মূষিক। অথর্ব্বশীর্ষের সায়নভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—"মুষ্ণাতি অপহরতি কর্ম্মফলানি ইতি মূষিকঃ।" জীবের কর্ম্মফলসমূহ অজ্ঞাতসারে অপহরণ করে বলিয়া ইহার নাম মূষিক। প্রবল

প্রতিবন্ধকস্বরূপ কর্ম্মফল বিদ্যমান থাকিতে সিদ্ধিলাভ হয় না। তাই, কর্ম্মফল-হরণের উপর সিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত। যখন মানুষ এমন একটী অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয় যে সিদ্ধির প্রতিবন্ধকস্বরূপ কর্ম্মফলগুলি ভোগ ব্যতীত ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করে, তখন সে মূষিকধর্ম্মী হয়। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ পরম সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত হইলেই, জীব চুপি চুপি অজ্ঞাতসারে স্বকীয় অতি কঠোর কর্ম্মফলগুলি কাটিতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ মানুষ এইরূপ মূষিকধর্ম্মী হইলেই পরম সিদ্ধিলাভে ধন্য হয়।

এইরূপ লক্ষ্মীর বাহন পেচক। যাহারা দিবান্ধ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে অন্ধ, তাহারাই পেচকধর্ম্মী। জীব যতদিন এইরূপ পেচক-ধর্ম্মী থাকে, ততদিনই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ধনধান্যাদি পার্থিব সুখের অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মশক্তির উপাসনা করে। অথবা মা আমার ধনেশ্বরী মূর্ত্তিতে দিবান্ধ প্রাণীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সরস্বতীর বাহন হংস। সরস্বতী —ব্রহ্মবিদ্যা। যে সাধক দিবারাত্র অজপা মন্ত্রে সিদ্ধ তিনিই হংসধর্ম্মী। মানুষ সুস্থ শরীরে দিবারাত্র মধ্যে একুশ হাজার ছয় শত "হংস" এই অজপা মন্ত্রজপরূপ শ্বাস প্রশ্বাস করিয়া থাকে। মানুষ যতদিন এই স্বাভাবিক জপ উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদিন হংসধর্ম্মী হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যারও সন্ধান পায় না। এতদ্ভিন্ন হংসপক্ষীর একটী বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে জল পরিত্যাগপূর্ব্বক দুগ্ধ গ্রহণ করে। মানুষও যখন এইরূপ নশ্বর জগৎ হইতে সার জ্ঞানাংশমাত্র পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, তখনই ব্রহ্মবিদ্যালাভে চরিতার্থ হয়; তাই, হংসপৃষ্ঠে সরস্বতী।

বিষ্ণুর বাহন গরুড়। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে —"ত্রিবৃদ্ বেদঃ সুপর্ণস্তু যজ্ঞং বহতি পুরুষম্।" বেদই গরুড় পক্ষী, ইনি যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে বহন করেন। বিষ্ণু—জগৎব্যাপক চৈতন্য— মুক্তিদাতা। জ্ঞান এবং কর্ম্ম এই উভয়াত্মক সাধনাই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুদেবতাকে বহন করে। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে— "উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং

জায়তে পরমং পদম্। কেবলাৎ কর্ম্মণো জ্ঞানান্নহি মোক্ষাঽভিজায়তে। কিন্তু তাভ্যাং ভবেন্মোক্ষঃ সাধনন্তূভয়ং বিদুঃ।" যেরূপ পক্ষিগণ উভয় পক্ষদ্বারা উন্মুক্ত আকাশে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ সাধকগণ জ্ঞান এবং কর্ম্মরূপ উভয়াত্মক সাধনাবলে বিষ্ণুর পরম পদের সন্ধান পায়। কেবল কর্ম্ম কিংবা কেবল জ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ হয় না; কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয় দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়; সুতরাং এতদুভয়াত্মক কর্ম্মই সাধনা (১)। জীব যখন বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের জ্ঞানময় অনুষ্ঠানতৎপর হয়, তখনই সে পক্ষীস্থানীয় হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি —বেদশাস্ত্রই গরুড় (২)। বেদ-প্রতিপাদিত কর্ম্ম ও জ্ঞান, এই দুইটি

[১] এস্থলে কাহারও মনে এরূপ একটী আশঙ্কা নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে যে, যদি জ্ঞান এবং কর্ম্মই মোক্ষের সাধনা হয়, তবে ভক্তির স্থান কোথায়? তাহার উত্তর পরে বিশেষভাবে দেওয়া হইবে, এখানে সঙ্ক্ষেপে উহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। দেখ, ভক্তির কথা আবার বলিতে হয়? ওরে, ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান হয়, না কর্ম্ম হয়? অথবা আজকাল যখন "পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে," এইরূপ উপদেশপূর্ণ পুস্তকাদিরও অসংখ্য প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ভগবানে ভক্তি করিবার উপদেশপূর্ণ বহু শাস্ত্র গ্রন্থের প্রচারই বা না হইবে কেন? ভক্তি মানুষের সহজাত ধর্ম্ম, যতদিন এই ধর্ম্মের বিকাশ না হয় ততদিন বেদে অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুশীলনে অধিকারই হয় না। তাই শূদ্রের বেদপাঠ নিষিদ্ধ।

আর একটি কথা আছে—আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "কেবল জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। জ্ঞান এবং কর্ম্ম উভয়ের সমুচ্চয় কখনও হইতে পারে না।।" কথাটী খুবই সত্য। আপাত দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তের সহিত যোগবাশিষ্ঠের বাক্যের বিরোধ প্রতীতি হইতে পারে, বাস্তবিক বিরোধ কিছুই নাই। প্রথমপ্রবিষ্ট সাধকগণের সে সকল বিচার নিষ্প্রয়োজন। চণ্ডীর তৃতীয় খণ্ড পর্য্যন্ত ধীরভাবে অধ্যয়ন করিলে সকল সংশয়েরই নিরাস হইবে।

[২] সাধারণতঃ বেদ দুইভাগে বিভক্ত। একভাগ যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান-মন্ত্রাদি দ্বারা পূর্ণ এবং অপর ভাগ উপনিষৎ বা জ্ঞানকাণ্ড। এই অংশকে বেদান্ত বা শ্রুতিশির কহে। কিরূপ জ্ঞানে জ্ঞানময় হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাই এই অংশে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

গরুড়ের পক্ষস্থানীয়, এতদ্ভিন্ন গরুড়ের আর একটী ধর্ম্ম—পন্নগাশনত্ব। কর্ম্মসমূহ যতই জ্ঞানময় হইতে থাকে, ততই সংসারাসক্তি—দেহাত্মরূপী কুটিলগতি সর্প বিলয়প্রাপ্ত হয়; তাই, গরুড়ের ভক্ষ্য সর্প। মানুষ যখন এইরূপ সর্ব্বতোভাবে গরুড়ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে, তখনই দেখিতে পায়—মোক্ষদাতা জগদ্ব্যাপক বিষ্ণু তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। জ্ঞানময় কর্ম্মযজ্ঞই যজ্ঞেশ্বরের বাহন। সর্ব্বগত ব্রহ্ম যে নিত্যই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, একথা গীতায়ও উক্ত হইয়াছে।

এইরূপ শিবের বাহন বৃষ। শিব—বিজ্ঞানময় পুরুষ বা জ্ঞানরূপী গুরু। যে জ্ঞানে এই জগৎ পরিধৃত, সেই অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধান পাইলে, অমঙ্গলরূপী মৃত্যুভয় চিরতরে বিদূরিত হয়; তাই, তাঁহার নাম শিব বা মঙ্গল। বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্ম। শুভ্র সত্ত্ব গুণের উদয়ে ধর্ম্মের বিকাশ হয়, তাই বৃষটী শুভ্র। বৃষের চারিটী পদ। তপঃ শৌচ দয়া এবং দানরূপ ধর্ম্মও চতুষ্পাদ। মানুষ যখন এই চতুষ্পাদ ধর্ম্মের যথাসম্ভব আচরণ-যোগ্যতা লাভ করে, তখনই তাহার শিবদর্শন বা গুরুলাভ হয়; তাই, বৃষপৃষ্ঠে শিব প্রতিষ্ঠিত।

দুর্গার বাহন সিংহ। হিংসাই সিংহের প্রধান ধর্ম্ম। যে মানুষ স্বকীয় জীবভাবকে হিংসা করিতে সমর্থ, জীবত্বের বিলয়পূর্ব্বক ব্রহ্মত্বের বিকাশ করিতে প্রয়াসী, সে-ই সিংহধর্ম্মী। সিংহ পশুরাজ, মানুষ পশুশ্রেষ্ঠ। এক কথায় মানুষ যখন পশুত্বের আধিপত্য হইতে যথার্থ মনুষ্যত্বে উপনীত হইবার যোগ্য হয়, তখনই তাহাকে সিংহ-ধর্ম্মী বলা যায়। তাদৃশ জীবেই মা আমার দশদিগ্ ব্যাপিনী সন্তানবৎসলা স্নেহময়ী মূর্ত্তিতে প্রকটিতা; তাই মা আমার সিংহবাহিনী। সকল দেবতার বাহনতত্ত্ব বলিতে গেলে পুস্তকের আকার অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে।

এস্থলে পুনরায় মনে করিয়া দিতেছি—এই বাহনতত্ত্ব পাঠ করিয়া কাহারও যেন এরূপ ভ্রম উপস্থিত না হয় যে, ঐ সকল দেবতার কোন বিশেষ মূর্ত্তি নাই। সত্য সত্যই ঐ সকল দেবতা আছেন। চিন্ময়ী মহতী শক্তির যে ভাবটী যখন সাধকের ভক্তি হিমে ঘনীভূত হইয়া, যেরূপ

বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়, এস্থলে আমরা কেবল সেই ভাবটির বিষয়ই আলোচনা করিয়াছি। চৈতন্যের ঐ সকল বিশিষ্ট ভাবে তন্ময়তা আসিলেই ঐরূপ দেবমূর্ত্তি সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। মৃণ্ময় অথবা চিত্রাঙ্কিত মূর্ত্তির সহিত তাঁহার তুলনাই হয় না। ছবির মূর্ত্তি প্রাণহীন—জড়মাত্র; কিন্তু সে মূর্ত্তি চৈতন্যঘন, জ্যোতির্ঘন। এক কথায় বলিতে হয়—প্রাণ দিয়া কোনও মূর্ত্তি গঠিত হইয়া যদি বিরাট সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে স্থাপিত হয়, (না সূর্য্যমণ্ডল নয়,—চন্দ্রমণ্ডল, না চন্দ্রমণ্ডলও নয়, উত্তাপহীন সূর্য্যমণ্ডল বলিলে কতকটা হয়) তবে যেমনটি হয়, ঠিক তেমন গো ঠিক তেমন। কি ক'রে বুঝাব সে মাধুরী—সে চৈতন্যঘন, আনন্দঘন মূর্ত্তির স্বরূপ কিরূপ! কি দিব্য জ্যোতি! সে চিত্তমুগ্ধকর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! সে প্রাণমাতান স্নেহ। তাহা কি চিত্রে অঙ্কিত হয়? সে যাহা হউক, এইবার আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের সমীপস্থ হই; মানব ও তির্য্যক উভয়ই প্রায় তুল্যভাবে বিষয়গোচর-জ্ঞানসম্পন্ন এই কথাটী বলিবার জন্যই মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধ। পরার্দ্ধের প্রথমে বলা হইল—মানুষের যেরূপ জ্ঞান আছে, পশু পক্ষীরও সেইরূপ জ্ঞান আছে। এইটি কোন্ জ্ঞান? বিষয়গোচর জ্ঞানের কথা ত পূর্ব্বার্দ্ধেই ব্যক্ত হইয়াছে; আবার তাহা বলিলে পুনরুক্তিদোষ হয়। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী কয়েকটী মন্ত্রের অর্থের দিকে একটু লক্ষ্য রাখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, এস্থলে জ্ঞানপ্রিয়তাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

খুলিয়া বলি—মানুষ যেমন জ্ঞানপ্রিয়, তির্য্যক্ জাতিও সেইরূপ। জ্ঞানপ্রিয় শব্দের অর্থ কি? যে স্বপ্রকাশ অখণ্ডজ্ঞান কতকগুলি সংস্কারের আবরণের মধ্য দিয়া বিভিন্ন আকারে বিষয়গোচর হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, সেই সংস্কারবিশিষ্ট জ্ঞানটুকুমাত্র মনুষ্য ও অন্য প্রাণীর প্রতীতিযোগ্য। জ্ঞানের এই অংশটী মানুষের যেমন প্রিয়, পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ জাতিরও সেইরূপ প্রিয়। ঐ সংস্কারবিশিষ্ট জ্ঞানটুকুর উপর একটা অস্মিতা বা অহংজ্ঞান আছে। ঐ অস্মিতাই প্রিয়ত্বের হেতু। জীবমাত্রেই নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে।

'আমি' আমার যত প্রিয়, এ জগতে অন্য কোন বস্তুই তত প্রিয় নহে। মানুষ এবং তির্য্যক্ সকলেরই মৃত্যুভয় তুল্য। ইহাদ্বারাও প্রতীত হয়—আত্মপ্রিয়তা সকলেরই সমান। জীব মৃত্যুকে এত ভয় করে কেন? পাছে "আমি আছি" এই জ্ঞানটুকু হারাইয়া যায়।

ঐ এক বিন্দু জ্ঞানের জন্য জগতের যত কিছু। আহার, নিদ্রা, অর্থোপার্জ্জন, ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা সকলই ঐ আমি বলিয়া যে জ্ঞানটুকু প্রকাশ পাইতেছে, উহাকে ভালোবাসিবার ফল। সাধারণ মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণিজগতে যে যতটুকু জ্ঞানের অধিকার পাইয়াছে, (অর্থাৎ জ্ঞানের যে অংশটুকু মাত্র করণ বা ইন্দ্রিয় সমুদয়ের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়) সে সেই অংশকেই সমধিক ভালবাসে, উহার সংরক্ষণেই বিশেষ যত্নশীল।

'তুল্যমন্যত্তথোভয়োঃ' এইটী মন্ত্রের শেষাংশ! অন্যথা অর্থাৎ জ্ঞান ভিন্ন অন্য। যদিও জ্ঞান ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই, তথাপি সাধারণ দৃষ্টিতে জ্ঞান ভিন্ন অন্য বলিলে জড় পদার্থ বুঝা যায়। প্রাণিসমূহে সাধারণতঃ এই দুইটি অংশই লক্ষিত হয়। একটী জ্ঞান, অন্যটী ক্ষিত্যাদি জড় সংঘাত। বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকারগণের ভাষায় এই অংশকে অজ্ঞান বলা যায়। প্রথমে বলা হইয়াছে —জ্ঞানাংশে মনুষ্য ও পশু উভয়ই তুল্য। পরে বলা হইল— সেই জ্ঞান উভয়েরই তুল্যপ্রিয়! এখন ঋষি বলিলেন—অন্যৎ অর্থ জ্ঞানাংশ ব্যতীত আর যাহা আছে, সে অংশেও উভয়েরই তুল্যতা। বাস্তবিক, প্রাণিজগতে দুইটি জিনিষই দেখিতে পাওয়া যায়—একটী জ্ঞান বা চৈতন্য, অন্যটী জড় বা অচেতন। এই উভয়ই সর্ব্বপ্রাণি সাধারণ—তুল্য।

কেহ কেহ মন্ত্রের এই অংশটীর অন্যরূপ অর্থ করেন। তাঁহারা বলেন—অন্যৎ শব্দের অর্থ অখণ্ড জ্ঞান। অর্থাৎ যাহা সর্ব্বত্র স্বপ্রকাশ,— কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—সেই একরস আত্মজ্ঞান। সেই অংশটী সাধারণ মানুষের যেরূপ অনধিগম্য, পশুগণেরও সেইরূপ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানে উভয়ই অন্ধ। আমরা কিন্তু ঐরূপ ব্যাখ্যায় প্রীতিলাভ

করিতে পারি না; কারণ, মনুষ্যজগতে কোন না কোন ব্যক্তি এই জ্ঞানের সন্ধান পাইতে পারে; কিন্তু পশুজগতে কেহ পারে না।

যাহা হউক, এইবার আমরা মেধসবাক্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া লইব। মেধস্ বলিতেছেন—"হে সুরথ! তুমি যে জ্ঞানের অহঙ্কার করিতেছ, একবার চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার ঐ অহঙ্কারের যোগ্যতাই নাই। তুমি মানুষ, তোমার জ্ঞান আছে ইহা সত্য; কিন্তু ঐ জ্ঞান বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ-জন্য পরিচ্ছিন্ন। পশু পক্ষীরও জ্ঞান ঠিক এইরূপ পরিচ্ছিন্নভাবেই প্রকাশ পায়। তুমি তোমার সংস্কারবিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড জ্ঞানকে "আমি" মনে করিয়া তাহাতেই প্রীতিমান্। পশু পক্ষীও তাহাদের স্ব স্ব জ্ঞানকে বা আমিকে ভালবাসে। এইজ্ঞান ব্যতীত আর যাহা আছে—তাহা জড় দেহাদি বা অজ্ঞান; সে অংশেও মনুষ্য এবং পশুতে কোন প্রভেদ নাই।"

জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥৩৮॥

অনুবাদ। হে সুরথ! দেখ, আত্মপ্রীতিবিষয়ক জ্ঞান বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, এই পক্ষিগণ স্বয়ং ক্ষুধায় অতি পীড়িত হইয়াও মোহ-বশতঃ শাবকের চঞ্চুতে অতি আদরের সহিত তণ্ডুলকণাদি খাদ্য দ্রব্য অর্পণ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা। তির্য্যক্ জাতিও নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে। ক্ষুধা হইয়াছে, আহার করিলে স্বয়ং পরিতৃপ্ত হয়, তাহা না করিয়া মুখস্থিত খাদ্যগুলি সন্তানের মুখে ঢালিয়া দেয়। মানুষের বরং প্রত্যুপকারের আশা আছে; সুতরাং নিজে দুঃখ কষ্ট করিয়াও সন্তান প্রতিপালন করে; অন্য প্রাণীর ত সে আশাও নাই। তবে এরূপ করে কেন? উহাতে একটা অলক্ষিত আত্ম-তৃপ্তি আছে। নিজে

খাইয়া যে তৃপ্তি লাভ করে, নিজে না খাইয়া সন্তানকে খাওয়াইয়া তদপেক্ষা অধিক আত্ম-তৃপ্তি লাভ করে। সেই জন্যই জীবের এইরূপ ব্যবহার। ইহার মধ্যে একটি মোহ বা অজ্ঞানতা আছে। তাই, মন্ত্রে 'মোহাৎ' শব্দটি উক্ত হইয়াছে। জীব জানে না যে, ঐরূপ করিয়া বস্তুতঃ নিজেকেই ভাল বাসিতেছে। সংসারে যে যাহা করে, সবই আত্ম-তৃপ্তির জন্য। বৃহদারণ্যকোপনিষদে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"পতির পরিতৃপ্তির জন্য পত্নী পতিকে ভালবাসে না, পতিকে ভালবাসিয়া আপনিই পরিতৃপ্ত হয়, তাই, পত্নী পতিকে ভালবাসে। এইরূপ জায়ার প্রীতির জন্য পতি জায়াকে ভালবাসে না, পত্নীকে ভালবাসিয়া আপনি সুখী হয়; তাই পতি পত্নীকে ভালবাসে। পুত্রের জন্য পিতা পুত্রকে ভালবাসেন না, আত্ম-তৃপ্তির জন্যই পিতা পুত্রকে ভালবাসেন। এইরূপ সকলের তৃপ্তির জন্য সকলে সকলকে ভালবাসে না। নিজ নিজ তৃপ্তি-সাধন উদ্দেশ্যেই সকলে সকলকে ভালবাসে"। ইহারই নাম জ্ঞান। যে ব্যক্তি ইহা জানে—বোঝে—উপলব্ধি করে, সে-ই জ্ঞানী। সে সকলকেই ভালবাসে, সকলেরই উপকার করে; কিন্তু নিজে জানে—আমি আমাকেই ভালবাসিতেছি। যতদিন এই আত্মাকে—মাকে বা আমাকে জীব খুঁজিয়া না পায়, ততদিন তাহার জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মোহ বিদূরিত হয় না; তাই মন্ত্রে 'জ্ঞানেঽপি মোহাৎ' কথাটী উক্ত হইয়াছে। কাহার তৃপ্তি সাধনের জন্য পক্ষীগুলি স্বয়ং ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও শাবকের চঞ্চুতে নিজের মুখস্থিত খাদ্য অর্পণ করে, তাহা তাহারা জানে না; তাই তাহারা মোহাচ্ছন্ন। এইরূপ মানুষও যতদিন মনে ভাবে—আমি স্ত্রী পুত্রকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করিতেছি, কিংবা জগতের উপকারের জন্য জগতের হিতকর কর্ম্ম করিতেছি, বুঝিতে হইবে ততদিন তাহার মোহ বিদূরিত হয় নাই। এ কথা পরে আরও ব্যক্ত হইবে।

মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ স্থতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নম্বেতে কিং ন পশ্যসি ॥৩৭॥

অনুবাদ। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণ পুত্রাদির প্রতি অভিলাষ-সম্পন্ন অর্থাৎ স্নেহশীল। ইহারা যে লোভবশতঃ প্রত্যুপকারের আশায় এইরূপ করিতেছে, ইহা কি দেখিতে পাও না?

ব্যাখ্যা। পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক জাতি যে পুত্রাদির প্রতি স্নেহশীল, তাহা প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষ। ভবিষ্যতে এই শাবকগুলি বড় হইয়া আমাদের প্রতিপালন করিবে, এরূপ একটা আশা তাহারা হৃদয়ে পোষণ করে না, তথাপি নিজেরা প্রাণান্তকর কষ্ট করিয়াও সন্তান প্রতিপালন করে, যেহেতু অপত্যপালন তাহাদের সহজাত বৃত্তি। মনুষ্যগণও এই অপত্য-স্নেহরূপ স্বাভাবিক বৃত্তির বশেই পুত্রাদির প্রতি স্নেহশীল হয়; কিন্তু ভবিষ্যতে পুত্রাদিদ্বারা প্রত্যুপকৃত হইবার আশাও অন্তর্নিহিত থাকে। এইটুকুই বিশেষ। তির্য্যক্ জাতি অপেক্ষা মনুষ্যজাতি অনেক অংশে জ্ঞানে উন্নত, তাহারা ভবিষ্যতেরও কিছু কিছু দেখিতে পায়। সাধারণ মনুষ্য পুত্রাদির নিকট পার্থিব উপকারের আশা করে; আর যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত; তাঁহারা পারলৌকিক কিংবা আত্মিক উপকারের আকাঙ্ক্ষা রাখেন। উভয়ত্রই মোহটি কিন্তু অবিশেষ। প্রত্যুপকারের আশায়ই হউক, অথবা প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষ হইয়াই হউক, পুত্ররূপে পত্নীরূপে কাহার পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে, ইহা তাহারা জানে না। সাধক! তুমি দূর দেশ হইতে আসিয়া শিশুপুত্রের মুখে সুখাদ্য মিষ্টান্ন তুলিয়া দিলে, পুত্র আনন্দে খাইতে লাগিল। দেখিয়াছ কি তখন নিজের বুকে হাত দিয়া—তোমার বুকটার ভিতর কে পূর্ণ পরিতৃপ্তি ভোগ করিতেছে? পুত্ররূপে কে? আত্মা মা। প্রিয় পরিজনরূপে কে? আত্মা মা। সর্ব্বরূপে কে? আত্মা মা আমার। আমিই ত পত্নী পুত্রাদিরূপে বহুভাবে বিরাজিত। আমি বহুত্বের লীলা করিতে চাহিয়াছিলাম। তাই, এক আমি বহু হইয়া, বহুরূপী আমির সেবা করিতেছি। বিষ্ণুমূর্ত্তিতে—

বিশ্বরূপে আমিই বিরাজমান। ইহাকে না জানিয়া, মাকে না চিনিয়া, আমাকে ভুলিয়া কি করিতেছ? পত্নী পুত্রের সেবা! ও যে "আমারই সেবা!" 'নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে' বলিয়া যতদিন আমার পূজা না করিবে, ততদিন ফলতঃ আমার পূজা করিলেও কার্য্যতঃ কিন্তু অন্য দেবতারই পূজা হইবে। ইহারই নাম অজ্ঞান, ইহারই নাম মোহ।

শুন, অখণ্ড চিৎসমুদ্রে যে কয়েকটী তরঙ্গ একত্র করিয়া তাহার উপর একটা কল্পিত আমিত্ব বসাইয়া দিয়াছ, উহাই প্রথম অবিদ্যা-গ্রন্থি। বিশুদ্ধ জ্ঞানাংশে দৃষ্টি নিপতিত হইলে—আমি-তুমি-শূন্য একটা মহান্ জ্ঞানসমুদ্র মাত্র প্রতীত হয় এবং উহাতে আত্মবোধের বিকাশ হয়। জ্ঞানসমুদ্রের ঐ বিভিন্ন তরঙ্গগুলিই পত্নী-পুত্রাদিরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই জগৎ যে আত্মসত্তায় সত্তাবান্ ইহা না জানার নামই মোহ। এই যে মোহ, এই যে অজ্ঞানে প্রত্যুপকারের আশায় ভালবাসা, ইহার পরিণাম কি? পরিণাম জ্ঞান। অজ্ঞান বা ঈষৎ জ্ঞান হইতেই পূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানের উদয় হয়। কিরূপে ইহা সম্ভব হইতে পারে? মনে কর—তুমি পুত্রকে পুত্র বলিয়া ভালবাসিতেছ; কার্য্যতঃ তোমার ভালবাসারূপ একটী বিশিষ্ট সংস্কার তৈয়ারি হইতেছে। কিছুদিন পরে পুত্রের অভাব হইল; কিন্তু তোমার বুকের ভিতর ভালবাসা নামে যে একটী অমর সম্বেদন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার ত অভাব হইল না! এইরূপ জগতের সর্ব্বত্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলি ভালবাসিয়া, জগতের পরিচ্ছিন্নতায় মুগ্ধ হইয়া, শুধু নাম ও রূপে অনুরক্ত হইয়া, জীবগণ বিন্দু বিন্দু অনুরাগ বা প্রেম সঞ্চিত করিতেছে। যে দিন উহা পূর্ণতায় উপনীত হইবে, সে দিন দেখিবে—আপনাকেই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। তখনই জীব আত্মরতি আত্মক্রীড় আত্মমিথুন হইয়া অখণ্ড প্রেমসিন্ধুতে অবগাহন করিবে। যতদিন ঐ অবস্থা না আসে, ততদিন আত্মা ভিন্ন অন্য একটা কল্পিত জিনিষ আশ্রয় করিয়াই ভালবাসা নামে অনুভূতির বিকাশ করিতে হয়। অন্য একজনের উপর নিজের প্রাণের কতক অংশ ঢালিয়া দিয়া তবে ভালবাসা বস্তুটী বুঝিতে হয়।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা—"আমরা যে এই নশ্বর জগৎকে ভালবাসি, ইহাই আমাদের বন্ধন। এই বন্ধন হইতে মুক্ত না হইলে আর ভগবানকে লাভ করিবার আশা নাই।" কথাটী একদিক দিয়া সত্য হইলেও চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দেখিতে পায়—এই যে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ, এই যে সংসারাসক্তিরূপ মায়ারজ্জু, উহা জীবকে চিরদিন বন্ধন করিয়া রাখিবার জন্য নহে, উহা মাকে বা আমাকে চিরদিনের তরে প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ করিবার পূর্ব্ব আয়োজন-মাত্র। ভয় নাই সাধক! তুমি সংসারের প্রতি আসক্তি পরিহার করিতে অসমর্থ বলিয়া, মনে করিও না, তোমার পক্ষে মাতৃ-লাভ সুদূর-পরাহত। "গণয়সি যদিদং বন্ধনমাত্রং পশ্চাদ্দ্রক্ষ্যসি মোচনদাত্রম্॥" যাহাকে তুমি এখন বন্ধন বলিয়া মনে করিতেছ, কিছু দিন পরে দেখিতে পাইবে—উহাই বন্ধনমুক্তির উপায়স্বরূপ। আরে! আগে ভালবাসা নামে, প্রেম নামে একটা জিনিষ তৈয়ারী হউক! তার পর দেখিবে—তুমি তাঁহাকেই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছ। ভালবাসাই যে তাঁর স্বরূপ! প্রেমই যে মায়ের আমার আনন্দঘন স্বরূপ! সেখানে প্রেমে ও প্রেমিকে ভেদ নাই। আপনাকে সর্ব্বত্র প্রসারিত করিতে আরম্ভ কর, প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে। প্রেমের স্বরূপ আত্মদান। প্রেমময়ী মহামায়াকে আত্মদান কর। দেখিবে—তুমি প্রেমসিন্ধুতে ডুবিয়া গিয়াছ। প্রেমের সাধনার জন্য—প্রেমিক হইবার জন্য পৃথক কোনরূপ অনুষ্ঠান কিংবা কল্পিত মনুষ্যপ্রেমের আরোপ প্রভৃতি কিছুই করিতে হইবে না। মানুষে কি প্রেম হয়? না, হইতে পারে? এক কথায় বুঝিয়া রাখ—পূর্ব্বে যে অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রের কথা বলিয়াছি, উহা শুধু নীরস একটী জ্ঞানসমুদ্র নহে, উহাই প্রেমের সমুদ্র। জ্ঞান ও প্রেম একই কথা।

অনেক সাধক ভগবানে প্রেম হইল না বলিয়া দুঃখ করেন। প্রেমময়ী মা কিন্তু আমাদিগকে অন্য পথে পরিচালিত করিতেছেন। আমরা বুঝিয়াছি—ভগবানে প্রেম করার চেষ্টা অপেক্ষা, যাহার প্রতি

প্রেম স্বাভাবিক, তাহাকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করার চেষ্টা সত্বর ফলপ্রসূ হয়। সাধক! একথাটা ভাবিয়া দেখিও।

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা ॥৩৮॥

অনুবাদ। (বাস্তবিক সকলেই আত্মপ্রিয়) তথাপি সংসার-স্থিতিকারী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মমতারূপ আবর্ত্তে ভ্রমণ করিয়া মোহগর্ত্তে নিপতিত হয়।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে বলিয়াছি—কি মনুষ্য, কি তির্য্যক্, সকলেই অজ্ঞানতঃ আত্মপ্রিয়। মনুষ্যজাতি মধ্যে প্রত্যুপকারের আশায় পুত্রাদির প্রতি স্নেহ ঐ আত্মপ্রিয়তাকেই বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেয়। বস্তুতঃ মানুষ আপনাকেই ভালবাসে, আপনাকেই সেবা করে; আপনার তৃপ্তি-সাধনই সর্ব্বজীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যদিও ইহাই যথার্থ তত্ত্ব; তথাপি ঐ আপনাকে ভালবাসিতে গিয়া, জীব 'আমি' কথাটি ভুলিয়া যায়; কতকগুলি জিনিষ "আমার" হইয়া দাঁড়ায়। এই "আমার" শব্দটীই যত গোলযোগের হেতু। আমার অর্থাৎ "মম"। ঐ মম শব্দের উত্তর ভাবার্থে 'তা' প্রত্যয় যুক্ত হইয়া, মমতা শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। এক কথায় মমতার অর্থ—"আমার" "আমার" এইরূপ ভাব। এই মমতা একটি আবর্ত্ত অর্থাৎ জলভ্রমী-সদৃশ; ঘূর্ণীজলে কোন তৃণাদি পতিত হইলে যেরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক স্থানেই অবস্থিত হয়, এই মমতারূপ আবর্ত্তে পড়িয়া মনুষ্যগণও সেইরূপ প্রায় একস্থানেই ঘুরিয়া বেড়ায়। বহুদিন এই মমতার আবর্ত্তে অর্থাৎ আমার সংসার, আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার দেহ, ইত্যাকার জ্ঞানে বিচরণ করিতে করিতে মনুষ্য মোহরূপ গর্ত্তে নিপতিত হয়। দেখিতে পাওয়া যায়—জলভ্রমী অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা গর্ত্তের আকার ধারণ করে, তৃণাদি যাহা কিছু প্রথমতঃ জলের ভ্রমীর সহিত ঘুরিতে থাকে, অবশেষে তাহা জলবিবরে সমাহিত হইয়া যায়। জীবেরও ঠিক এইরূপ দশাই হয়।

বহুদিন "আমার আমার" করিয়া অবশেষে আমি বস্তুটি হারাইয়া ফেলে ; ইহারই নাম মোহ। এই মোহই গর্ত্ত সদৃশ। মানুষ যখন 'আমিকে' খুঁজিয়া পায় না, তখনই সে পূর্ণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ; তখনই নর, নরক হইয়া যায়। নরশব্দের উত্তর অল্পার্থে ক-প্রত্যয় করিয়া নরক শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। মানুষ যখন বড় ছোট—অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, তখনই সে নরকে যায়। গর্ত্তের মধ্যে কোন জিনিষ পড়িয়া গেলে, যেমন বাহির হইতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ বহুদিন "আমার সংসার, আমার সংসার" এইরূপভাবে বিচরণ করিয়া জীব এত মুগ্ধ হইয়া পড়ে যে, আর আমি কে, তাহা দেখিতে পায় না। দিবারাত্র 'আমি আমি' করে, অথচ আমি কে, তাহা জানে না—ইহারই নাম অজ্ঞান—ইহারই নাম মোহ। এই অজ্ঞান হইতে পুনঃ পুনঃ সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতে হয়। আমরা বহু দিন এইরূপ মমতার আবর্ত্তে পড়িয়া সংসারটাকে এতই আমার করিয়া ফেলিয়াছি যে, সংসারের একটু অনিষ্ট হইলেই মনে হয় আমিটি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গেল। বাড়ীর প্রাচীরের চূণ খসিয়া পড়িলে বুকটা কর্ কর্ করিতে থাকে। এমনই একটা অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি ; কিন্তু সংসারের সকল নষ্ট হইলেও 'আমি' যে নিত্য স্থির থাকে, ইহা বুঝিতে পারি না। এই সংসার—এই দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ বুদ্ধি এ সকলই যে 'আমার' সত্তায় সত্তাবান্, 'আমি' না থাকিলে যে ইহার কিছুই থাকে না, তাহা বুঝিয়াও বুঝি না। এমনই অজেয় এই মোহ।

ঐ 'আমিই' অন্নময়াদি পঞ্চকোষের ভিতর দিয়া—স্ত্রীপুত্রাদি সংসারের ভিতর দিয়া—আমার নিত্যভোগ্য জগতের ভিতর দিয়া অলক্ষিতে উঁকি মারিতেছে। "ময্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি, তদ্‌ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্।" আমাতেই সকল জাত, আমাতেই সকল স্থিত, আমাতেই সকল লীন, আমিই সেই অদ্বয়ব্রহ্ম! ওঃ, আমি কি মহান্! রাজার ছেলে মেথরের সাজে কাঙ্গালের অভিনয় করিতেছি, আমি সে-ই।

বুঝিতে পারিয়াছ? অজ্ঞানান্ধ চক্ষু জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা

উন্মীলিত হইয়াছে ; এইবার চিনিতে পারিলে—কে শ্যাম, কে শ্যামা, কে তেত্রিশ কোটি দেবতা, কে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড, কে সর্ব্বব্যাপী মহান্, কে সুপ্রকাশ অথচ অদৃশ্য, কে দূরাৎ সুদূরে অথচ অন্তর হইতে অন্তরে। দেখ্‌লে—তাঁকে আমাকে মাকে ? ওরই নাম দেখা, ওরই নাম জানা। এইবার বুঝিতে পারিলে, তিনি কত সুলভ ! এইবার তাঁহাকে পাইবার জন্য চেষ্টা কর। তাঁহাকে ভালবাস। বড় অনাদরে, বড় অবজ্ঞায় ফেলিয়া রাখিয়াছ। তাঁহাকে আদর কর। যে মুহূর্ত্তে তাঁহাকে দেখিবে, সেই মুহূর্ত্তেই সংসার পলায়ন করিবে। যে মুহূর্ত্তে তাঁহাকে দেখিবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি মুক্ত। এইরূপ বারংবার দেখ, তুমি জীবন্মুক্ত হইবে। কিন্তু সে অন্য কথা—

যাহা হউক, জীবকে এই মোহগর্ত্তে কে ফেলে এবং কেনই বা ফেলে, তাহার উত্তর দিতে গিয়া ব্রহ্মর্ষি বলিলেন—"মহামায়া-প্রভাবেন সংসার স্থিতিকারিণা" সংসার-লীলার অভিনয় করাই মায়ের বা আমার উদ্দেশ্য। এক হইয়াও বহু ভাবে বিরাজ করিয়া যে কি আনন্দ, তাহা উপভোগ করিবার জন্যই এই সংসারস্থিতির প্রয়োজন। মোহ না হইলে, এই সংসার খেলা চলে না। চক্ষু না বাঁধিলে কি লুকোচুরি খেলা চলে ! আমার প্রকৃত স্বরূপটী প্রতিমূহূর্ত্তে বোধে বিকাশ পাইলে, আর এই বহুত্ব—এই সংসারলীলা থাকে না।

তাই মেধস্ বলিতেছেন—জীব, তুমি মোহাচ্ছন্ন হইয়াছ বলিয়া দুঃখ বা অনুতাপ করিও না। হায়, আমি কি নিকৃষ্ট জীব ? আমি কিছুতেই মোহের হাত এড়াইতে পারিতেছি না। আমার আর তবে আত্মলাভ হইবে না, এইরূপ ভাবে আপনাকে অবসন্ন করিও না। যতই মোহ হউক না কেন, বুঝিয়া লও—উহা মহামায়ারই প্রভাব। তাঁহারই ইচ্ছায় তুমি মোহাচ্ছন্ন হইয়াছ। তাঁহারই ইচ্ছায় কেহ পুণ্যবান, কেহ পাপী। রঙ্গমঞ্চে যাহারা অভিনয় করে, তাহাদের মধ্যে রাজার অভিনয়কারী এবং ভিক্ষুকের অভিনয়কারীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। প্রথম অঙ্কে যে দুই জন জগাই মাধাই সাজিয়াছে,

পরবর্ত্তী অঙ্কে তাহারাই হয়ত গৌর নিতাইর অভিনয় করিতেছে। ইহার মধ্যে ছোট বড়, পাপী পুণ্যবান্, আদৃত বা ঘৃণিত, কেহই নাই; সবই সমান। সবই আমার মহামায়া মায়ের খেলা।

মহামায়া কে! ইতিপূর্ব্বে তাহার অনেক আভাস দেওয়া হইয়াছে। এইস্থলে আবার আমরা সেই কথার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে যে জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিস্বরূপ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণ অখণ্ড-জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, সেই জ্ঞান যে আছে, তাহা আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি! তরঙ্গ দেখিয়া—বিষয়ের দ্বারা। রূপ-রসাদি বিষয়সমূহ একটির পর একটি আসিয়া ঐ জ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিতেছে। যখন আমরা বিষয়গ্রহণে বিমুখ হই অর্থাৎ সুষুপ্ত হই, তখন আর জ্ঞানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। অতএব বুঝিয়া লও—জ্ঞান স্বপ্রকাশ স্বরূপ হইলেও যতক্ষণ বিষয়াকারে আকারিত না হয়, ততক্ষণ আমাদের নিকট প্রকাশ পায় না। এই বিষয়গুলি যে শক্তিপ্রবাহমাত্র, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শাস্ত্রকারগণ এই শক্তি-প্রবাহকে স্থূলতঃ ষড়্‌ভাববিকার বলিয়াছেন; যথা, জায়তে—জন্ম-গ্রহণ করে, অস্তি—প্রতিকূল শক্তিপ্রবাহের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আপন সত্তা বর্ত্তমান রাখে, বর্দ্ধতে—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বিপরিণমতি—পরিণাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বৃদ্ধির চরম অবস্থায় উপনীত হয়, অপক্ষয়তি—ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, নশ্যতি—নষ্ট বা অদৃশ্য হয়। প্রত্যেক পদার্থে প্রতিমুহূর্ত্তে এই ছয়টি বিকার সংঘটিত হইতেছে। এই ছয়টি বিকারকে আরও সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিতে গেলে—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই ত্রিবিধ ক্রিয়া বলা যায়; সুতরাং জগৎ বলিলে—বিষয় বলিলে, বুঝিবে—উহা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াত্মিকা একটি মহতী শক্তিবিশেষ। একটি ফল বা ফুল হাতে লইয়া দেখ, উহাতে উক্ত ষড়্‌ভাব বিকার বা সৃষ্টিস্থিতিলয়রূপ ক্রিয়াশক্তি প্রতিক্ষণে প্রবাহিত হইতেছে। এইরূপ জগতের সর্ব্বত্র।

এস্থলে একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে, শক্তি ত স্থির পদার্থ নহে, উহা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল—প্রবাহময়; তবে এই জগৎকে আমরা

স্থির দেখি কিরূপে? একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা ইহার সমাধান করিব। একখণ্ড কাষ্ঠশলাকার অগ্রভাগ অগ্নিসংযুক্ত করিয়া অতি দ্রুত বেগে সঞ্চালিত করিলে, একটি স্থির অগ্নিময় রেখা আমাদের প্রত্যক্ষ হয়। জগতের স্থিরতা এবং সত্তাও ঠিক এইরূপ; সুতরাং রূপ রসাদি বিষয় সমূহ যে একটি শক্তিপ্রবাহমাত্র, ইহা বেশ প্রতীতি-গোচর হয়। এই শক্তি অনন্ত বৈচিত্র্যময় ব্রহ্মাণ্ডাকারে পরিদৃশ্যমান হইলেও বস্তুতঃ উহা এক। প্রকাশগত বিভিন্নতা দেখিয়া, শক্তিগত বিভিন্নতার অনুমান সঙ্গত নহে। একই তড়িৎশক্তি কোথাও আলোক, কোথাও ব্যজন, কোথাও মুদ্রণ, কোথাও যান-পরিচালন ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারে প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপ একই শক্তি এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগদাকারে প্রতিনিয়ত প্রকটিতা।

এই শক্তি পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানবক্ষেই অবস্থিতা। শক্তির দ্বারাই জ্ঞান প্রকাশিত। এই দুইটি জিনিষ লইয়া জগতে দার্শনিকগণের যত বিচার। একটি জ্ঞান আর একটি শক্তি। এই দুইটি এক কি ভিন্ন। সাংখ্য বলেন—ভিন্ন; জ্ঞান নিষ্ক্রিয় নিষ্কল চৈতন্যময় পুরুষ; আর শক্তি জড়া, পরিণামশীলা প্রকৃতি। এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক হইলেই পুরুষ প্রকৃতিবিযুক্ত হইয়া মুক্তস্বরূপে অবস্থান করেন। প্রকৃতিযুক্ততাই পুরুষের বন্ধন বা জীবভাব। ইহা দ্বৈতবাদ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলেন—প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন নহে। প্রকৃতি পুরুষেরই শক্তি বা অবয়বমাত্র। অঙ্গীর সহিত অঙ্গের যে ভেদ, ইহাতে তাদৃশ ভেদ আছে। পুরুষের সাম্মুখ্যই মুক্তি এবং তদ্‌বিমুখতাই বন্ধন। বেদান্তবাদের মতে জ্ঞান ও শক্তি সম্পূর্ণ অভিন্ন পদার্থ। শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই; কিন্তু ঐ শক্তি-অংশটুকুর নাম মায়া; উহা মিথ্যা, ইন্দ্রজালবৎ। উহার বাস্তব-সত্তা নাই, একমাত্র জ্ঞানেরই পরমার্থ সত্তা। তবে জগদা-কারে যে শক্তি প্রকাশ পাইতেছে, উহা রজ্জুসর্পবৎ ভ্রান্তিমাত্র। ইহা বর্ত্তমান অদ্বৈতবাদ। ইহারা সকলেই সত্যদর্শী। সাধকমাত্রেরই এই সকল অনুভূতির মধ্য দিয়া আসিতে হয়। প্রথমে দ্বৈতপ্রতীতি, পরে বিশিষ্টাদ্বৈতপ্রতীতি, তারপর সত্য-মিথ্যা-মিশ্রিত অদ্বৈতপ্রতীতি;

কিন্তু সর্ব্বশেষে সাধক উপনিষৎপ্রতিপাদ্য জ্ঞানে বা আর্যদর্শনে উপনীত হয়। উহাই পূর্ণ অদ্বৈতদর্শন। পূর্ব্ববর্ত্তী দর্শনকার কাশকৃৎস্ন প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং বৈদিকযুগের ব্রহ্মর্ষিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। প্রামাণিক উপনিষৎসমূহ ধীরভাবে পাঠ করিয়া, উহার সরল অর্থ গ্রহণ করিলেও এই সিদ্ধান্তই স্থির হয়। প্রেমিক অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন'। এতদ্ভিন্ন তিনি 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' কথাটি বলিয়া জ্ঞান ও শক্তির যথার্থস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। যে তত্ত্ব বাক্য এবং মনের অতীত, যাহা বুদ্ধির বহির্দ্দেশে ব্যবস্থিত, তৎসম্বন্ধে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত কল্পনা করিয়া "তিনি ইহাই অন্য কিছু নহেন" এরূপ বলা সমীচীন নহে। তিনি যে কত কি, তাহা কে জানে? যাঁহার যেরূপ অনুভূতি, তিনি কেবল সেইটুকুই বলিতে পারেন।

যাহা হউক, আমরা বুঝিয়াছি—ঐ জ্ঞান ও শক্তি সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন। সেই অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রের প্রত্যেক কল্পিত অণুই শক্তি। এই জন্যই বোধ হয় ঋষিগণ শক্তিবাচক চিৎশব্দে ইহাকে প্রকাশ করিয়াছেন। যখন শক্তির প্রকাশ থাকে না, তখনই ইহার নাম প্রজ্ঞান ব্রহ্ম নিরঞ্জন ইত্যাদি। শক্তিই জ্ঞানময় কিংবা জ্ঞানই শক্তিময় অথবা এতদুভয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তবে ইহা স্থির যে, জ্ঞান ও শক্তি দুই নহে, এক বস্তু। যখন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াত্মিকা মহাশক্তি জগদাকারে প্রকটিতা হন, তখন ইহার নাম সগুণ ব্রহ্ম। ইহার কোথাও মিথ্যা ভ্রান্তি এসকল শব্দ প্রযুজ্য নহে! আর্যগ্রন্থে —উপনিষদে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ নাই!

যাক্, বিচার করিতে করিতে অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা জানি—উনি আমার মা। উঁহারই নাম মহামায়া। উঁহারই প্রভাব—এই সংসারস্থিতি। সংসারখেলা দেখিতে গিয়া মা আমার মমতাবর্ত্তরূপে—মোহরূপে প্রকটিতা। আবার মোহগর্ত্তে নিপতিত জীবরূপেও তিনি। যাহারা সর্ব্বত্র এইরূপে মাকে দেখে, তাহাদের পক্ষে বন্ধন বলিয়া কিছুই নাই; সুতরাং মুক্তি বলিয়াও কিছু থাকে

না। আমরা জানি—আমরা মায়েরই গর্ভজাত, মায়েরই অঙ্কে ধৃত, আমরা সর্ব্বতোভাবে মহামায়ার অঙ্কস্থিত আনন্দময় নগ্ন শিশু। ঐ যে এতক্ষণ বিচার করিতে গিয়া, কেবল "জ্ঞান ও শক্তি" এই দুইটি কথার ব্যবহার করিয়াছি, উহা শুধু ভাষার কচ্‌কচি। কেহ উহাকে তত্ত্বমাত্র বুঝিও না। উনি—একজন; উঁহার ব্যক্তিত্ব আছে। সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত হইলেও উঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম আছে, স্নেহ আছে, ভালবাসা আছে, দয়া আছে, স্থূলদেহ ধারণ করিবার শক্তি আছে। উনি সগুণ, নির্গুণ এবং এতদুভয়ের অতীত। উঁহাকে একটি তত্ত্বমাত্র বুঝিতে গেলে পথহারা হইতে হইবে। উনিই আত্মা, উঁহারই এসব খেলা। এই সংসার মাঝে সং সাজাই তাঁর আনন্দময় লীলা। ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর। মা বলিয়া, সখা বলিয়া, বন্ধু বলিয়া কাতর-প্রাণে ডাক। ধরা দিবার জন্য আকুল হইয়া কাঁদ। সব সংশয় মিটিয়া যাইবে। জীবন চরিতার্থ হইবে। কাঁদিতে পার না, অভ্যাস কর। পুস্তক পড়িয়া বুঝিবে না—মহামায়া কে? কিরূপে সংসারস্থিতি করেন—কেনই বা মমতাগর্ত্তে নিপতিতা হন? গুরু বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও, সব পাইবে, সব বুঝিবে।

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সম্মোহ্যতে জগৎ ॥৩৯॥

অনুবাদ। এই মহামায়া জগৎপতি হরিরও যোগনিদ্রাস্বরূপা। এই জীবজগৎ তৎকর্ত্তৃকই সম্যক্‌প্রকার মোহাচ্ছন্ন থাকে। অতএব হে সুরথ! এবিষয়ে বিস্ময়ান্বিত হইও না।

ব্যাখ্যা। মেধস্ এইবার সুরথ ও সমাধিকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন—তোমরা যে পরিত্যক্ত রাজ্য ও স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি আসক্তি পরিহার করিতে পারিতেছ না, ইহাতে বিস্মিত বা বিষণ্ণ

হইবার কোন কারণ নাই। মহামায়া—মোহজননী, তিনি ত মুগ্ধ করিবেনই ; তুমি ত সামান্য জীব, তিনি জগৎপতি হরিরও যোগনিদ্রা-স্বরূপা। যিনি এই জগৎকে পালন করিতেছেন—সেই জগদ্‌ব্যাপক বিষ্ণু বা প্রাণশক্তিও যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন। তিনিই এই জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি যোগনিদ্রা প্রভাবে বিষ্ণুকেও মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন, যিনি বিষ্ণুর ন্যায় পরিপুষ্ট সন্তানকেও জগতের খেলা দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে পারেন, তিনি তোমার আমার মত জীবকে তাঁহার মহান্‌ স্বরূপ হইতে বিচ্যুত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিমুগ্ধ করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে ?

কেন তিনি এরূপভাবে জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন ? তাঁহারই স্নেহের সন্তান আমরা! আমাদিগকে জগতের খেলায় মুগ্ধ করিয়া তাঁহার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে ? তাঁহার নিজের কোন অভীষ্ট নাই। আমাদের ইষ্টই তাঁহার অভীষ্ট। আমরা এইরূপ মুগ্ধ হইতে চাহিয়াছিলাম, এইরূপ বহুত্বের—ক্ষুদ্রত্বের খেলা করিবার জন্য একদিন মহতী ইচ্ছাময়ী মায়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। সেই দিন হইতে ইচ্ছাময়ী মা আমাদিগকে বুকে করিয়া অনন্ত বহুত্ব—অদ্বিতীয় বহুত্ব সম্ভোগ কবাইতেছেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও অঙ্কচ্যুত করেন নাই। অনেক সাধক এইখানে আসিয়া বড় সমস্যায় পড়েন। সাধক যখন "আর বহুত্ব চাহি না, আর বিষয়-বাসনা চাহি না, আর কামিনী কাঞ্চন চাহি না, আর বহুত্বের খেলা ভাল লাগে না, মা। এক হইতে আসিয়াছি আবার এক কর, মা!" এইরূপ বলিতে বলিতে সরল নগ্ন শিশুটির মত ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়া মা মা করিয়া কাঁদে, তখনও এই বহুত্বের স্পন্দন—হৃদয়-বিদারক বাসনার সন্ধুক্ষিত বহ্নির শেষ শিখা নির্ব্বাপিত হয় না। শিশু যত চাই না চাই না বলিতে থাকে, মা যেন ততই জোর করিয়া সেই অপ্রার্থিত বিষয়সমূহ দিতে থাকেন। আজ না হয় তুমি পরিপুষ্ট হইয়াছে, আজ বিষয়কে অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়াছ, তাই আজ আর বহুত্ব চাহি না বলিতেছ ; কিন্তু একদিন তুমি এই বহুত্বের জন্যই মায়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলে। মা

সে কথা ভুলিয়া যান নাই। তুমি চাহিয়াছিলে ; তাই তিনি স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তোমারই প্রার্থিত বহুত্ব নির্ব্বিচারে দিতেছেন। বিকারগ্রস্ত পুত্র বিকারের ঘোরে মায়ের নিকট তেঁতুল খাইতে চাহিয়াছিল। মা তখন তাঁহাকে খাইতে দেন নাই। এখন পুত্রের বিকার দূর হইয়াছে। তেঁতুল খাওয়ার কথাও স্মরণ নাই ; কিন্তু মা সেই কথাটি মনে করিয়া রাখিয়াছেন—একদিন পুত্র তেঁতুল চাহিয়াছিল। আজ আর সে চাহে না, তথাপি পুত্রস্নেহে বিমূঢ়া মা তেঁতুল আনিয়া সন্তানের মুখের কাছে ধরিলেন। খাও বৎস! একদিন বিকারের ঘোরে চাহিয়াছিলে, তখন তোমায় দিতে পারি নাই, এখন বিকার দূর হইয়াছে, এখন অনায়াসে তেঁতুল খাইতে পার। পুত্রের অনিচ্ছায়ও তখন মা তাহাকে তেঁতুল খাওয়াইয়া থাকেন। ঠিক এইরূপে মহামায়া মা জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

যে সকল সাধক এই অবস্থায় আসিয়া হতাশ হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সম্মুখে গুরু মেধস্ কি অভয় বাণীর বিজয়-পতাকা ধরিয়াছেন দেখ! তিনি বলিতেছেন—"তয়া সম্মোহ্যতে জগৎ" তিনিই এই জগৎকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন—তুমি কি করিবে? মা-ই যে মোহরূপে সাজিয়া তোমায় মুগ্ধ করিতেছেন। ঐ মোহরূপিণী মাকে দেখ। দেখ মা তোমায় মুগ্ধ করিতেছেন। ঐ মোহরূপে তোমার মা। এই বিশ্বাসটী বজ্রবৎ দৃঢ় ধারণায় বুকে বসাও। যতই মুগ্ধ হও না কেন, তুমি মা বলিতে ছাড়িও না। কাম আসে, বল—জয় মা ; কাঞ্চন আসে, বল—জয় মা ; বিষয়-বাসনা আসে—বল জয় মা ; মমতা আসে বল—জয় মা ; তোমার ভয় কি! সবই যে মা! যে মূর্ত্তিতেই আসুক না কেন, তোমার মা-ইত আসেন। হউক ক্ষুদ্র! হউক মলিন! হউক পঙ্কিলতাময়, তিনি তোমার মা, ইহা নিশ্চয়। তুমি তাঁহাকে অবজ্ঞা কর কেন? ঘৃণাব্যঞ্জক কুটিল কটাক্ষে তাড়াইয়া দিতে চাও কেন? মা বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন কর। মা বলিয়া ঐ মোহরূপিণী মায়ের শ্রীচরণে অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলি দাও, আর বল—"মা! তুই ব্রহ্মা

বিষ্ণু মহেশ্বরের প্রসূতি, মহামোক্ষ-প্রদায়িনী রাজরাজেশ্বরী হইয়া এমন কাঙ্গাল বেশে—এমন ক্ষুদ্রতার সাজে, এত মলিনতার ছদ্মবেশ পরিয়া আমার সম্মুখে আসিলি ? হা ভাগ্য আমার !" এমনই করিয়া মোহরূপিণী মায়ের চরণ ধরিয়া কাঁদ, দেখিবে কি হয় ।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥৪০॥

অনুবাদ। সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিগণেরও চিত্তকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া, বিষয়-বিমুগ্ধ করিতে থাকেন ।

ব্যাখ্যা। দেবী শব্দের অর্থ দ্যোতনশীলা। বহুভাবে প্রকাশ হওয়াই তাঁহার স্বভাব। অথবা দিব্ ধাতুর অর্থ ক্রীড়া। এই বহুত্ব ক্রীড়াই যাঁহার স্বভাব, তিনিই দেবী। ভগবতী ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী। এই দুইটী মহামায়ার বিশেষণ। মায়ের আমার এমনই খেলা, এমনই প্রভাব যে, যাঁহারা জ্ঞানী—যাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদের আত্মানাত্ম-বস্তু-বিবেক হইয়াছে, তাঁহাদিগের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া বিষয়াভিমুখী করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহার দেবীত্ব—ইহাই তাঁহার খেলা। এই 'বলাদাকৃষ্য' না হইলে, আচার্য্য শঙ্করের বৌদ্ধদলন, বেদান্ত ভাষ্যাদি বহু গ্রন্থ-প্রণয়ন, সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস, দিগ্বিজয় প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হইত না। এইরূপ জোর করিয়া টানিয়া না নামাইলে, ভক্তবীর গৌরাঙ্গদেবের নানাদেশে ধর্ম্ম প্রচার, পতিতের উদ্ধার প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হইত না। এইরূপ সর্ব্বত্র। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন—যাঁহাদের জ্ঞানভক্তির উজ্জ্বল আলোকে জগৎ ধন্য হইয়াছে ; মনে করিও না—তাঁহারা মহামায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। যতই মিথ্যা, যতই ভ্রান্তি বলুন না কেন, মহামায়া যে নিত্য সত্য, ইহা মুখে না বলিলেও কার্য্য দ্বারা তাঁহারা অজস্র প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।

কোন সাধক এমন মনে করিও না যে, তুমি অহর্নিশ সমানভাবে মায়ের আমার অচিন্ত্য অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য স্বরূপে যুক্ত হইয়া থাকিতে পারিবে। তাহা কস্মিন্‌কালেও হয় নাই, হইবেও না! মৌনী বাবাই হউন, আর পর্ব্বত-কন্দর-নিবাসী কিংবা নির্জ্জন মহারণ্যস্থিত সাধু সন্ন্যাসীই হউন, মহামায়ার প্রভাব হইতে কেহই পরিত্রাণ পান নাই। ওরে! যতদিন দেহ আছে, ততদিন মহামায়া আছেন; বিদেহ কৈবল্য একদিন হয়। যেখানে গেলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, সেইটীই মায়ের আমার পরম ধাম। সেখানে তিনি যেদিন ইচ্ছা করিবেন, সেই দিন লইয়া যাইবেন। তৎপূর্ব্বে কাহারও যাইবার অধিকার নাই। প্রয়োজনই বা কি? মায়ের কোলে থাকিয়া, মায়ের খেলা দেখনা—কি আনন্দময়! এতদিন নিজের সংসার করিয়াছ, আপনি কর্ত্তা সাজিয়া সংসার খেলা খেলিয়াছ। কত আঘাত পাইয়াছ, কত ধূলা ময়লা মাখিয়াছ। এখন মাকে চিনিয়াছ, মাকে পাইয়াছ, মায়ের কোলে থাকিয়া মায়ের সংসার খেলায় যোগ দাও। তখন তুমি কর্ত্তা ছিলে, এখন মা কর্ত্তা। এখন আর আঘাত পাইবে না, ধূলা মাখিবে না। তবে আর খেলা করিতে দোষ কি? কেন ত্যাগ ত্যাগ করিয়া ব্যস্ত হও।

যাঁহারা সাধনার একটু উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন অর্থাৎ মা যাঁহাদিগকে বিশেষভাবে আত্মস্বরূপ বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা এই 'বলাদাকর্ষণে' ভয় পান না, দুঃখিত বা বিষন্ন হন না; কিন্তু প্রথম-প্রবিষ্ট সাধকগণের এই অবস্থা অতীব যাতনাপ্রদ। ধর, একটু ধ্যান, পূজা বা এমন কোন কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে, যাহাতে কিছুক্ষণ মাতৃ-যুক্ত হইয়া থাকিতে পার; কিন্তু একটু যুক্ত থাকিতে না থাকিতে ঐ 'বলাদাকৃষ্য', কে যেন বলপূর্ব্বক চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া বিষয়মুখী করিয়া দিল। অথবা তুমি দৃঢ় সংকল্প করিলে যে জীবনে সৎকার্য্য ব্যতীত অসৎকার্য্য করিবে না; কিন্তু সেখানেও দেখিবে—কে যেন তোমার অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক তোমায় সঙ্কল্পচ্যুত করিয়া দিল। মা ত এইরূপ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিবেনই।

সে আকর্ষণ যে মায়েরই, তুমি শুধু তাহাই দেখিয়া যাও। ইহাই এই মন্ত্রের বিশেষ জ্ঞাতব্য।

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥৪১॥

অনুবাদ। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিত্যপরিবর্ত্তনশীল বিশ্ব তৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়। তিনি প্রসন্না ও বরদারূপে অতিশয় সন্নিহিতা হইলেই মনুষ্যগণ মুক্তিলাভের যোগ্য হয়।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রে চরাচর, জগৎ ও বিশ্ব এই তিনটী শব্দে পুনরুক্তি-দোষ দেখিয়া অনেক টীকাকার অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন। আমরা সে রকম গোলযোগে যাইব না। চর—গমনশীল ; অচর—স্থিতিশীল ; অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম। জগৎ—নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ; বিশ্ব—যাহা নিয়ত মাতৃ-অঙ্কে প্রবিষ্ট হয়। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে ব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অব্যক্ত সত্তায় প্রবেশ করিতেছে, ইহা তাঁহারই রচনা। এই মন্ত্রে সৃজ্যতে শব্দটীর মধ্যে যে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় তিনটি কার্য্য ব্যবস্থিত আছে, তাহা বুঝাইবার জন্যই এ তিনটী শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। চরাচর—সৃষ্টির, জগৎ—স্থিতির এবং বিশ্ব—লয়ের দ্যোতক। সৃষ্টি কথাটীর ভিতর একটু রহস্য আছে। সৃজ্ ধাতুর অর্থ বিসর্গ ও ত্যাগ ; সুতরাং জগৎ সৃষ্টি বলিলে জগৎ-পরিত্যাগ বুঝায়। পূর্ব্বে জগৎ অদৃশ্যভাবে কারণরূপে—মাতৃ-গর্ভে বীজরূপে অবস্থিত ছিল। জগৎ সেই অব্যক্ত ভাব পরিত্যাগ করিল, অদৃশ্য দৃশ্য হইল, কারণ কার্য্য হইল, বীজ বৃক্ষরূপে পরিণত হইল। ইহারই নাম ত্যাগ বা সৃষ্টি। গীতায়ও "ভূতভাবোদ্ভবকরোবিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ" কথাটিতে ঠিক এই তাৎপর্য্যই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

এইখানে আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব—

প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার ইত্যাদি ক্রমে প্রকৃতির পরিণামরূপ সাংখ্যোক্ত সৃষ্টি ; কিংবা আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদিক্রমে মায়ার বিবর্ত্তরূপ বেদান্তোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব অবগত হইলে, প্রথমপ্রবিষ্ট সাধকগণের পক্ষে বিশেষ কিছু লাভ হয় বলিয়া মনে হয় না। উহা জ্ঞানরাজ্যে বিচরণের পক্ষে কথঞ্চিৎ সহায় হয়। যাহা হউক, আমরা অন্য দিক্ দিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে যে অখণ্ড জ্ঞান ও মহতী শক্তির কথা বলিয়া আসিয়াছি, সেই শক্তিটী একটী ইচ্ছামাত্র। এই যে প্রত্যেক জীবের মধ্যে ধনেচ্ছা, পুত্রেচ্ছা, বিষয়েচ্ছা, সুখেচ্ছা ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষণ বিশিষ্ট ইচ্ছার প্রকাশ হইতেছে, ইচ্ছা হইতে ঐ বিশেষণ অংশ পরিত্যাগ করিলে, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী একটী মহতী ইচ্ছার প্রতীতি হয়। অখণ্ড জ্ঞান বা চিৎশক্তি এই মহতী ইচ্ছারূপিণী। সেই অদ্বিতীয়া মহতী ইচ্ছায় বহুভাবে প্রকটিতা হইবার কল্পনা বিকাশ পায়। এই কল্পনাই জগৎ। কল্পনা মনের ধর্ম্ম। নিরঞ্জনা নির্ব্বিকল্পা চৈতন্যময়ী মা যখন মনোময়ী বা ইচ্ছাময়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই এই চরাচর সৃষ্টি হয়। আমাদের নিজ নিজ মনের ভাবগুলি যদি বাহির করিয়া কাহাকেও দেখাইতে পারিতাম, তবে আমরাও এইরূপ সৃষ্টি করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা পারি না, কারণ, আমার মনকে মায়ের মন বা বিরাট্ মন হইতে স্বতন্ত্র কল্পনা করিয়া জীবত্বের গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি ; কিন্তু মনোময়ী মহতী ইচ্ছাময়ী মহামায়া মা আমার যেখানে যেরূপ সঙ্কল্প করেন, সেইখানেই সেইরূপ ভাবে ঘন হইয়া যান ; সুতরাং পদার্থরূপে স্থূলে প্রত্যক্ষ হয়। আমাদের একটী মাটির পুতুল গঠন করিতে হইলে, হস্তপদ সঞ্চালন, মৃত্তিকা-সংগ্রহ ইত্যাদি বহুবিধ অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় ; কিন্তু আমরা যখন মনের দ্বারা কোন পুতুল গঠন করি, তখন কোনও রূপ চেষ্টা বা বিবিধ উপাদান সংগ্রহ করিতে হয় না।

মনে কর, তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ—"সুসজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ

করিয়া সহস্র সহস্র দর্শকগণের উচ্চ জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া, অসংখ্য অট্টালিকাশোভিত মহানগরীর রাজপথে বিচরণ করিতেছ।” এ স্থলে যেরূপ ঐ হস্তী, দর্শকবৃন্দ, অট্টালিকা, রাজপথ প্রভৃতি তোমার মনের কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে ; অথচ স্বপ্নদর্শন-কালে এত প্রত্যক্ষ এত স্থূলভাবে উহার প্রতীতি হয় যে, আর উহাকে কল্পনা বলিয়া ভাবিতেও পার না ; সেইরূপ মনোময়ী মা আমার বহুত্বের কল্পনা করিয়া আপনাকে বহুভাবে প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই সৃষ্টিতত্ত্ব। পূর্ব্বে বলিয়াছি—তিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দময়ী ; সুতরাং তাঁহার এই সৃষ্টি অথবা বহুভাবের মধ্যেও তাঁহার সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দরূপ ত্রিবিধ বিকাশ সুস্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত। আর একটি বিশেষত্ব এই—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয়া ; তাই, তাঁহার এই সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থ অদ্বিতীয়। দুইটি প্রাণী, দুইটী পত্র, এমন কি দুইটী বালুকণাও একরূপ নহে। সাধক! একবার চক্ষু খুলিয়া দেখ, সর্ব্বত্র মা আমার অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন। যতই বহুত্ব, যতই ক্ষুদ্রত্ব লইয়া আত্মপ্রকাশ করুন না কেন, এই অদ্বিতীয়া সচ্চিদানন্দময়ী মূর্ত্তির ব্যাঘাত কোথাও হয় নাই! এই জগৎই মায়ের আমার স্থূল মূর্ত্তি। যে ইহাকে মা বলিতে না পারিবে, যে ইহাকে মা বলিয়া না দেখিবে, সে কিরূপে মায়ের জগদতীত অতি সূক্ষ্ম—কেবল জ্ঞান, কেবল ইচ্ছা, কেবল শক্তি-মূর্ত্তি দর্শন করিবে? মনোময়ী মাকে ধরিতে না পারিলে, বিশুদ্ধ চৈতন্যময়ী মাকে কিরূপে পাইবে? যাক্—সে অন্য কথা।

এই সৃষ্টি তিনি কেন করিলেন? তাঁহার ইচ্ছা ; এই বৈচিত্র্য কেন? তাঁহার লীলা। একজন বাহক একজন বাহ্য, কেহ প্রভু কেহ ভৃত্য, কেহ পাপী, কেহ পুণ্যবান্। এ সকলই তাঁহার লীলা। তিনি কাহাকেও দণ্ড বা পুরস্কার দিতেছেন না। কর্ম্মফল, পুরস্কার তিরস্কার, সাধুর পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশ ইত্যাদি জ্ঞানের প্রথম স্তর। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা না যায়, ততক্ষণ জীব এই সকল জ্ঞানে বিচরণ করিতে বাধ্য হয় ; কিন্তু বিশ্বরূপ-দর্শনের পর সাধক দেখে—

"প্রিয়োঽসি মে", "অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য আত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু" সবই যে তিনি, তিনি ছাড়া কোথাও কিছু নাই, সুতরাং কর্ম্মফল, দণ্ড বা পুরস্কার ইত্যাদি কিরূপে বলিব? মনে কর—তোমার চিত্তে যখন সৎপ্রবৃত্তি প্রকাশ পায়, তখন তুমি তাহাকে পৃথক্ একজন বোধে পুরস্কৃত কর না; অথবা অসৎবৃত্তি প্রকাশ পাইলে, তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দাও না, সবই যে তোমাতে ফুটিতেছে। ইহাও সেইরূপ। মা আমার—"সৎ অসৎ তৎপরং যৎ"। কর্ম্মফলানুরূপ সৃষ্টিবৈচিত্র্য—জ্ঞানের বিচারে যথার্থ। মায়ের এই স্বাধীন লীলারঙ্গের ভিতর কার্য্য-কারণ-পরম্পরা অনুসন্ধান করিতে গেলে, এইরূপ অসংখ্য শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষীভূত হয়। সেই নিয়ম ও শৃঙ্খলাগুলি আবিষ্কার করিতে গিয়াই দার্শনিক অথবা পৌরাণিক সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

যাহা হউক, চরাচররূপে মা আমার সৃষ্টিশক্তিময়ী ব্রহ্মমূর্ত্তি, জগৎরূপে পালন-শক্তিময়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং বিশ্বরূপে সংহরণ-শক্তিময়ী শিবমূর্ত্তি। এই সৃজনাদি তিনটি ব্যাপার যে স্থানে সংঘটিত হয়, তাহাই ঈশ্বর, অক্ষর পুরুষ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। মহামায়া মায়ের অন্তরে এই তিনটি ভাব অব্যক্তভাবে লুক্কায়িত ছিল। তাহা প্রকাশযোগ্য করিতে গিয়া, তিনি সেই অব্যক্ত ভাব পরিত্যাগ করিলেন। তাই, বিসৃজ্যতে অর্থ—ত্যাগ। ইহাই তান্ত্রিকগণের কারণার্ণবে মহাকালীর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের প্রসব।

ইনি যখন নরগণের মুক্তিরূপে অর্থাৎ বহুরূপ পরিত্যাগ করিয়া মাত্র শুদ্ধ বোধরূপে পরিব্যক্ত হইবার জন্য—মনোময়ী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইবার জন্য উদ্যত হয়েন, তখনই মা আমার প্রসন্না ও বরদারূপে প্রিয়তম সন্তানগণের নিকট অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। আরও দেখ, এই নিত্যতৃপ্তা, নিত্যপ্রসন্না, নিত্য-বরদায়িনী মা জীবগণের মুক্তির জন্য অন্তর হইতে অন্তরে—অতি নিকটে অবস্থান করিতেছেন। তাই, মন্ত্রে "এষা" এই একান্ত সান্নিধ্যবোধক এতদ্ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥৪২॥

অনুবাদ। তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা, পরমা ও অপরমা সুতরাং বন্ধন ও মুক্তি উভয়েরই হেতু। সেই সনাতনী মা সর্ব্ব এবং ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী।

ব্যাখ্যা। মহামায়া মা আমার বিদ্যারূপিণী। বিদ্যা—'যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে'। যাহা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহার নাম বিদ্যা। বিদ্যা ও অবিদ্যা-ভেদে বিদ্যা দ্বিবিধা। অবিদ্যা শব্দের অর্থ বিদ্যাবিরোধী কিছু নহে ; কারণ, বিদ্যা স্বপ্রকাশরূপা। তাহার বিরোধী কিংবা আবরক কিছুই থাকিতে পারে না। এখানে নঞ্‌টী ঈষৎ-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিদ্যা যখন পরিচ্ছিন্ন জীবাদিরূপে প্রকটিতা হন, তখনই তিনি অবিদ্যা নামে—বিদ্যাবিরোধি-রূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন। এখানে 'সা বিদ্যা', শব্দে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই বুঝাইতেছে। এইরূপে পরমা-শব্দটীও পরমা অপরমা উভয় অর্থের দ্যোতক। অকার-প্রশ্লেষ করিলেই ঐরূপ অর্থ হয়। "পরান্ ব্রহ্মাদীন্ অপি মাতি ইতি পরমা।" ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও নিয়মনকর্ত্রী ; তাই মা আমার পরমা। অপর অর্থাৎ জীব-জগতেরও নিয়মনকর্ত্রী ; তাই, মা আমার অপরমা; সুতরাং মুক্তি এবং সংসার-বন্ধ এই উভয়েরই কারণস্বরূপা। তিনি সনাতনী—নিত্যা, অতএব সর্ব্ব, অর্থাৎ জীবজগৎ এবং ঈশ্বরী অর্থাৎ মায়োপহিত চৈতন্য (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) এই উভয়ের তিনিই ঈশ্বরী। এক কথায় মহামায়াই সর্ব্ব, ঈশ্বর এবং এতদুভয়ের অতীত। মহামায়াই ক্ষর অক্ষর পুরুষোত্তম, জীব ঈশ্বর ব্রহ্ম, মন প্রাণ আত্মা, জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞ এই ত্রিবিধ বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

এই মন্ত্রে মুক্তি ও সংসার-বন্ধ এই দুইটি কথা আছে ; সুতরাং এস্থলে তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক। জীব যতদিন বিশুদ্ধ চৈতন্যের আভাস না পায়, ততদিন সংসার-বন্ধন মনেই করিতে পারে না। মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতে হইলে,

যে ক্ষুদ্রত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেই ক্ষুদ্রতার—পরিচ্ছিন্নতার যে একটা যাতনা আছে, যতদিন জীব ইহা উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদিন মুখে সহস্রবার বন্ধন বন্ধন বলিলেও, যথার্থ বন্ধন-জ্ঞান হইতে পারে না। এক কথায়—মাকে দেখিবার পূর্ব্বে বন্ধন-জ্ঞানই হয় না। একবার উন্মুক্ত গগন-বক্ষে বিচরণ না করিলে, পিঞ্জরে অবস্থান যন্ত্রণাপ্রদ মনেই হয় না। বন্ধনের স্বরূপ কি? মন,—যতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণই বন্ধন, ততক্ষণই সংসার। একটী আত্ম-সংবেদন আছে—"সংসারবীজং মন এব বিদ্ধি, ন পুত্র-ভার্য্যাদ্রবিণাদিকং হি। সংসারনাশো মনসোলয়েন, ন তদ্ গৃহস্থাশ্রম-বর্জ্জনেন।" মনই হইতেছে সংসারের কারণ; পুত্র ভার্য্যা ধন বিষয় ইহারা সংসার নহে। মনের লয় হইলেই সংসার বন্ধন দূর হয়। গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিলেই সংসার-ত্যাগ হয় না।

মুক্তি! বড় দূরের কথা; বন্ধনজ্ঞান! বড় দূরের কথা; জানি মা! যে মুহূর্ত্তে যথার্থ বন্ধনজ্ঞান ফুটিবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি নিত্যমুক্ত; কারণ, আমি যে ইচ্ছাময়ীর বরপুত্র। এখনও যে মা! বন্ধন-অবস্থায়ই বেশ প্রীতিকর বোধ হয়! আমরা যতই কিছু করি না কেন, বন্ধনটী বজায় রাখিতে খুবই ভালবাসি। মা! এ জগতে যাঁহারা শক্তিমান্ মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও ত তোমার দেওয়া দুই চারিটী সিদ্ধির মুকুট মাথায় পরিয়া, আমিত্বকে মহত্ত্ব-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কই মা! তাঁহাদের মধ্যে যথার্থ মুক্তিপ্রয়াসী কয়জন ছিলেন? তারপর যাঁহারা তোমার রক্ত চরণের সমীপস্থ হইয়া শুদ্ধা ভক্তি বা বিশুদ্ধ জ্ঞান ভিক্ষা করিয়া জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক নামে পরিচিত, তাঁহারাও ত আমিত্বটীকে রক্ষা করিতে—বদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতে বিশেষ সচেষ্ট। তবে তাঁহাদের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা আমিত্বের মলিন পোষাকগুলি খুলিয়া ফেলিয়া, উজ্জ্বল বহুমূল্য পোষাকে বিভূষিত হইতে চাহেন। কই মা! তাঁহারাই কি মুক্তি-প্রয়াসী? আর যাঁহারা সংসার-সন্তাপে বিদগ্ধ হইয়া মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সংসারের

অভাব অভিযোগগুলি দূরীভূত হইলেই মুক্তিপ্রয়োজন অবসিত হয়। আমরা কিন্তু জানি মা! এ জীবত্ব থাকিতে তোমার জগৎপ্লাবী অসীম স্নেহ সম্ভোগ করা যায় না। এ ক্ষুদ্র বক্ষ তোমার সেই অসীম স্নেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। এই ক্ষুদ্র নয়নদ্বয় তোমার চির-লোভনীয় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী রূপরাশি গ্রহণ করিতে পারে না। এ ক্ষুদ্র শ্রবণবিবর তোমার কমনীয়কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুধাময় আহ্বানরূপ প্রণবধ্বনি ধরিয়া রাখিতে পারে না। তোমার অঙ্গনিঃসৃত দিব্যগন্ধ বহন করিবার সামর্থ্য এ ক্ষুদ্র নাসিকার নাই। এ ত্বক্ তোমার সে আত্মহারা স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। এ ক্ষুদ্র শিশুহস্ত তোমার ত্রিভুবনব্যাপী শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি-চন্দন-মিশ্রিত কুসুমসম্ভার অর্পণ করিতে পারে না। আমার এই একটি মস্তক তোমার সহস্র চরণে প্রণাম করিতে সমর্থ হয় না। আমি কিরূপে তোমার সে আকুল স্নেহ অনুভব করিব! ওগো, কূপে থাকিয়া কি আকাশব্যাপিনী সুধাময়ীচন্দ্রিকা পান করা যায়! তাই মা, তোমার স্নেহ ভোগ করিতে হইলে—যথার্থ আত্মপ্রেমে বিহ্বল হইতে হইলে, মুক্ত হইতেই হইবে। মা! আমরা মুক্তির জন্য মুক্তি চাহি না। মুক্তির কোন প্রয়োজনই নাই—যদি বদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া তোমার স্নেহ ভোগ করিতে পারিতাম! অথবা আমরা জানি—যে দিন জীব তোমাকে প্রাণ বলিয়া, আত্মা বলিয়া বুঝিতে পারে—যে দিন তোমাকে আত্মদান করিয়া আত্মময় হইতে পারে—সেই দিন বন্ধন বা মুক্তি বলিয়া আর কিছুই থাকে না। আত্মদান করার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই জীববক্ষে তুমি বন্ধন ও মুক্তিরূপে প্রকাশিত হও।

মা! তুমি ত নিত্যমুক্ত; তথাপি অনাদিকাল হইতে এই জগদ্-বন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছ। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বন্ধন তোমারই অঙ্গের নিত্যভূষণ। এত বন্ধনে থাকিয়াও তুমি নিত্য মুক্ত! আর আমি—আমি আমার নিত্যমুক্ত মায়ের কোলে অবস্থান করিয়াও বদ্ধ! ধিক্ আমাদের সঙ্কীর্ণ জ্ঞানকে! ধিক্ আমাদের পুত্রত্বে! যে পুত্র নিত্য উন্মুক্ত মাতৃ-বক্ষে লালিত পালিত হইয়াও, আপনাকে

বদ্ধ বলিয়া মনে করে, তাহার পুত্রত্ব বিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু সে অন্য কথা :—

যতক্ষণ বন্ধনজ্ঞান প্রাণে না ফোটে, যতদিন খাই দাই বেড়াই বেশ আছি, বন্ধন আবার কি? এই ভাবটা দূরীভূত না হয়, ততদিন বুঝিতে হইবে—মা আমার এখনও তাহার বক্ষে বন্ধন-জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হন নাই। প্রার্থনা করিলেই তিনি সেইরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তখন অসহনীয়বন্ধন-যাতনার বোধ হইতে থাকে; সেই যাতনা হইতেই মুক্তির কামনা ফোটে। তখন মা জীবকে ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে লইয়া যান। যদি সেই সকল উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রবল মুক্তিকামনা জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারে, তবেই মুক্তিরূপিণী মা আমার স্নেহের সন্তানকে আপন বক্ষে মিলাইয়া লয়েন। যে দুইটী অবস্থার ভিতর দিয়া জীব এই মোক্ষধামে উপনীত হয়, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্যই মন্ত্রে সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। সর্ব্ব এবং ঈশ্বর এই উভয়েরই ঈশ্বরী। প্রথমতঃ সর্ব্বত্বে মুগ্ধ জীব মায়ের আমার সর্ব্বরূপে—জগৎ-ধূলি গায়ে মাখিয়া পরিতৃপ্ত থাকে। এইটি জীবভাব বা সর্ব্বভাব। তারপর এই সর্ব্ব যাহাতে জাত, স্থিত ও সংহৃত সেইটি ঈশ্বরভাব। প্রথমে জীব সর্ব্বত্ব হইতে এই ঈশ্বরত্বে উপনীত হইতে প্রয়াস পায়। অবশেষে এতদুভয়ের অতীত পরমভাব। যাহাতে এই উভয় স্বরূপ সম্যক্‌ভাবে অবস্থিত, অথচ যাহাকে পাইলে, এতদুভয় অবস্থা আর অনুভবে আসে না, সেইটি মায়ের সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী-স্বরূপ!

মনে কর—তুমি বস্ত্র দেখিতেছ; যতক্ষণ তুমি বস্ত্রে মুগ্ধ, ততক্ষণ নাম, রূপ ও ব্যবহার-রূপিণী মায়ের সর্ব্বরূপে অবস্থান করিতেছ। তারপর বস্ত্রের কারণ স্বরূপ সূত্রাংশে দৃষ্টি নিপতিত হইল। এইটি মায়ের ঈশ্বরস্বরূপের দৃষ্টান্ত। অবশেষে সূত্রের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলে, তূলা ভিন্ন কোথাও কিছুই নাই। তখন তোমার নিকট হইতে বস্ত্রের নাম, রূপ, গুণ এবং কারণ অর্থাৎ সূত্র সকলই অদৃশ্য হইয়াছে। তখন তুমি মহাকারণে মুগ্ধ। ইহাই মায়ের

আমার সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী-স্বরূপের উদাহরণ। এই তিন স্বরূপে যে ব্যক্তি কামচার অর্থাৎ স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারে, সে-ই আপ্তকাম মহাপুরুষ। সে-ই বন্ধন ও মুক্তির অতীত। জীবশ্রেণীতেও এই ত্রিবিধ ভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কতক বদ্ধ, কতক মুক্ত এবং কতিপয় এতদুভয়ের অতীত। (মুমুক্ষু জীব বদ্ধের অন্তর্গত)। এই তিনটি অবস্থাই যথাক্রমে অবিদ্যা, বিদ্যা ও পরমা নামে অভিহিত হয় এবং এই তিন অবস্থারই মধ্য দিয়া যে সত্য ও নিত্য বস্তুটী অবিকারী ভাবে অনুস্যূত রহিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্যই মন্ত্রে সনাতনী শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

রাজোবাচ।

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্।
ব্রবীতি কথমুৎপন্না সা কর্ম্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥৪৩॥
যৎস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ত্বত্তোব্রহ্মবিদাংবর ॥৪৪॥

অনুবাদ। রাজা বলিলেন—হে ভগবন্! হে দ্বিজ! আপনি যাঁহাকে দেবী মহামায়া বলিলেন তিনি কে? তিনি কেন উৎপন্ন হন? তাঁহার কর্ম্মই বা কি? তাঁহার যেরূপ স্বভাব, যে স্বরূপ এবং যাহা হইতে তিনি উদ্ভূতা, হে ব্রহ্মবিদ্বর! আমি আপনার নিকট হইতে সেই সকল তত্ত্ব শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

ব্যাখ্যা। এতক্ষণ রাজা অবহিতচিত্তে গুরু মেধসের বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে এতই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন এবং মহামায়ার ঈষৎ অভাস পাইয়া, তাঁহার স্বরূপ জানিবার জন্য এতই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন যে, 'সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি' বলিয়া মনের প্রবল আগ্রহ বাহিরে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহাকে জানিবার জন্য ঐরূপ একটা আগ্রহ দেখিতে পাইলেই, গুরু প্রসন্ন হন। এস্থলে সুরথের

ব্যাকুলতা গুরুতে ভগবদ্‌বুদ্ধির অপলাপ ঘটায় নাই; তাই, প্রথমে 'ভগবন্' সম্বোধন। ভগবান্ না হইলে ভগবৎ-তত্ত্ব কে বলিবে? তাঁহার কথা, তাঁহার স্বরূপ তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও বলিবার অধিকার বা সামর্থ্য নাই; ইহা সুরথ ভালরূপ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই প্রথমে ঐরূপ সম্বোধন করিলেন; এ মন্ত্রে আর একটী শব্দ আছে— ব্রহ্মবিদ্‌বর। শ্রুতি বলেন—'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই সাকার ব্রহ্ম। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যতীত ব্রহ্মতত্ত্ব কে বিশ্লেষণ করিবে? সৌভাগ্যবলে জীবের যদি ব্রহ্মজ্ঞগুরু লাভ হয়, তবে সকল আশঙ্কা ও সন্দেহের মূল উৎপাটিত হয়।

আধ্যাত্মিকভাবেও দেখা যায়—জীবাত্মা সমাধিস্থ হইয়া শুদ্ধবোধে অবস্থান করিতে পারিলেই, তাহার এই সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে। শুদ্ধবোধ আত্মোপলব্ধির সর্ব্বশেষ উপায়। আত্মা—মা আমার শুদ্ধবোধেই উজ্জ্বলরূপে প্রতিবিম্বিত। এই জন্য ইহাকে ব্রহ্মবিদ্ বলা হয়। জীবাত্মা এতক্ষণ সমাধি-সহায়ে এই বোধে অবস্থান করিরা একমাত্র মহামায়া বা অজ্ঞেয়া মহতী শক্তিতত্ত্ব কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়াছেন! জীব বহু সৌভাগ্যবলে এই শক্তিতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ না হইলে—ব্রহ্মজ্ঞানের আভাষ না পাইলে, এই শক্তিতত্ত্ব স্ফুরিত হয় না।

একবার এই শক্তি বা মহামায়ার সমীপস্থ হইতে পারিলে, জীবের যাবতীয় দুশ্চিন্তা ত্রিতাপজ্বালা সংসারের মোহজনিত উদ্বিগ্নতা সকলই তিরোহিত হয়। সুরথ এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে—জীব যে সংসারমোহে মুগ্ধ হয়, ইহা মহামায়ার ইচ্ছা বা লীলামাত্র। তাই মহামায়ার স্বরূপ বিশেষরূপে অবগত হইবার জন্য যুগপৎ এই ছয়টি প্রশ্ন করিলেন। (১) তিনি কে? (২) তিনি কেন উৎপন্ন হন? (৩) তাঁহার কর্ম্ম কি? (৪) তাঁহার স্বভাব কিরূপ? (৫) তাঁহার স্বরূপ কি? (৬) এবং কোথা হইতে তাঁহার উদ্ভব।

ঋষিরুবাচ।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তি র্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥৪৫॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥৪৬॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—তিনি নিত্যা; এই জগৎই তাঁহার মূর্ত্তি; তিনি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তথাপি তাঁহার বহুবিধ উৎপত্তি-বিবরণ আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। (তাঁহার নিজের কোন কার্য্য নাই) দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য যখন আবির্ভূ্তা হন, নিত্যা হইলেও তখন তিনি উৎপন্না বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা। সুরথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মহামায়া—কে? ঋষি তাহার উত্তরে বলিলেন—তিনি নিত্যা; তাঁহার ধ্বংস ও উৎপত্তি নাই; সুতরাং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন; কারণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থমাত্রই পরিচ্ছিন্নতা-নিবন্ধন ধ্বংসোৎপত্তিশীল। আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা গ্রহণ করি, ধ্বংস এবং উৎপত্তি তাহার ধর্ম্ম। মহামায়াতে সে ধর্ম্ম নাই। তাই, তিনি নিত্যা—অতীন্দ্রিয়া।

সাধক! তোমার ভিতরে যে চৈতন্য-সত্তা রহিয়াছে—প্রতিনিয়ত যাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছ, উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে; অথচ নিত্য-সত্য—উহার ধ্বংস নাই, উৎপত্তি নাই, বৃদ্ধি নাই, অপচয় নাই, উহা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অশোষ্য, অক্লেদ্য; উহা তোমার অপ্রাপ্য না হইলেও ধরিতে, বুঝিতে বা ভোগ করিতে পারিতেছ না; অথচ প্রতিনিয়ত তাঁহাকেই সম্ভোগ করিতেছ। তুমি জন্ম মৃত্যু বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য প্রভৃতি পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আসিতেছ; কিন্তু তাঁহার সঙ্গচ্যুত কখনই হও নাই। তোমার কতই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, হইবে; কিন্তু তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন নাই। স্থূল কথায়, যাহাকে তোমরা প্রাণ

বল, ঐ যে চেতনা—ঐ যে হুঁস্, যাহা আছে বলিয়া তুমি আছ, তিনি অণু কি মহান্ তাহা বলা যায় না। উহার নাম নাই, রূপ নাই, গুণও কিছু নাই। এইরূপে সাধারণভাবে তাঁহাকে জানিয়া লও। বাস্তবিক কিন্তু তাঁহাকে জানা যায় না; কারণ, তিনিই জ্ঞানস্বরূপ। জানার ভিতরে আসিলেই তাঁহার নিত্য-স্বরূপটীর বিলক্ষণতা ঘটে।

শিষ্য যখন ভগবৎস্বরূপ জানিতে চায়, তখন তাহাকে এই পর্য্যন্ত বলিলে, সে মনে করিতে পারে—ইহার আবার লাভ কি? সাধনাই বা কি? ইনি ত সুলভ হইয়াও অলভ্য, সাধনার অতীত; কারণ, সাধনা একটা ধর্ম্মবিশেষ, তিনি ত সর্ব্ব ধর্ম্মের অতীত; সুতরাং সাধন-লভ্য বা সাধ্য নহেন; কিন্তু ইহাতে ত সাধকের পিপাসা-নিবৃত্তি হয় না। সে চায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে—ভোগ করিতে। জগদ্-ভোগে অভ্যস্ত জীব যতক্ষণ মাকে ভোগের ভিতর আনিতে না পারে, যতক্ষণ প্রাণ খুলিয়া সুখদুঃখের কথা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার চরণে নিবেদন করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার প্রাণের পিপাসা মিটে কি? তাই, আবেগ ভরে শিষ্য বলিতে থাকে,—হউন তিনি নিত্যা, হউন না তিনি অজ্ঞেয়া, তাঁহাকে আমার সম্ভোগযোগ্য করিয়া দাও গুরো! আমার প্রত্যক্ষযোগ্য করিয়া দাও। এইরূপে যখন শিষ্যের কাতরতা পূর্ণ-ব্যাকুলতায় পরিণত হয়, তখনই অহৈতুক কৃপানিধান গুরু শিষ্যের অজ্ঞানান্ধচক্ষু উন্মীলিত করিয়া, ধীরে গম্ভীরে বলিতে থাকেন—পুত্র শিষ্য! সাধক! সত্যই কি তুমি মাকে—মহামায়াকে দেখিতে চাও? যথার্থই কি তাঁহাকে পাইবার জন্য তোমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে? তবে দেখ—যাহা চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছ, যাহা বহু জন্ম হইতে ভোগ করিয়া আসিয়াছ, যাহাকে নশ্বর বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ করিবার জন্য বহুবার ব্যর্থ-প্রয়াস হইয়াছ, স্বপ্ন বলিয়া ভ্রান্তি বলিয়া স্বকীয় দিব্য নেত্রে স্বয়ং মসীলেপন করিয়াছ, তাঁহাকে দেখ—"জগন্মূর্ত্তি।" এই জগৎই তাঁহার প্রকট মূর্ত্তি।

সাধনা-পথে ইহা অপেক্ষা সারবান্ উপদেশ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এই জগৎকে মা বল। বিশ্বাস করিতে

না পার, নকল করিয়া বল, মিথ্যা করিয়া বল; কারণ উহা মিথ্যা নহে। বায়ু অদৃশ্য; কিন্তু প্রবাহরূপে প্রকাশ পাইলে, উহা সকলেরই ভোগ্য হয়। সেইরূপ মা আমার নিত্যস্বরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নহেন; ভোগ্যা নহেন; কিন্তু আমাদের জন্য নিত্যভোগ্য এই স্থূল জগন্মূর্ত্তিতে তিনি নিত্য বিরাজিতা; প্রকট মূর্ত্তিতে যদি বিশ্বাস করিতে না পার, তবে অচিন্তনীয় তত্ত্ব কিরূপে ধারণা করিবে? যে যথার্থ পিপাসু তাহার ইহাতে কোনরূপ বিচার বিতর্ক সন্দেহ কিছুই আসিতে পারে না। সে বুঝিবে—হায়! আমি এতদিন কি ভ্রান্তিতে ছিলাম, এতদিন ইহাকে জগৎ বলিয়া ভোগ করিয়া আসিয়াছি, একদিনও ত মা বলিয়া ভোগ করি নাই। আর না, এখন গুরুকৃপায় বুঝিতে পারিলাম, ইনিই মা। আজ আমার মাতৃ-লাভ হইল, আর আমি কিছুই চাই না। যে দিকে চাহিব সেই দিকেই মা, যাহা ধরিব তাহাই মা, তবে আর আমার অভাব কি? আমার কাতর প্রার্থনা, আমার ভক্তিহীন প্রণাম, আমার কৃতজ্ঞতার অশ্রু গ্রহণ করিবার জন্য আমার মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে না, আমি যেখানে অর্পণ করিব, সেইখানেই তিনি গ্রহণ করিবেন। ইহা অপেক্ষা সুখের ও আনন্দের বাণী আর কি আছে! ধন্য শ্রীগুরু! যিনি আমায় অকূল সাগরে কূল দেখাইয়া দিলেন। মা কোথায়, ভগবান্ কোথায় বলিয়া কত অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু কোন সন্ধানই পাই নাই। অন্বেষণ যত করিয়াছি, তাঁহার দূরত্ব ততই বোধ হইয়াছে; এখন বুঝিলাম তিনি নিকট হইতেও নিকটে অবস্থিত; আর আমার ভয় কি? এই বলিয়া সে তাহার সাধনার সূত্রপাত করিবে। নূতন জীবন পাইয়া, অভিনব উৎসাহে পূর্ণ অধ্যবসায়ের সহিত প্রতি কার্য্যে, প্রতি জগদ্ব্যাপারে সে মাতৃ-যুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে। সাধক! এইস্থানে "মহামায়া প্রভাবেণ" ইত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা আর একবার পড়িয়া লও। ঋষি-বাক্যে পূর্ণ শ্রদ্ধা পূর্ণ বিশ্বাস আনিতে প্রয়াস পাও; দেখিবে—তোমার শুভদিন কত সন্নিহিত! সাধনার সফলতা, জীবনের চরিতার্থতা, নিশ্চয়ই অনুভব করিতে পারিবে।

যাঁহারা গীতার "যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি" এই মন্ত্রটীর সাধনায় অগ্রসর হইয়া, চণ্ডীতত্ত্বে প্রবেশপূর্ব্বক সমাধি-সহায়ে শুদ্ধ-বোধরূপী গুরুর নিকট হইতে শুনিবেন—"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি" তাঁহাদের সকল আশা মিটিয়া যাইবে, প্রাণে পূর্ণ পরিতৃপ্তি আসিবে। আর যাঁহারা বলিবেন—এটা ত জানা কথা! এ আর কে না জানে যে, ভগবান্ সর্ব্বভূতে বিরাজিত; এ আর নূতন কথা কি! এই বলিয়া যাঁহারা নূতন রহস্যের অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিবেন, তাঁহারা নিশ্চয় নূতন অন্বেষণ করিতে করিতে, এই চির পুরাতন সর্ব্বজনবিদিত সত্যে আসিয়া উপনীত হইবেন! সর্ব্ব শাস্ত্র ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। বৈদিক যুগের সাধন-প্রণালীও যে, এই বিশ্বরূপ হইতে আরম্ভ হইত, তাহা উপনিষদে বিশদ্‌ভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে! সাধনাব্যাপার যতদিন অতি সহজ বলিয়া প্রতীত না হয়, ততদিন সাধকের আধ্যাত্মিক গতি মৃদুভাবে থাকে। আজকাল এমনই একটা যুগ আসিয়াছে যে, সাধনা বলিলে মনে হয়, কি যেন একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কত ত্যাগ, কত সংযম, কত কঠোরতা করিতে হইবে। ইহা কিন্তু ঋষিযুগের কথা নহে। তাঁহারা সরল সত্যবিশ্বাসে এই বিশ্বরূপে উপাসনা করিতেন এবং তাহারই ফলে তাঁহাদের ঋষিত্ব-লাভ হইত। যাহা দেখিতেন তাহাই ভগবদ্‌বোধে গ্রহণ করিতেন। যাঁহারা জল দেখিয়া বলিতেন—'আপঃ শুদ্ধন্তু মৈনসঃ' 'আপোহি ষ্ঠা ময়োভুবস্তানউর্জ্জে দধাতন, মহেরণায় চক্ষষে।' অগ্নি দেখিয়া বলিতেন—"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্"। বায়ু স্পর্শ করিয়া বলিতেন—'মধু বাতা ঋতায়তে'। সূর্য্য দেখিয়া বলিতেন—'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি'। পুষ্প দেখিয়া বলিতেন—"শ্রীরসি ময়ি রমস্ব"। ভূমি দেখিয়া—"মধুমৎ পার্থিবং রজঃ" বলিতে বলিতে সরলপ্রাণ নগ্ন শিশুর মত মাটীতে গড়াগড়ি দিতেন, সেই পূতনামা ঋষিদিগের সরল সত্য-সাধনা আবার কতদিন ভারতের প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে! সত্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, সত্য প্রতিষ্ঠায় বীর্য্যবান্ হইয়া, সত্যলাভে কৃতার্থ হইয়া

ভারত করে বলিবে—এ জগৎ মহাসত্য! কবে বলিবে—ভূমি সত্য, জল সত্য, বায়ু সত্য, আকাশ সত্য, মন সত্য, প্রাণ সত্য! সত্যের উজ্জ্বল আলোকে কতদিনে মিথ্যর কলঙ্ক-কালিমা অপনীত হইবে! কিন্তু সে অন্য কথা ঃ—

এই জগন্মূর্ত্তি মহামায়ার দর্শন বা সত্যপ্রতিষ্ঠা সর্ব্বপ্রথমে জড় পদার্থ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। যেহেতু চেতন জীবের ভাবচাঞ্চল্য সাধন-সমরে প্রথম-প্রবিষ্ট সাধকের মাতৃত্ব-বোধে—সাধনার ব্যাঘাত জন্মায়। তাই, প্রথমে বৃক্ষলতা ফল ফুল মৃত্তিকা প্রস্তর চন্দ্র সূর্য্য আকাশ প্রভৃতি পদার্থ-অবলম্বনে মাতৃ-বোধ বা সত্য জ্ঞান উদ্বুদ্ধ করিতে হয়। এইরূপ সাধনা অর্থাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে করিতে চিত্ত-বিক্ষেপবশতঃ মায়ের কথা ভুলিয়া, বিষয়াভিমুখী হইলেও ক্ষতি নাই। মনের চঞ্চলতা যেমন মাকে ভুলাইয়া দিবে, তেমনই নানা কার্য্যের ভিতর দিয়া মধ্যে মধ্যে মাকে স্মরণও করাইয়া দিবে। সাধক! তুমি শুধু সেই স্মরণ-মুহূর্ত্তটুকুর সদ্‌ব্যবহার করিতে যত্নবান্ হও। যতক্ষণ ভুলিয়া থাক, তাহার জন্য অনুশোচনা করিবে না; কারণ, ভ্রান্তিরূপেও মা-ই বিরাজিতা। যে মুহূর্ত্তে তাঁহার কথা মনে পড়িয়া যাইবে, সেই মুহূর্ত্তে যাহা সম্মুখে পাইবে, তাহাই তোমার প্রত্যক্ষ মা, এই সরল সত্য-বিশ্বাসে পূর্ণকাম-নিশ্চিন্ত পুরুষের মত দাঁড়াইবে। কিছুদিন এইরূপ করিতে অভ্যস্ত হইলেই মা যে জগন্মূর্ত্তিতে প্রকটিতা, তাহা উপলব্ধিযোগ্য হইবে।

সুরথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তাঁহার স্বরূপ কি? ঋষি তাঁহার উত্তরে বলিলেন—এই জগৎই তাঁহার স্বরূপ। এইবার তাঁহার স্বভাব কি তাহার উত্তর দিতেছেন—"তয়া সর্ব্বমিদং ততম্"। এই জগৎ তাঁহা কর্ত্তৃক পরিব্যাপ্ত। এই কথাটি দ্বারা শিষ্যহৃদয়ের একটি অমূলক আশঙ্কাও বিদূরিত হইল। সেই আশঙ্কাটি এই—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তিনি নিত্য হইয়াও অনিত্য জগদাকারে প্রকটিতা। এই অনিত্য স্বরূপের সাধনা করিলে আমাদের কি লাভ হইবে? আমরা নশ্বর—অনিত্য বলিয়াই ত নিত্য বস্তুর সন্ধান করি! অনিত্যের সাধনায়

নিত্যলাভ ত দূরের কথা, অনিত্যতা আরও ঘনীভূত হইবে না কি? কারণ, যে যাহার সাধনা করে, সে তাহাই হয়, সুতরাং অনিত্য জগতের সাধনা করিয়া আমরাও ত অনিত্যই থাকিব! "তয়া সর্ব্বমিদং ততম্" কথাটীতে এইরূপ আশঙ্কাও দূরীভূত হইল। তিনি অনিত্য জগন্মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইলেও, তাঁহার নিত্য-স্বরূপটি সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ —ওতপ্রোতভাবে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। তিনি নিজে নিত্যস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া, এই নামরূপাত্মক অনিত্য জগদাকারে প্রকাশিত হন নাই। যেরূপ, বস্ত্রের প্রত্যেক পরমাণুই তূলা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, কিম্বা বরফের প্রত্যেক পরমাণুই জল ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; সেইরূপ এই অনিত্য জগতের প্রত্যেক কল্পিত অণুই নিত্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; সুতরাং আশঙ্কার কোন হেতু নাই। অনিত্য জগৎকে মা বলিতে গিয়া, তোমাকে নিত্য বস্তু হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না। তূলান্বেষী যদি বস্ত্রখণ্ড পায় কিংবা জলপানেচ্ছু যদি তুষারখণ্ড পায়, তবে সে কি অন্বেষ্টব্য পদার্থ হইতে বঞ্চিত হয়? সেইরূপ তুমিও জগৎকে মা বলিতে গিয়া দেখিবে—মায়ের জগন্মূর্ত্তি অপসৃত, নিত্য-স্বরূপটি উদ্‌ভাসিত। মা আমার সর্ব্বব্যাপী বিভু। তিনি আত্ম-স্বরূপে এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তুমি পরিচ্ছিন্ন ভৌতিক পদার্থকে মা বলিতে গিয়া ইহার অনেক প্রমাণ পাইবে; দেখিবে— এই জড়পদার্থই তোমার সহিত যেন চৈতন্যবৎ ব্যবহার করিতে উদ্যত। জড়পদার্থকে মা বলিতে বলিতে, সত্য বলিতে বলিতে, যে মুহূর্ত্তে তোমার বিশ্বাস স্থির হইবে—জড়ত্বজ্ঞান অপনীত হইবে, সেই মুহূর্ত্তে ইহা একজন চেতনাবান্ জীবের ন্যায় তোমার সহিত ব্যবহার কবিবে। জড় বৃক্ষ তোমায় অভিলষিত বরদান করিবে, জড় মাটি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবে। কণ্বমুনির আশ্রমতরু যে শকুন্তলার বস্ত্র-ভূষণ প্রদান করিয়াছিলেন ইহা কবি কল্পনা নহে, ধ্রুব সত্য। সত্য-প্রতিষ্ঠার এমনই ফল। সত্য-প্রতিষ্ঠায় শুষ্ক তরু মুঞ্জরে। বর্ত্তমান যুগেও সত্য বলিয়া, মা বলিয়া অনেক সাধক জড়পদার্থ হইতে চেতনবৎ ব্যবহার পাইয়া ধন্য হইয়াছেন ও হইতেছেন।

ভগবানের যে নামটি যাহার প্রিয়তম, ভগবানের সহিত যে সম্বন্ধটি যাহার অভীষ্টতম, সেই সম্বন্ধ-বিশিষ্ট নাম ধরিয়া জড়পদার্থে সত্য-প্রতীতি স্থাপন করিলে, দেখিবে—জড় বলিয়া কিছু নাই, উহা চৈতন্যের ছদ্মবেশ মাত্র। সত্যপ্রতিষ্ঠা ঘনীভূত হইলে, সত্যবোধ বিশ্বাসে পরিণত হইলে দেখিবে—জগন্মূর্ত্তি কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, মহান্ চৈতন্যময় আকাশবৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত, অথচ সর্ব্বেন্দ্রিয়-ধর্ম্মধুক্ত মায়ের সেই নিত্য-স্বরূপটি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, ইহাই 'তয়া সর্ব্বমিদং ততম্'। ইহাই মায়ের আমার বিশ্বব্যাপী চিন্ময়রূপ; অথবা উহা রূপও নহে, অরূপও নহে উহা যে কি তাহা অব্যক্ত; গগনসদৃশ—কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি। উহাই ক্ষীরোদসমুদ্র বা কারণবারি। অসুরকর্ত্তৃক উৎপীড়িত দেবতাবৃন্দ এই ক্ষীরোদকূলে অব্যক্তক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বিশিষ্ট-মূর্ত্তিতে চিন্ময়ীর আবির্ভাবের জন্য কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এবং তিনি অচিরে তাঁহাদের অভীষ্ট মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া বরাভয় প্রদান করেন। এইরূপ আবির্ভাবকেই লোকে 'উৎপন্না' বলিয়া অভিহিত করে। বস্তুতঃ মহামায়ার উৎপত্তিও নাই, কর্ম্মও নাই। দেবতাদিগের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব এবং দেবকার্য্য-সিদ্ধিই তাঁহার কর্ম্ম।

তোমার ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যই দেবতাবৃন্দ। তাঁহারা যখন নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগদ্‌ভাবরূপ অসুরকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত হইয়া আপনাদিগকে অতীব আর্ত্ত বিপদাপন্ন মনে করেন, তখনই তাঁহারা এই অব্যক্তক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া, মহামায়ার বিশিষ্ট আবির্ভাব প্রার্থনা করেন। সন্তানবৎসলা মা আমার সেই আকুল প্রার্থনার প্রবল আকর্ষণে বাধ্য হইয়া, বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়েন এবং উৎপীড়ক সুরবিরোধি-ভাবরাশিকে বিনাশ বা আপনাতে লীন করিয়া লয়েন। ইহাই মহামায়ার আবির্ভাব তত্ত্ব। ক্রমে ইহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

এইবার সুরথের সকল প্রশ্নের সমাধান হইল। ষষ্ঠ প্রশ্ন 'যদুদ্ভবা'

কথাটির ঋষি আর পৃথক্ কোন উত্তর দিলেন না ; কারণ, প্রথমেই বলিয়াছেন—'সা নিত্যা' যিনি নিত্য, তাঁহার অন্য হইতে উদ্ভব অসম্ভব। সুরথ এ পর্য্যন্ত মহামায়াকে ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত মনে করিয়াছিলেন ; তাই 'যদুদ্ভবা' প্রশ্নটির আবশ্যক ছিল ; কিন্তু এখন গুরূপদেশে সম্যক্ অবধারণ করিতে পারিলেন—মহামায়া ও ব্রহ্ম অভিন্ন বস্তু।

যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ ॥৪৭॥
তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ।
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ ॥৪৮॥

অনুবাদ। প্রলয়কালে যখন জগৎ একার্ণবীকৃত হইয়াছিল, তখন প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু শেষ-আস্তরণ-পূর্ব্বক যোগনিদ্রার ভজনা করিতেছিলেন। সেই সময় মধু ও কৈটভ নামক ঘোর অসুরদ্বয় বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া, ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্ববর্ত্তি-মন্ত্রে ঋষি বলিয়াছিলেন, মহামায়া নিত্য হইয়াও দেব-কার্য্য সিদ্ধির জন্য যখন বিশিষ্টরূপে আবির্ভূতা হন, তখনই তিনি "উৎপন্না" রূপে আখ্যাত হইয়া থাকেন। এইবার সেই দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্য বিশিষ্ট আবির্ভাব বর্ণনা করিতেছেন। এইখান হইতেই দেবী-মাহাত্ম্যবর্ণন আরম্ভ হইল।

কল্পান্ত শব্দের অর্থ প্রলয় কাল। যখন সৃষ্টির বীজসমূহ ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করে, তখন জগৎ থাকে না, একার্ণবীকৃত হয়। জগৎরূপ কার্য্যসমষ্টিরই পরম-কারণে লীন হওয়া অর্থাৎ এই কারণীভাব প্রাপ্ত হওয়ার নাম একার্ণব। ঋগ্ বেদোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বে সমুদ্র ও অর্ণব এই দুইটি সৃষ্টির উল্লেখ আছে। উহা স্থূলতঃ একার্থবাচক হইলেও একটি কার্য্য ও অপরটি কারণের বোধক। বটকণিকা যেরূপ ভবিষ্যমাণ বিশাল বটমহীরুহের পূর্ব্বাবস্থা ; সেইরূপ যখন এই জগৎরূপ অশ্বত্থবৃক্ষের বীজ বা কর্ম্মসংস্কারসমূহ

ব্রহ্মরূপ পরম-কারণে অবস্থান করে, তখনই কল্পান্তকাল নামে অভিহিত হয়। এই সময় বিশুদ্ধ চৈতন্য ব্যতীত অপর কিছুরই উপলব্ধি হয় না ; তাই, ইহাকে একার্ণব বা কারণ-সমুদ্র বলে।

এই কল্পান্তকালে বিষ্ণু যোগনিদ্রার আরাধনা করেন। বিষ্ণু শব্দের অর্থ জগদ্‌ব্যাপক চিৎশক্তি। যাহাতে জগৎ অবস্থিত—যে চৈতন্য জগৎ-প্রতীতিবিশিষ্ট, তাঁহার নাম বিষ্ণু। সাধনাক্ষেত্রে ইহা প্রাণ নামে অভিহিত হয়। শ্রুতিও আছে—এই সমস্ত জগৎ প্রাণেই ধৃত। উনিই ভগবান্‌। "উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্‌, বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি।" প্রাণি-সমূহের উৎপত্তি নাশ আগম নির্গম বিদ্যা ও অবিদ্যা এই সকল বিষয় যিনি সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন, তিনিই ভগবান্‌। বিষ্ণুর আর একটি বিশেষণ আছে প্রভু। প্রভু শব্দের অর্থ স্বাধীন—তিনি স্বতন্ত্ররূপে ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত করিতে পারেন। মা ইহাকে এত উচ্চ অধিকার দিয়াছেন যে, ইচ্ছামাত্রে যাবতীয় সংকল্প সিদ্ধি করিতে পারেন, তাই ইনি প্রভু। সে যাহা হউক, যখন জগৎ থাকে না, তখন জগদ্‌ব্যাপক চৈতন্য বা প্রাণ কিরূপে অবস্থান করেন তাহাই বলিতেছেন—"শেষমাস্তীর্য্য" তখন প্রাণ অবশেষামৃত আস্তরণ করিয়া অর্থাৎ ভবিষ্যমাণ জগতের বীজসমূহকে শয্যারূপে পরিকল্পিত করিয়া—অধঃকৃত করিয়া বা আপনাতে প্রলীন করিয়া যোগনিদ্রার ভজনা করেন।

যোগ শব্দের অর্থ এখানে পরমাত্মমিলনী ভাব। তখন জগদ্‌ভাব সুপ্ত থাকে বলিয়া, জগৎ ব্যবহারের পক্ষে ইহা নিদ্রা-তুল্য। যে বিষ্ণু জগদ্‌ব্যাপকস্বরূপে নিয়ত অবস্থিত, তিনিও জগতের অভাবে স্বকীয় ব্যাপকতা প্রভুত্ব ভগবত্ত্ব প্রভৃতি বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া, তামসী নিদ্রারূপিণী মহামায়ার ক্রোড়ে সুপ্ত হন। কি উপায়ে ইহা হইতে পারে? একমাত্র যোগের দ্বারাই ইহা সম্ভব। পরমাত্মভাবে স্বকীয় বিশিষ্ট ভাবটি মিলাইয়া দেওয়াই যোগ। এই যোগ সুসিদ্ধ হইলেই জগদ্‌ব্যাপারে নিদ্রা বা সুপ্তভাব হইবেই। ইহা একটী অপূর্ব্ব

মধুময়ী অবস্থা। প্রলয় কালে ভগবান্ বিষ্ণু এই যোগনিদ্রা-রূপিণী মহামায়ার ভজনা করিতে থাকেন। যে যাঁহার ভজনা করে, সে তৎসারূপ্য লাভ করে; ইহা সর্ব্ববিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব; সুতরাং এ অবস্থায় বিষ্ণুর আর স্বতন্ত্রতা থাকে না। 'আমি বিষ্ণু' এরূপ প্রতীতিও থাকে না, তখন শুধু যোগ-নিদ্রারূপিণী মাতৃ-সত্তা বিদ্যমান থাকে।

বিষ্ণুকর্ণ শব্দের অর্থ—ব্যাপক চিদাকাশ। শব্দগুণাত্মক আকাশকে বুঝাইবার জন্যই কর্ণ এবং ব্যাপকতা বুঝাইবার জন্যই বিষ্ণু শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। মল শব্দের অর্থ আবরক। নির্ম্মল শুভ্র চিদাকাশের আবরণস্বরূপ বলিয়া মধুকৈটভকে বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূত বলা হইয়াছে। "মধুশব্দের অর্থ আনন্দ, কৈটভ শব্দের অর্থ বহুত্ব। কীটবৎ ভাতি ইতি কীটভঃ, তস্য ভাব ইতি কৈটভঃ" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটসমূহ যেমন একস্থানে সম্মিলিত হইয়া স্ব স্ব শক্তি-অনুসারে স্পন্দনধর্ম্ম প্রকাশপূর্ব্বক একত্র বহুত্বের পরিচয় দেয়, সেইরূপ সঞ্চিত কর্ম্মবীজ-সমূহ যুগপৎ বহুভাবের পরিজ্ঞাপন করে; তাই, বহুত্বের বীজই কৈটভ নামে অভিহিত। স্থূল কথায়— "একোহহং বহু স্যাম" এই দুইটি সংস্কারের নামই মধুকৈটভ।

এইবার আমরা যথার্থ সাধন-সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। এইখান হইতেই দেবীমাহাত্ম্য, দেবীর আবির্ভাব, দেবকার্য্যসিদ্ধি ও অসুর-নিধন প্রভৃতি লোকাতীত ঘটনা-বৈচিত্র্যমধ্যে আপতিত হইব। সাধক! এস, ধীরভাবে অগ্রসর হই, অতি গহন রহস্য! মা! হৃদয়ে বল দাও, তুমি সম্মুখে বিজ্ঞানময় গুরুমূর্ত্তিতে দাঁড়াও, অতি গভীর রহস্যাবৃত এই সাধন-তত্ত্ব-সমূহ সমুদ্ভাসিত করিয়া দাও, আমরা ধন্য হই! তোমার জগৎ, তোমার প্রিয়তম সন্তানবৃন্দ এই প্রহেলিকাচ্ছন্ন সুধাভাণ্ড লাভ করিয়া অমর হউক। ব্রহ্মর্ষির দেশে আবার গৃহে গৃহে ব্রহ্মর্ষি বিরাজ করুক।

জীবাত্মা সমাধিসহায়ে শুদ্ধবোধরূপী গুরুর নিকট হইতে মহা-মায়ার স্বরূপ এবং স্বভাব অবগত হইয়া, তাঁহার বিশিষ্ট আবির্ভাব ও কার্য্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আকুলভাবে অপেক্ষা করিতে থাকে।

সমাধিস্থ হইয়া, এই সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। মনে রাখিও সাধক! ইহা সবিকল্প সমাধি। আমরা কীলকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি—কৃষ্ণাষ্টমী বা মনের অর্দ্ধলয়-অবস্থা হইতে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী বা এক কলা অবশিষ্ট মনের লয় হওয়া পর্য্যন্ত যে সমাহিত অবস্থা হয়, সেই অবস্থায়ই এই সকল তত্ত্ব উন্মেষিত হইতে থাকে। সাধক যখন এইরূপ সমাধিস্থ হইয়া কাতর প্রাণে আকুল হৃদয়ে মাতৃ-আবির্ভাব, মায়ের বিশিষ্ট কার্য্য, বিশিষ্ট স্নেহ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে, তখন সে মায়ের কৃপায় দেখিতে পায়—অহর্নিশ যে জগদ্ভাব তাহাকে চঞ্চল করিয়া রাখিত, সে জগদ্ভাব আর জাগিতেছে না; সুতরাং প্রাণ সুপ্ত অথচ আত্মবোধটি বেশ জাগ্রত। জগতের বীজ বা সংসারের অস্তিত্ব ঈষৎমাত্র প্রতীত হয়; কিন্তু তাহার বিশিষ্ট স্বরূপ কি, তাহার উপলব্ধি হয় না। সম্মুখে অতি ঘন অতি শুভ্র স্বপ্রকাশ মহাব্যোমমাত্র প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে; ইহারই নাম কল্পান্তকাল, জগতের একার্ণবীভাব এবং শেষ-আস্তরণে বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে, যে অপরিসীম আনন্দের সম্ভোগ হয়, সাধক প্রথমতঃ কিছুদিন তাহাতেই মুগ্ধ থাকে। কোনরূপ বিশিষ্ট ইচ্ছা উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া সে অবস্থা হইতে বিচ্যুত বা ব্যুত্থিত হয়। আবার জগদ্ভাবে অবতরণ করে। তখন বড় দুঃখ হয়; সে আনন্দের স্মৃতি তাহাকে ব্যথিত করে। তখন আরও কাতর হইয়া মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে। শ্রীগুরুর চরণকমল আরও শক্ত করিয়া ধরে। তাহারই ফলে সৌভাগ্যবান্ জীব মাতৃ-কৃপায় পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় কিছু কাল অবস্থান করিবার সামর্থ্যলাভ করে, তখন সে জানিতে চায়—কেন আমি এ মধুময় ক্ষেত্র—আনন্দময় মাতৃ-অঙ্ক হইতে বিচ্যুত হই? তাই, প্রার্থনা করে—"মা আমায় দেখাও—কে আমাকে এখান হইতে টানিয়া আবার জগদ্ভাবে মুগ্ধ করে?" তখন মায়ের কৃপায় সে দেখিতে পায়—সেই নির্ম্মল শুভ্র চিদ্ব্যোমক্ষেত্রে মল বা আবরক স্বরূপ দুইটী সংস্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে—একটি বিশিষ্ট আনন্দ, অপরটী বহুভাবেচ্ছা। ইহারাই

বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ। এই বহুভাবেচ্ছামূলক আনন্দ পরমাত্মার স্বরূপানন্দ হইতে অন্য প্রকার; তাই ইহাকে বিশিষ্ট আনন্দ বলা হইয়াছে। যাহা হউক, অহংবোধাত্মক আনন্দ এবং বহুভাবেচ্ছা এই দুইটী অতি দুরপনেয় সংস্কার। উহারাই সাধকের কৈবল্যের বিরোধী; তাই, ইহারা ঘোর অসুর বলিয়া অভিহিত হয়। ইহারা ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। যে অবস্থায় ইহাদের দর্শন হয়, সেই অবস্থায় ব্রহ্মা—সৃষ্টিশক্তি বা মন বিষ্ণুর নাভিকমলে বা প্রাণশক্তির অঙ্কে নিশ্চল, প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে। পরমাত্মযুক্ততাই জীবন, আর তদ্‌বিমুখতাই হনন। যদিও তখন মন সাময়িক ভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়াছে, তথাপি তখনও ত মন নাভি বা মণিপুর-চক্রের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, সেই জন্যই উক্ত সংস্কারদ্বয় মনকে পুনরায় ক্রিয়াশীল হইবার জন্য, আবার জগদাকারে আকারিত হইবার জন্য উদ্বেলিত করিতে সমর্থ হয় ও করিতে থাকে। ইহাই মধুকৈটভের 'হন্তুং ব্রহ্মাণমুদ্যতৌ'।

মায়ের কৃপায় সাধক এই মূল সংস্কারের সাক্ষাৎ পায়। মুখে সহস্রবার বলিলেও ইহার অনুভূতি হয় না। মায়ার কেন্দ্র কোথায়—তাহা এই স্থানে মধুকৈটভ দর্শনে বুঝিতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে —"বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি" সেই বলপূর্ব্বক আকর্ষণ এই কেন্দ্র হইতে আরম্ভ হয়। ইহারাই অজেয় অসুর। ইহারাই আমার মাতৃ-অঙ্কে নিত্য অবস্থানের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। আমি চাহিয়াছিলাম—বহু হইব, বহুভাবের আনন্দ উপভোগ করিব। সে চাওয়া সে ইচ্ছা পরমেশ্বর-ভাবের; সুতরাং অমোঘ। ঐ ইচ্ছাটি বুকে করিয়া মা আমায় স্বাধীন ইচ্ছায়, স্বাধীন আনন্দে অসংখ্যযোনি ভ্রমণ করাইতেছেন। বহুদিন বহুজন্ম এইরূপ ভ্রমণ করিয়া, একবার মাতৃ-অঙ্কের সন্ধান পাইলে—নির্ম্মল পরমাত্ম-স্বরূপের আভাস পাইলে, আর ঐ বহুত্ব ও তন্মূলক আনন্দ প্রীতিকর হয় না; বরং অতি তিক্ত-বোধ হইতে থাকে; তখনই মধুকৈটভ-বধের সূত্রপাত হয়।

স নাভিকমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ।
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনম্ ॥৪৯॥
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ।
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্ ॥৫০॥
বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতি-সংহার-কারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥৫১॥

অনুবাদ। বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত প্রজাপতি তেজঃপতি ব্রহ্মা সেই অসুরদ্বয়কে অতি উগ্র এবং জনার্দ্দন বিষ্ণুকে নিদ্রিত দেখিয়া, হরির নিদ্রাভঙ্গের জন্য—হরিনেত্রকৃতালয়া বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী স্থিতিসংহারকারিণী ভগবতী অতুলনীয়া বিষ্ণুর নিদ্রারূপিণী সেই যোগ নিদ্রার একাগ্রহৃদয়ে স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্যাখ্যা। মধুকৈটভ যখন বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রধান সংস্কারদ্বয় যখন প্রাণশক্তির অঙ্কস্থিত সুপ্তপ্রায় মনকে পুনরায় জগদ্ব্যাপারে উন্মুখ করিতে উদ্যত হয়; যখন মন উক্ত সংস্কারদ্বয়কে উচ্ছেদ-বাসনায় প্রাণশক্তির শরণাপন্ন হইতে গিয়া দেখে—প্রাণ যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন, জগদ্ব্যাপারে বহির্মুখ; তখন সেই অবস্থায় প্রাণকে পুনরায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য সে যোগনিদ্রার শরণাপন্ন হয়। যোগনিদ্রারূপিণী যে মহতী শক্তি প্রাণকে জগদ্ব্যাপারে বিমুখ করিয়া রাখিয়াছে, জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী সেই মহামায়ার বিশিষ্ট আবির্ভাবের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে থাকে। ইহাই এস্থলে আধ্যাত্মিক রহস্য।

এই মন্ত্রে যোগনিদ্রার একটি বিশেষণ আছে—হরিনেত্রকৃতালয়া। হরি শব্দের অর্থ—বিষ্ণু বা প্রাণ। সর্ব্বভাবকে হরণ করেন বলিয়া ইহার নাম হরি। ছান্দোগ্য-উপনিষদে প্রাণের উপাসনা-প্রস্তাবে প্রাণকেই জগদ্গ্রাসকারী বা সর্ব্বভাবের বিলয়কারক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা প্রত্যক্ষও হয়—কি জ্ঞানেন্দ্রিয়-শক্তিপ্রবাহ, কি কর্ম্মেন্দ্রিয় শক্তিপ্রবাহ, কি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু-প্রবাহ, কি জনন-মরণাদি

পরিবর্ত্তন-প্রবাহ সবই প্রাণশক্তির আশ্রয়ে প্রকটিত, সুতরাং তাহাতেই প্রলীন হইয়া থাকে। তাই, প্রাণই হরি। জীব যতদিন এই প্রাণের সন্ধান না পায়, যতদিন প্রাণকে হরি বলিয়া, কিংবা হরিকে প্রাণ বলিয়া বুঝিতে না পারে, যতদিন আত্মপ্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, যতদিন গুরুর প্রাণে আপনার প্রাণ মিলাইয়া দিতে না পারে, ততদিন গগনভেদি-রবে হরিনাম উচ্চারিত হইলেও, জীব অমরত্বের—অভয়পদের সন্ধান পায় না। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব এই সর্ব্বাশ্রয়-প্রাণের সন্ধান পাইয়াই হরিনামে আত্মহারা হইতেন। প্রাণহীন নাম মৃত শব্দমাত্র ; কিন্তু প্রাণময় নাম নামী হইতেও শ্রেষ্ঠ। যে নাম উচ্চারণ করিবামাত্র প্রাণের অনুভূতিতে সাধক আত্মহারা হইয়া যান, সেই নাম এখন কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছে ; কিন্তু কয়জন লোক যথার্থ প্রাণের সন্ধান পাইয়া অমরত্ব-লাভে চরিতার্থ হইয়াছেন ? নাম করিতে করিতে অশ্রু-বিসর্জ্জন, ভূমি-বিলুণ্ঠন কিংবা সংস্কারগঠিত প্রাণহীন কোনও দেবমূর্ত্তি-দর্শন, এ সকল সাধারণের পক্ষে উচ্চ অবস্থা হইলেও, যথার্থ চরিতার্থতার পরিচায়ক নহে।

যাহা হউক, হরিনেত্রকৃতালয়া শব্দে—প্রাণের বহির্ম্মুখী প্রকাশ-ভাবকে বুঝায়। নেত্র প্রাণের বহিঃপ্রকাশ স্থান। মৃত ও জীবন্ত ভাব চক্ষুতেই বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয়। আমরা যে নিত্য প্রাণময়ীর অঙ্কে অবস্থিত, তাহা চক্ষুতেই প্রধানরূপে উদ্ভাসিত। অক্ষিগত পুরুষের সাধনার বিষয় উপনিষদে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। প্রতিমা-পূজাদিতে চক্ষুর্দান বলিয়া যে একটি অনুষ্ঠান আছে, উহা প্রাণেরই বহির্ম্মুখী অভিব্যক্তির প্রথম ক্রিয়াবিশেষ। প্রাণপ্রতিষ্ঠাবান্ সাধক জানেন—কি উপায়ে মৃন্ময় জড়চক্ষুতে চৈতন্যের বিকাশ পরিব্যক্ত হয়। এখনও গৃহে গৃহে প্রতিমাপূজা হয় ; কিন্তু হায় ! 'তচ্চক্ষুর্দেবহিতং' ইত্যাদি চক্ষুর্দানের মন্ত্র কয়েকটি পঠিত হয় মাত্র ; উহা যে কি ব্যাপার ! কি উপায়ে মৃন্ময়চক্ষু চিন্ময়ীর বহির্বিকাশরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহা অতি অল্প লোকই জানেন।

আমাদের সর্ব্ববিধ বৈধ ক্রিয়ার প্রারম্ভেও আচমনমন্ত্রে "দিবীব

চক্ষুরাততম্” বলিয়া বিশ্বব্যাপী প্রকাশ-শক্তির অন্ততঃ আংশিক উপলব্ধির বিধান আছে। সকলেই আচমন করেন; কিন্তু কয়জন লোক সেই জগদ্ব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদ, যাহা আকাশে বিস্তৃত চক্ষুবৎ উদ্ভাসিত, সেই সর্ব্বতোভেদী দৃক্‌শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন! কয়জন লোক মায়ের চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ হন্! কিন্তু সে অন্য কথা—

চক্ষুতেই মা আমার বিশেষভাবে প্রকাশিতা। নেত্ররূপ দ্বার দিয়াই চৈতন্যের বহির্ম্মুখ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই প্রাণ যখন অন্তর্ম্মুখী হয়—যখন জগদ্ব্যাপার হইতে বিরত হয়, তখন চক্ষুতেই তাহার প্রথম অভিব্যক্তি হয়। তাই, মা আমার হরিনেত্র-কৃতালয়া। যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া প্রাণের জগন্মুখী বিকাশ নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, প্রাণ সাময়িক মাতৃ-যোগজনিত আনন্দে আত্মহারা, সংসারের আসক্তি বা উচ্ছেদ উভয়ত্র নিস্পৃহ, এই অবস্থাটি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। মহামায়া মা প্রাণকে এমন এক অবস্থায় আনিয়া স্থাপিত করিয়াছেন যে, সে আর জগতের ভালমন্দ কিছুতেই নাই। মা কিন্তু এভাবেও তাঁহাকে রাখিতে চান না। তাঁহার দ্বারাই জগৎ-উদ্ধার-ব্রত সম্পাদন করাইবেন। তাই বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গের জন্য এই আয়োজন। তাই, ব্রহ্মা বা মন মাতৃ-চরণে লুণ্ঠিত হইয়া, স্তব করিতে লাগিলেন।

এই যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়াই বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী এবং স্থিতি সংহারকারিণী; সুতরাং অতুলনীয়া, অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশালিনী, ভগবতী। মহামায়ার সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় শক্তি-বোধক শব্দ পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে, পরে আরও অনেকবার বলা হইবে। দেবীমাহাত্ম্যে এরূপ বলায় পুনরুক্তি-দোষ হয় না; কারণ, উহাই সাধনার বীজ। বেদান্তদর্শনে “জন্মাদ্যস্য যতঃ” এই ব্রহ্ম-নিরূপণ সূত্রটিও ঐ একই অর্থের বোধক। যাহা হইতে এ জগতের জন্ম স্থিতি ও ভঙ্গ হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহাকে অবগত হও, তাঁহার সাধনা কর। যত কিছু যোগতপস্যা, যত কিছু সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন অনুষ্ঠান সকলেরই উদ্দেশ্য

ঐটুকু। ঐ 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'। ঐটুকু উপলব্ধি করিতে পারিলেই জীবত্বের অবসান হয়। জীব আমরা, চতুর্দ্দিকেই জীবত্বের গণ্ডী। তাহার মধ্যে অবস্থান করিয়া আমরা দীন হীন সাজিয়া বসিয়াছি। যাঁহা হইতে এই জগৎ সৃষ্ট, যাঁহাতে এই জগৎ স্থিত এবং যাঁহাতে এই জগৎ প্রলীন হয়, কোনওরূপে তাঁহাকে জানিতে পারিলেই, জীবত্বের অবসান হয়; কারণ উহাই যে জীবের প্রকৃত স্বরূপ। এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তৃস্বরূপ মহত্ত্বের কথা দুই একবার শুনিলেই আমাদের আত্মস্বরূপ উদ্বুদ্ধ হয় না; তাই, সাধকবরেণ্য ঋষিপাদগণ পুনঃ পুনঃ আত্মার এই গুণত্রয়—এই ঈশ্বর-ভাবটি স্মরণ করাইবার জন্য গম্ভীর ধ্বনিতে গম্ভীরবেদী* হস্তীর নিদ্রা ভঙ্গের প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা গম্ভীরবেদী হস্তী। কিছুতেই আমাদের জীবত্বের ঘুম ভাঙ্গে না; সুতরাং সাধনা-জগতের কথা—মায়ের মহত্ত্ব যত পুনরুক্তি দোষ-যুক্ত হইবে, ততই মঙ্গল। যিনি যত বেশী মাতৃ-মহত্ত্বের পুনরুক্তি করিবেন, তিনি আমাদের প্রতি তত সমধিক কৃপাবান্। আমরা ত পুনরুক্তি-দোষ দর্শন করিবই, মলিনতা দর্শনই আমাদের স্বভাব; কিন্তু যাঁহারা অস্মৎকৃত এই অবজ্ঞা ও উপেক্ষা সহ্য করিয়াও বারংবার আমাদের নেত্রসমীপে মাতৃ-মহত্ত্ব চিত্রিত করেন, ধন্য তাঁহাদের অহৈতুক কৃপা!

শুন, আর একটু খুলিয়া বলিতেছি। নাভিকমল বা মণিপুরচক্র তেজস্তত্ত্বের কেন্দ্র। মন্ত্রেও 'তেজসঃ প্রভুঃ' শব্দটি ব্রহ্মার বিশেষণরূপে উক্ত হইয়াছে। এই নাভিচক্র হইতেই জাগতিক সর্ব্বভাবের বিকাশ হয়। তেজস্তত্ত্ব হইতেই রূপ-জগতের আরম্ভ; যতক্ষণ জগৎ-সংস্কারের বীজ থাকে, ততক্ষণ মন বা সৃষ্টিশক্তি এই নাভিকমলের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারে না; অন্য দিকে হরিনেত্রকৃতালয়ার বা আজ্ঞাচক্রস্থিত

* চর্ম্মচ্ছেদ, মাংসকর্ত্তন এবং রক্তপাত করিলেও যাহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় না, তাহাকে গম্ভীরবেদী হস্তী কহে। "তুমিই ব্রহ্ম" ইহা সহস্রবার বুঝাইয়া দিলেও জীব উহা উপলব্ধি করিতে পারে না; সেইজন্য জীবকে গম্ভীরবেদী হস্তীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

চিৎপ্রতিবিম্বের মোহিনী শক্তিতে একান্ত মুগ্ধ থাকে। এ অবস্থায় তাহাকে আবার বহুভাবে স্পন্দিত হইবার জন্য উদ্বেলিত করিলেও মন আর ঐ শান্ত অবস্থা পরিত্যাগ করিতে চায় না। সে তখন যে যোগনিদ্রারূপিণী চিৎশক্তির অঙ্কে প্রাণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, সেই শক্তির শরণাপন্ন হয়। অভিপ্রায় এই যে, প্রাণ সক্রিয় হইলেই আগামিকর্ম্মের বীজস্বরূপ মূলসংস্কার বা মধুকৈটভ বিনষ্ট হইবে। আর তাহাকে বহুভাবে স্পন্দিত হইতে হইবে না।

ব্রহ্মোবাচ

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥৫২॥

অনুবাদ। ব্রহ্মা স্তব করিতেছেন—হে মা! তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমিই বষট্‌কারাদি মন্ত্র এবং উদাত্তাদি স্বর, তুমিই সুধা। হে অক্ষরে! হে নিত্যে! তুমিই ত্রিমাত্রা-স্বরূপা।

ব্যাখ্যা। ত্বম্ বা তুমি শব্দটি সম্মুখস্থ ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হয়। অপ্রত্যক্ষ ব্যক্তিকে তুমি বলা যায় না। যাহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই ত্বম্ শব্দের প্রয়োগ হয়। এস্থলে ব্রহ্মা বা মন হরিনেত্রকৃতালয়া যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়াকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন বলিয়াই 'ত্বং' শব্দের প্রয়োগ করিলেন। সাধকমাত্রেরই এরূপ করিতে হয়। স্তব স্তুতি আবেদন নিবেদন কাতরপ্রার্থনা করুণ ক্রন্দন যাহা কিছু করিবে, কখনও মাকে অপ্রত্যক্ষ রাখিয়া করিও না। মা কোথায়—অলক্ষ্য স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তুমি তাঁহার উদ্দেশ্যে কল্পনার সাহায্যে এইখানে বসিয়া স্তবাদি পাঠ বা সাধনা করিতেছ; এইরূপ ভাব যতদিন থাকিবে, ততদিন সাধনা-পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে পারিবে না। সাধনারাজ্যে কল্পনা বা অনুমানের স্থান নাই; অপ্রত্যক্ষের উদ্দেশ্যে কোন সাধনা হয় না।

সাধনার প্রতিপদক্ষেপে প্রত্যক্ষতার উপলব্ধি হইবে; প্রত্যক্ষতাই সাধনার প্রাণ। সেই জন্য এই স্থলে আমরা এই ব্রহ্মাকৃত স্তবটির ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে একবার মন্ত্রচৈতন্য-বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া লইব; কারণ, মন্ত্রচৈতন্য হইলেই দেবতা প্রত্যক্ষ হয়। চৈতন্যহীন মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিলে অর্থাৎ দেবতা অপ্রত্যক্ষ থাকিলে বহুবর্ষব্যাপী কঠোর সাধনাও প্রায় নিষ্ফল হয়। ইহাই ঋষিদিগের আদেশ।

মন্ত্র—শব্দবিশেষ। যে শব্দটি মনন করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহাই মন্ত্র। মন্ত্র-প্রতিপাদ্য সদর্থই গুরু। এবং তাদৃশ অর্থমূলক অনুভূতি বা বেদনের নাম চৈতন্য অর্থাৎ ইষ্টদেব। এইরূপ মন্ত্র, গুরু ও দেবতা, এই তিনের একীকরণ হইলেই মন্ত্র-চৈতন্য হয়। একটি দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টি সহজ করা যাউক। মনে কর, তেঁতুল একটি শব্দ। এই শব্দটি মন্ত্রস্থানীয়; যতক্ষণ তেঁতুল শব্দটির অর্থ বোধ না হয়, তেঁতুল কি তাহা জানা না যায়, ততক্ষণ উহা মৃত শব্দমাত্র। মুখে লক্ষবার তেঁতুল বলিলেও তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইবে না। তারপর একজন আসিয়া তেঁতুলের আকার-আস্বাদ ইত্যাদি ভালরূপে বুঝাইয়া দিল। তখন তেঁতুলের অর্থ-জ্ঞান হইল; এই অর্থেরই নাম গুরু। তখন তেঁতুল-শব্দ-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উহার অম্লতা-বিষয়ক জ্ঞান ফুটিতে লাগিল। তার পর, যখন দেখিবে—তেঁতুল শব্দ উচ্চারণ করিলে ঐ অম্লতা-বিষয়ক জ্ঞান, তোমার অনুভূতি পর্য্যন্ত ফুটাইয়া তুলিতে পারে অর্থাৎ যখন তেঁতুল বলিলেই জিহ্বা রসার্দ্র হয়, তখনই বুঝিবে উহা চৈতন্যময় হইয়াছে! এইরূপ সর্ব্বত্র। তুমি বলিলে—"দয়াময়ী মা।" অমনি দয়ার অনুভূতিতে তোমার হৃদয় আপ্লুত হইয়া গেল। এইরূপ হইলেই বুঝিবে যে, তোমার দয়াময়ী শব্দটি যথার্থ উচ্চারিত হইয়াছে। তুমি মা বলিতেছ, কে মা তাহা জাননা, মা শব্দের অর্থও অবগত হও নাই, এরূপ অবস্থায় যতদিন তুমি মা বলিবে, ততদিন উহা মৃত মন্ত্রমাত্র। তার পর একজন তোমায় বুঝাইয়া দিলেন—মা শব্দের অর্থ "পরিপূর্ণ স্নেহের আধার জগদ্ব্যাপী চৈতন্য তিনিই

তোমার আত্মা"। গুরুকৃপায় ইহা যেদিন বুঝিতে পারিবে, যে দিন মা বলিবামাত্র একটা স্নেহঘন জগদ্ব্যাপী চৈতন্যময় আত্মানুভূতি ফুটিয়া উঠিবে, সেই দিনই বুঝিবে তোমার 'মা' মন্ত্রটি চৈতন্যময় হইয়াছে। অর্থ না বুঝিয়া ঐ অর্থানুযায়ী রসে ও ভাবে স্বয়ং রসিক ও ভাবুক না হইয়া, মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিলে, উহার যথার্থ ফললাভ করা যায় না। শুধু মন্ত্রচৈতন্যরূপ একটি জিনিষের অভাবেই সাধনমার্গ দুর্গম ও অন্ধকারময় বলিয়া মনে হয়; সুতরাং কোন স্তোত্রাদিপাঠ কিংবা বিশিষ্ট কোন মন্ত্রজপ অথবা নামকীর্ত্তনকালে উহার সদর্থ জানিয়া, অর্থানুরূপ ভাবে স্বয়ং সম্বেদিত হইতে চেষ্টা করিবে, তবেই উহার যথার্থ ফল সত্বর প্রত্যক্ষ হইবে।

ব্রহ্মা বা মন আগামিকর্ম্মের বীজস্বরূপ মধুকৈটভের উচ্ছেদ করিবার জন্য মহাশক্তির শরণাপন্ন হইলেন; কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শক্তিই একমাত্র তত্ত্ব—শক্তিই একমাত্র সাধ্য, শক্তিই সর্ব্ব-কারণ-কারণ, অবাঙ্মনসোগোচর পরমাত্মা। তাঁহার কৃপা—ইচ্ছা না হইলে, এই অসুর-নিধন হয় না। তাই, মহামায়ার স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহারা বলিবেন—সমাধি-অবস্থায় এ সকল ব্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হয়? তাঁহারা পুস্তক পড়িয়া সমাধি শব্দ মুখস্থ করিয়াছেন। যে সমাধিতে সর্ব্বভাবের সম্পূর্ণ বিলয় হয়, তাহা একদিন একবারমাত্র হইয়া থাকে। সে সমাধি হইলে আর ব্যুত্থিত হইতে হয় না, তাই, গীতা বলিয়াছেন—"যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"। আর ইহা সেই সমাধিতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থামাত্র। তবে ইহাও সমাধি; কারণ, এ অবস্থায় জাগতিক ব্যাপার, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি-প্রবাহ, প্রাণবায়ু-স্পন্দন, দেহবোধ-প্রভৃতি প্রায় লুপ্ত হইয়া আসে। কলামাত্র অবশিষ্ট মন আত্মবোধময় মহাচিদ্ব্যোম-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া, জীবভাবাপন্ন কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলাদি প্রত্যক্ষ করিতে থাকে এবং বিশিষ্ট প্রার্থনা বা কোন উপায়ের সাহায্যে শুদ্ধ আত্মবোধ—অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হয়। সে অবস্থায় প্রার্থনা, স্তুতি অথবা প্রক্রিয়াবিশেষ

স্থূলে প্রকাশ পায় না। শব্দহীন অথচ পূর্ণ শব্দময়, ক্রিয়াহীন অথচ পূর্ণ ক্রিয়াময় সে নীরবতার ধ্বনি, সে ক্রিয়াহীন সক্রিয় অবস্থা যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা সহজবোধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, মোটামুটি এই পর্য্যন্ত জানিলেই হইবে যে—সমাধির প্রাথমিক অবস্থায় মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার প্রভৃতি সূক্ষ্ম করণসমূহ প্রত্যক্ষীভূত হয় ও তাহাদের বিশিষ্ট-কার্য্য-প্রণালী-সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়।

এইবার আমরা স্তবের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। ব্রহ্মা বলিলেন—মা তুমি স্বাহা। স্বাহা একটি দেবহবির্দানমন্ত্র; কিন্তু এস্থলে যাবতীয় দেবকৃত্যের উপলক্ষণ। তুমি স্বধা—এইটী পিতৃদানমন্ত্র; কিন্তু এ স্থলে পিতৃকৃত্যের এবং বষট্কার—এইটি যাবতীয় মন্ত্রের উপলক্ষণ। আমাদের মাকে মনে পড়িলে, সর্ব্বপ্রথমে কর্ম্মকাণ্ডগুলি চক্ষুর উপর ভাসিতে থাকে; কারণ, ঐগুলিই মাতৃ-আবির্ভাবের পূর্ব্ব-সূচনা। কর্ম্মকাণ্ড দেব ও পিতৃকার্য্যভেদে দুইভাগে বিভক্ত। উভয়ই কতিপয় মন্ত্রসাধ্য অনুষ্ঠানবিশেষ।

মা! তুমি স্বাহা, স্বধা এবং বষট্কার। পূজা হোম ব্রত জপ পুরশ্চরণাদি দেবকার্য্য, শ্রাদ্ধতর্পণাদি পিতৃকার্য্য এবং এই উভয়বিধ কার্য্যে যে মন্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হয়, তাহা তুমি। সেই মন্ত্রসমূহ পাঠ করিতে গেলে যে ত্রিবিধ স্বর উচ্চারিত হয়, যাহা উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিৎ নামে অভিহিত, যে স্বরের উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে কাম্য-কর্ম্মসমূহের ফলগত তারতম্য হইয়া থাকে; সেই স্বর-স্বরূপাও তুমি। তাই, তুমি স্বরাত্মিকা। ইন্দ্রের নিধনকামনায় বৃত্রাসুরের উৎপত্তির জন্য, ঋষিগণ যখন উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতেছিলেন, তখন তুমিই ত মা! সেই সত্যদর্শি-ঋষিদিগের কণ্ঠে অবস্থান করিয়া "ইন্দ্রশত্রু" পদের উচ্চারণ-কালে অনুদাত্ত স্বরের বিনিময়ে উদাত্ত স্বররূপে নির্গত হইয়াছিলে! তাহারই ফলে ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রাসুর নিহত হইয়াছিল; সুতরাং তুমিই ত স্বরাত্মিকা। এতদ্ভিন্ন জীবসমূহের কণ্ঠ হইতে নাদরূপে যে স্বর নির্গত,

যাহা পরা, পশ্যন্তি, মধ্যমা এবং বৈখরী নামে অভিহিত হয়, সে স্বররূপেও তুমি মা!

পূর্ব্বোক্ত দেব ও পিতৃকার্য্যাদি অনুষ্ঠানের যাহা ফল বা অপূর্ব্ব, সেই কর্ম্মফল বা অদৃষ্টরূপেও তুমি মা। কর্ম্মফলই অমৃত; তাই তুমি সুধাস্বরূপিণী। উপনিষদে দেখিতে পাই—"অন্নাৎ প্রাণোমনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্"। আচার্য্য শঙ্কর অমৃত শব্দের অর্থ করিয়াছেন—কর্ম্মফল। যতক্ষণ দেব ও পিতৃকার্য্যকে মাত্র কর্ম্মরূপে, বৈধকার্য্যে উচ্চারিত শব্দগুলিকে মাত্র মন্ত্ররূপে এবং বৈধকার্য্যজন্য ফলসমূহকে মাত্র কর্ম্মফলরূপে দেখি, ততক্ষণই উহা ক্ষর-ধর্ম্মী; কিন্তু যখন দেখিতে পাই অক্ষরা নিত্যা মা আমার, দেব ও পিতৃকার্য্যরূপে প্রকটিতা, যখন দেখিতে পাই—উদাত্তাদি স্বরভেদে এবং মন্ত্ররূপে মা তুমিই উচ্চারিতা, তখন আর কর্ম্মফলগুলিকে সুধা বা অমৃত না বলিয়া কিরূপে অজ্ঞান বা ক্ষরধর্ম্মা বলিব?

কর্ম্মমাত্রেরই একটি সাধারণ ফল আছে, উহার নাম জ্ঞান। জ্ঞানের উন্মেষ করাই কর্ম্মরূপিণী মায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। জ্ঞান নিত্য; সুতরাং অমৃত। তাই, কর্ম্মফলকে অমৃত বা সুধা বলা যায়।

তারপর সর্ব্ব মন্ত্রের সার যে ত্রিধামাত্রা—ওঁকার। যাহা হইতে এই জগৎ, যাহা হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যাহা অকার, উকার ও মকার রূপে জগদাকারে প্রকটিত, সেই ত্রিমাত্রাও তুমি।

এই স্থলে ত্রিমাত্রার স্বরূপসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। মাত্রাশব্দের অর্থ স্পন্দন। স্পন্দন—শক্তিপ্রবাহমাত্র। চিন্ময়ী মহাশক্তি স্থূল জগদাকারে প্রকটিতা হইয়া, জড়শক্তি নামে অভিহিত হন। ঐ শক্তিপ্রবাহ তিন প্রকার ক্রিয়ার প্রকাশ করে। প্রথম—উৎপত্তি বা নামরূপবিশিষ্ট এক ঘনীভূত শক্তিকেন্দ্র। ইহাই সৃষ্টি বা অকারমাত্রা। দ্বিতীয়—স্থিতি। সেই বিশিষ্টরূপে আবির্ভূত শক্তি-কেন্দ্রটি যতক্ষণ লয়শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আত্মস্বরূপ স্থির রাখিতে সমর্থ, ততক্ষণই উহা স্থিতি বা উকারমাত্রা নামে অভিহিত হয়। তৃতীয়—লয়। যখন উক্ত শক্তিকেন্দ্র আবার

মহাশক্তির অঙ্কে অদৃশ্য হইয়া যায়, তখনই লয় বা মকারমাত্রা কথিত হইয়া থাকে। একটি ফল হাতে করিয়া দেখ—কি যেন একটা শক্তি অদৃশ্য পরমাণুগুলিকে ঘন সন্নিবদ্ধ করিয়া ফলের আকারে প্রকাশ পাইতেছে। উহাই প্রথম স্পন্দন বা অকারমাত্রা। সাধনার ভাষায় উহা ব্রহ্মা। যোগিগণ উহাকে মনরূপে দর্শন করেন। তারপর দেখ, উক্ত ফলরূপে স্থূলে প্রকটিত শক্তিপ্রবাহ যতক্ষণ লয় বা বিরোধিশক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া আত্মস্বরূপ বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত রাখে, ততক্ষণই উহা দ্বিতীয় স্পন্দন বা উকারমাত্রা। সাধনার ভাষায় উহাকে বিষ্ণু কহে। যোগিগণ ইহাকে প্রাণরূপে দর্শন করেন। অনন্তর কিছুদিন পরে দেখিতে পাইবে, ঐ ফলটি পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ যে নাশ বা প্রলয়, উহারই নাম তৃতীয় স্পন্দন বা মকারমাত্রা। সাধনার ভাষায় উহাকে শিব কহে। যোগিগণ উহাকে জ্ঞানরূপে দর্শন করেন। এই প্রলয় একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন নহে, প্রতি পরমাণুর প্রতিমুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তনের ফল। প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতি পরমাণুতে পূর্ব্বকথিত জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে প্রভৃতি ছয়টি পরিবর্ত্তন এই ত্রিবিধ স্পন্দনের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়। জীব যে দিন ভূমিষ্ঠ হয়, সেই দিন হইতেই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এক দিনে মৃত্যু হয় না। জন্মশব্দের অর্থ ই মৃত্যুর আরম্ভ। তবে, যতদিন তৃতীয় স্পন্দন বা মকারমাত্রা অপেক্ষা দ্বিতীয় স্পন্দন বা উকারমাত্রা প্রবল থাকে, ততদিন মৃত্যু বলিয়া বিশিষ্ট ঘটনা প্রত্যক্ষ হয় না।

জগতের প্রত্যেক পদার্থে প্রতিমুহূর্ত্তে এই ত্রিবিধ স্পন্দন বা ত্রিশক্তিপ্রবাহ চলিতেছে। যখন যে স্পন্দনটি প্রবলভাবে ক্রিয়া করে, তখন সেইটিমাত্র প্রত্যক্ষ হয়। যোগচক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি এই জগৎকে ত্রিবিধ স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। উহাই শ্যামাপূজার, ত্রিকোণ যন্ত্র। পাঁচটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তদুপরি শ্যামাপূজা করিবার বিধান তন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। পঞ্চভূত ঐ ত্রিবিধ শক্তির প্রবাহমাত্র। কর্পূরাদি স্তবের ত্রিপঞ্চার শব্দটিরও ইহাই তাৎপর্য্য। তন্ত্রে যে সকল

যন্ত্রপূজার বিধান আছে, উহা মহতী-শক্তি-প্রবাহ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা জন্মায়।

অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা ॥৫৩॥

অনুবাদ। মা! যাহা বিশেষরূপে উচ্চারণের অযোগ্য, সেই নিত্য অর্দ্ধমাত্রা তুমি। তুমিই সাবিত্রী। হে দেবি! তুমিই পরা জননী।

ব্যাখ্যা। মা! এ পর্য্যন্ত তোমার যে ত্রিমাত্রাস্বরূপের আভাস পাইলাম, উহাই উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তাভিমানী বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ পুরুষ। বহুদিন ধরিয়া তোমার এই ত্রিবিধ স্বরূপ দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি—তুমিই জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছ। মা! তোমার এই স্বরূপটি অতি মনোহর হইলেও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর একটি স্বরূপ আছে, তাহা অনুচ্চার্য্য, বিশেষভাবে উচ্চারণ করা যায় না; তাহাই তোমার নিত্যস্বরূপ। উহাই অর্দ্ধমাত্রা নামে কথিত। উহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। মা! তোমার ত্রিমাত্রাস্বরূপে বরং বিশেষণ দেখিয়া বিশেষ্যের প্রতীতি হয়, জগৎ দেখিয়া শক্তির অনুমান হয়; কিন্তু সেখানে—সেই অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপে তুরীয় অবস্থায় তুমি অচিন্ত্য অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য। এক কথায়, যখন তোমাতে ত্রিমাত্রার পূর্ণভাবে লয় হয়, তখনই তুমি অনুচ্চার্য্যরূপে বিন্দুরূপে প্রকটিতা হও।

তৃতীয় মাত্রা বা মকারটি ব্যঞ্জন, উহা অর্দ্ধমাত্রা। ওকারের মস্তকে ঐ অর্দ্ধমাত্রাই নাদ ও বিন্দুরূপে প্রকাশিত। যাহার অবস্থিতি আছে, কিন্তু বিস্তৃতি নাই, তাহাকে বিন্দু বলে। ইহা জ্যামিতির অনুশাসন। ঐ অবস্থিতি-অংশটি নির্গুণ ব্রহ্মের দ্যোতক এবং বিস্তৃতি-অংশটি সগুণ ব্রহ্ম বা শক্তির প্রকাশক। ইহাই নাদ। যাঁহারা নির্গুণের গুণ বা শক্তি

স্বীকার করেন না, তাঁহারাই ব্রহ্ম হইতে মায়াকে পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন। যাহার অবস্থিতি আছে, তাহার একটু না একটু বিস্তৃতি আছেই; কারণ, বিন্দু-সমষ্টিই পদার্থ। বিন্দুকে মাত্র চৈতন্য এবং নাদকে মাত্র জড়শক্তিরূপে গ্রহণ করিলে, বিন্দুর শক্তিহীনতা আপতিত হয়। এ মতে শক্তিহীনের শক্তি-পরিচালকতা অসম্ভব বিধায় ব্রহ্মকে শক্তিহীন বলিতে হয়। ইহা বেদ ও যুক্তি-বিরুদ্ধ।

আমরা কিন্তু জানি মা! তুমি বিন্দুরূপে নির্গুণ, নাদরূপে সগুণ এবং ত্রিমাত্রাস্বরূপে জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়া রহিয়াছ। তবে তোমার এই অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপটি নিত্য—পরিবর্ত্তনহীন এবং অনুচ্চার্য্য—বাক্যের অগোচর। অতএব হে দেবি! প্রকাশাত্মিকে দ্যোতনশীলে মাতঃ! তুমিই সাবিত্রী—জগৎ প্রসবকর্ত্রী, আবার তুমিই পরাজননী। ঐ ত্রিমাত্রারূপে তুমি জগজ্জননী আর অর্দ্ধমাত্রারূপে তুমিই পরাজননী।

যাঁহারা ত্রিমাত্রা ও অর্দ্ধমাত্রাশব্দের অর্থ যথাক্রমে স্বর ও ব্যঞ্জন করেন, তাঁহাদের সহিতও আমাদের কোন বিপ্রতিপত্তি নাই; কারণ, স্বরের সাহায্যেই ব্যঞ্জন উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয়। স্বর বা শক্তি আশ্রয় করিয়াই নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণরূপে প্রকাশ পান।

ত্বয়ৈব ধার্য্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা ॥৫৪॥

অনুবাদ। হে মা! এই বিশ্ব তোমাকর্ত্তৃক নিয়ত বিধৃত; তুমিই এ জগতের সৃষ্টি ও পালন করিতেছ। হে দেবি! আবার অন্তকালে তুমিই ইহাকে ভক্ষণ বা গ্রাস কর।

ব্যাখ্যা। মা! সৃষ্টির পূর্ব্বে বীজরূপে এই বিশ্ব তোমারই গর্ভে বিধৃত থাকে; আবার তুমিই উক্ত বীজকে পরিবর্ত্তনশীল জগৎরূপে প্রসব কর। তারপর তুমিই ইহাকে পরিপালন করিয়া, অন্তকালে

বা সংহরণ করিয়া থাক। ইহাই তোমার মাতৃত্ব। গর্ভে ধারণ, প্রসব, বক্ষে ধারণ ও জ্ঞান-স্তন্যে পরিপোষণ এবং অবসানে—পূর্ণজ্ঞানময় অবস্থায় তোমাতে অভিন্নভাবে মিলন-সম্পাদন, ইহাই তোমার মহামায়াত্ব বা মাতৃত্ব। যতদিন আমি জগদ্‌ভোগের যোগ্যতা লাভ করি নাই, ততদিন বীজরূপে আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া তোমারই রক্ত অর্থাৎ উপরঞ্জনশক্তির দ্বারা আমার ভোগ-যোগ্যতা সম্পাদন করিয়াছ। তারপর যখন দেখিলে—আমি জগদ্ভোগে সামর্থ্য লাভ করিয়াছি, অমনি প্রসব বা সৃষ্টি করিয়া আমাকে বক্ষে লইয়াছ। নিজস্তন্যে—অমৃতে—বিষয়জ্ঞানে আমাকে পরিপুষ্ট করিতেছ। বিন্দু বিন্দু জ্ঞানসঞ্চয়রূপে অমরত্বলাভের যোগ্যতা-সম্পাদনের জন্য অসংখ্য জন্মমৃত্যু প্রভৃতি পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছ। যখন দেখিবে—আমি মাতৃ-স্নেহে মুগ্ধ হইয়াছি, মা বলিয়া আত্মহারা হইতে শিখিয়াছি, অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধান পাইয়াছি, পূর্ণজ্ঞানময় অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তখনই আমি অমৃত বা তোমার অন্ন হইব। তখন তুমি আমাকে অশন বা সংহরণ করিয়া তোমার অন্নপূর্ণা নাম সার্থক করিবে।

আমরা যে তোমার অন্ন। "সর্ব্বগ্রাসিনী মা একদিন আমাদিগকে গ্রাস করিবেন" যতদিন ইহা বুঝিতে না পারিব, ততদিন তুমিই আমার অন্ন। আমরা তোমারই স্তন্য পান করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছি। মা! তোমাকে যে কতরূপে ভোগ করিতেছি, তাহা ভাবিতে গেলেও স্তব্ধ হইতে হয়। যখন যাহা যেরূপ ভাবে চাহিতেছি, সেইরূপ ভাবে তখনই তাহা সাজিয়া আসিতেছ। তুমিই ত বিষয়াকারে আসিয়া আমার ইন্দ্রিয়ের ভোগ পূর্ণ করিতেছ, আমার উদ্দাম লালসার আহার যোগাইতেছ। এইরূপ একদিন নয়, দুইদিন নয়, কত জন্ম জন্মান্তর এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল বাসনা বুকে করিয়া ছুটিয়াছি। আর তুমি আমার এমনই স্নেহবিমূঢ়া মা যে, আমার ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য —বাসনানুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছ! পাছে আমার স্বাধীন ভোগের মধ্যে বিন্দুমাত্র অতৃপ্তি থাকে, আমার

সমুন্নত আমিত্বে বিন্দুমাত্র অসম্মান হয়, তাই এত করিয়াও আপনার সত্তা, আপনকর্ত্তৃত্ব লুক্কায়িত রাখিয়াছ। আমাকে বুঝিতে দাও নাই যে, তুমিই আমার বাসনা, তুমিই আমার ভোগ, তুমিই আমার অন্ন এবং তুমিই আমার পরিতৃপ্তি। এত স্নেহ, এত ভালবাসা তোমার বুকে! রোগ শোক দারিদ্র্য দুর্গতি আশাভঙ্গ সকল অবস্থার ভিতর দিয়া তোমার অনাবিল পুত্রস্নেহ প্রবাহিত। এ স্নেহ আমরা কবে বুঝিতে পারিব! মা! এতদিন তোমায় খাইয়াছি—অজ্ঞানে তোমায় ভোগ করিয়াছি, এখন তুমি আমাকে খাও। কেন আর একটা পৃথক্ আমিত্বের গণ্ডি দিয়া তোমা হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছ? আমি তুমি এক হউক! আর সর্ব্বরূপে কেন মা? সর্ব্বগ্রাসিনীরূপে দাঁড়াও! একবার আকুল নয়নে আত্মহারাভাবে পুত্রের মুখপানে তাকাও মা! তোমার দিব্য নয়নে আমার ক্ষীণজ্যোতিঃ মলিন নয়ন স্থাপিত করিয়া, আমি মা মা বলিয়া আত্মহারা হই! আর তুমি—এস পুত্র! এস বৎস! বলিয়া আমায় গ্রাস কর। আমি মরিয়া অমর হই।

কি বল্‌লি মা! তুই সুধা; অমৃতই তোর আহার! আমরা এখনও অমরত্ব লাভ করিতে পারি নাই—সুধা হই নাই; তাই, তুমি আহার করিতে পারিতেছ না! কেন, কার দোষ? আমার—না তোমার! আমি এখনও অযোগ্য সন্তান কার জন্য? তুমি বিজ্ঞানেশ্বরী মা, আর আমি অজ্ঞানান্ধ পুত্র! তুমি অমৃত, আর আমি মৃত্যুর কবলে অবস্থিত। কেন মা! কার দোষ? আমি চাহিয়াছিলাম! তাই কি? চাওয়ারূপে বাসনারূপে কে আমার বুকে ফুটিয়াছিল? লীলা! আর চাহি না মা। তোমার আনন্দময় জগৎলীলা করিতে হয়, সম্যক্‌ভাবে তোমার সহিত মিলিয়া করিব। আর পৃথক্ ভাবে কেন? মা মা মা!

এই মন্ত্রে ধার্য্যতে সৃজ্যতে পাল্যতে এবং অৎসি এই চারিটি ক্রিয়াপদের দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের মহামায়াত্ব বা মাতৃত্ব পূর্ণভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥৫৫॥

অনুবাদ। হে জগন্ময়ে! সৃষ্টিকালে তুমিই সৃষ্টিরূপা। পালনে তুমিই স্থিতিরূপা, আবার প্রলয়কালে তুমিই এই জগতের সংহন্ত্রীরূপা।

ব্যাখ্যা। মা! পূর্ব্বে বলিয়াছি—তুমিই এই জগতের উৎপাদন পরিপালন ও সংহরণকর্ত্রী; কিন্তু উহাতেও ঠিক বলা হয় নাই; কারণ ওরূপ বলিলে মনে হয়—তোমা হইতে জগৎ স্বতন্ত্র। বাস্তবিক, তুমিই যে জগন্ময়ী, তুমি ছাড়া কোথাও কিছুই নাই। যদিও সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই—প্রত্যেক কার্য্যেই তিনটী জিনিষের প্রয়োজন। একটী নিমিত্ত-কারণ বা কর্ত্তা, একটী উপাদান-কারণ বা উপকরণ এবং অপরটী কার্য্য বা বিশিষ্ট ফল; কিন্তু মা! তোমার এই জগদ্ব্যাপারে তুমিই নিমিত্ত, তুমিই উপাদান, তুমিই কার্য্য। জল জমিয়া বরফ হয়, তাহাতেও বরং শৈত্যরূপ একটী আগন্তুক হেতু বিদ্যমান থাকে; কিন্তু তোমার এই জগদ্ব্যাপারে সে সব কিছুই নাই। তুমিই কার্য্য, তুমিই কারণ, আবার তুমিই কর্ত্তা।

আমি একটী ফল চাহিলাম। এই চাওয়া বা বাসনাই ফলের বীজ। (অব্যক্তা মা বাসনারূপে ফলের বীজ-আকারে প্রকাশ পাইলেন)। তারপর উক্ত বাসনা ঘনীভূত হইয়া ফলরূপে বাহিরে প্রকটিত হয়; কারণ, বাসনার ঘনীভূত অবস্থাই ফল। সেই ফলটী আমার ভোগের অবসানে আবার অব্যক্তে মিলাইয়া যায়। প্রতিনিয়ত এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। কোন্ এক অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতে এক একটী বাসনা ফুটিয়া উঠে, পুনঃপুনঃ ঐ বাসনাটী উদ্বুদ্ধ হইয়া অভিলষিত বিষয়রূপে—ইন্দ্রিয়-ভোগ্যরূপে উপনীত হয়। ভোগের অবসানে আবার অব্যক্তে মিলাইয়া যায়। এই যে ত্রিবিধ প্রকাশ; ইহাই সৃষ্টি স্থিতি ও সংহৃতি নামে অভিহিত। প্রতিনিয়ত প্রতিজীবে সম্যক্‌ভাবে এই ত্রিশক্তি পরিব্যক্ত! হে জগন্ময়ি মা! তোমার এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম নাই। আমারই জন্য তুমি অজ্ঞেয়া হইয়া জ্ঞানরূপা,

শক্তিত্রয়াতীতা হইয়াও শক্তিরূপিণী, ক্রিয়াতীতা হইয়াও ক্রিয়াশীলা। তাই দেখিতে পাই—সৃষ্টিকালে তুমিই সৃষ্টিরূপা, পালনকালে তুমিই স্থিতিরূপা, আবার প্রলয়কালে তুমিই সংহৃতিরূপা। এই ত্রিবিধ ক্রিয়াশক্তিরূপে তুমিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাক।

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥৫৬॥

অনুবাদ। মা! তুমি মহাবিদ্যা এবং মহামায়া, মহামেধা এবং মহা-অস্মৃতি; সুতরাং তুমি মহামোহরূপিণী; অতএব তুমিই মহাদেবী ও মহা-আসুরী।

ব্যাখ্যা। মা! যাবতীয় অসম্ভব ব্যাপার তোমাতেই সম্ভব। আলোক অন্ধকার অতি বিরুদ্ধ পদার্থ হইয়াও তোমাতেই সহাবস্থান করিতেছে। মহতী দৈবী প্রকৃতি এবং মহতী আসুরী প্রকৃতিরূপে তুমিই বিরাজিতা; তাই, তুমি মহাদেবী হইয়াও মহাসুরী; কারণ তুমিই মহাবিদ্যা হইয়াও মহামায়া। মহতী ব্রহ্মবিদ্যারূপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াও জীবজগৎরূপে মহামায়া-মূর্ত্তিতে বিরাজিতা। আবার মহামেধা হইয়াও মহতী অস্মৃতি। আত্মজ্ঞান-ধারণোপযোগিনী মহতী ধীস্বরূপা মহামেধা তুমি, আবার তোমাকে ভুলিয়া থাকা, তোমার অস্তিত্ব বিস্মৃত হওয়া, ইহাও তোমারই প্রভাব। তুমিই মহতী বিস্মৃতিরূপে জীবহৃদয়ে বিরাজিতা; সুতরাং মহামোহরূপিণীও তুমি। তোমার সর্ব্ববিধ কার্য্য, জাগতিক কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা-জ্ঞানের অতীত। মানববুদ্ধি তোমাকে বুঝিতে পারে না। মানুষ মনে করে—আলোক অন্ধকার একস্থানে থাকিতে পারে না। জ্ঞান অজ্ঞান, মেধা বিস্মৃতি যুগপৎ অবস্থান করিতে পারে না; কিন্তু মা! তোমাতে সকলই সম্ভব। দৈবী এবং আসুরী প্রকৃতি পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়াও তোমাতে নিত্য অবস্থিত। মা গো! তুমিইত আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছ—আলোকের অল্পতাই অন্ধকার, জ্ঞানের অল্পতাই অজ্ঞান।

তাইত মা তোমার সৃষ্ট জীবজগতেও দেখিতে পাই—তোমার এই উভয়বিধ বিরুদ্ধ মূর্ত্তির যুগপৎ অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ। (১)

যাঁহারা মহাবিদ্যা-শব্দে কালী তারা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যারূপ অর্থ করেন, তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারা যায় না; কারণ, এই মন্ত্রে মায়ের দুইটী মহতী প্রকৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। একটি দৈবী ও অন্যটী আসুরী। এই দুইটি প্রকৃতির স্বরূপ পরিব্যক্ত করিতে গিয়া মহাবিদ্যা ও মহামায়া, মহামেধা ও মহতী অস্মৃতিরূপ পরস্পর অত্যন্তবিরুদ্ধ স্বরূপদ্বয় কথিত হইয়াছে; সুতরাং মহাবিদ্যা শব্দের অর্থ এস্থলে ব্রহ্মবিদ্যা করাই সঙ্গত।

প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥৫৭॥

অনুবাদ। মা! তুমি সকলের প্রকৃতি। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ দ্বারা তোমার প্রকৃতি-স্বরূপটী বিভাবিত হয়। আবার এই

(১) শিশুকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি—জ্ঞান অজ্ঞান, বিদ্যা অবিদ্যা, সৎ অসৎ, ইহারা পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ পদার্থ; কিন্তু সত্যই কি উহারা অত্যন্ত বিরুদ্ধ? পরস্পর বিরোধি-পদার্থদ্বয়ের একাধিকরণে সহাবস্থান মানব-বুদ্ধির অতীত হইলেও, "পরমেশ্বরে সকলই সম্ভব" বলিয়া, যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। উপলব্ধিও হয়—জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান থাকে না, আবার অজ্ঞান থাকিতেও জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় না। তথাপি ঐ অজ্ঞানটি যখন জ্ঞানেই অবস্থান করিতেছে, তখন অজ্ঞানকে জ্ঞানবিরোধি না বলিয়া, ঈষৎ জ্ঞান বলিলে কোনরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা স্বীকার করিতে হয় না; কারণ, অখণ্ড পূর্ণজ্ঞান ও ঈষৎ জ্ঞানের সহাবস্থান অসম্ভব হয় না। এইরূপ অবিদ্যা অসৎ প্রভৃতি শব্দেও নঞ্‌টির ঈষদর্থ স্বীকার করিয়া লইলেই সর্ব্ববিধ তর্কের অবসান হয়। বিরোধ এবং ঈষৎ এই উভয়ার্থই যখন লাক্ষণিক তখন ঈষদর্থ স্বীকার করিতে আপত্তি কি? ন্যায় মতে কিন্তু নঞ্‌এর লাক্ষণিকতাই স্বীকৃত হয় নাই।

ত্রিগুণলয়ের জন্য তুমিই দারুণা (ভয়ঙ্করী) কালরাত্রি মহারাত্রি ও মোহরাত্রিরূপে প্রকটিতা হও।

ব্যাখ্যা। মা! তুমি কেবল সমষ্টিরূপা মহতী প্রকৃতি নও, ব্যষ্টি প্রকৃতিরূপেও তুমি। প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্র প্রকৃতিরূপে অধিষ্ঠিতা। প্রকৃতি-শব্দের স্থূল অর্থ—স্বভাব। যে জীবের যেরূপ স্বভাব, তাহাই তাহার প্রকৃতি। মা! সমষ্টিতে তোমার মহাদেবী ও মহা-আসুরী এই দুইটি প্রকৃতি দেখিয়া আসিয়াছি। এখানে ব্যষ্টিতেও আবার তাহাই দেখিতেছি। কাহারও দৈবী প্রকৃতি, কাহারও আসুরী প্রকৃতি। কেহ সাধু, কেহ অসাধু। ঐ যে সাধক মা মা বলিয়া আত্মহারা হইয়া মুক্তিপথে চলিয়াছে, উহার ভিতরে সাধনারূপে যে দৈবী প্রকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে, উহা তুমি; আবার ঐ যে পাপের নিম্নতম সোপানে অবতরণ করিয়া কেহ নরকের চিত্র উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক জগতে ঘৃণাভাজন হইতেছে, ঐ নিন্দিত আসুরী প্রকৃতিরূপেও তুমি। তুমি যখন যে জীবকে যে মূর্ত্তিতে কোলে করিয়া বসিয়া থাক, সে সেইরূপ স্বভাবের পরিচয় দেয়। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্বাসবাণী আর কি আছে! যাহার যেরূপ প্রকৃতিই থাকুক না কেন, তাহাই তাহার মা।

মা! পূর্ব্বে তোমার মহতী মূর্ত্তি দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়াছিলাম—বুঝি আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠের কাতর আহ্বান কৈলাসের হৈম সিংহাসন পর্য্যন্ত পৌঁছিবে না; তাই তুমি এই নিত্য-সন্নিহিত অভয়া মূর্ত্তি দেখাইলে। তুমি ব্রহ্মাণ্ডের জননী, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের প্রসূতি হইয়াও আমার প্রকৃতিরূপে একা আমার মা—তুমি শুধু আমার প্রীতি-সাধন, আমার ভোগাপবর্গ-সাধনের জন্য আমাকে বক্ষে করিয়া রাখিয়াছ! আমার প্রত্যেক অভাব অভিযোগ, আমার প্রত্যেক ক্ষুদ্র বাসনাটী পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবার জন্য তুমি প্রকৃতিরূপে আমার মা! এইরূপ প্রতি জীবের—ক্ষুদ্র কীটাণু হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু পর্য্যন্ত প্রত্যেকের যে বিভিন্ন প্রকৃতি, উহা তুমিই; তাই "প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য।" তুমি সমষ্টিতে সকলের মা, আবার ব্যষ্টিতে প্রত্যেকের মা। হউক তোমার ছিন্ন বসন, হউক তোমার রুক্ষ কেশ, হউক

তোমার মলিন গাত্র, হউক তোমার রুগ্ন দেহ, তথাপি তুমি আমার মা! শুধু আমার! আর কাহারও নয়!

স্ব স্ব প্রকৃতিরূপিণী তোমাকে অবজ্ঞা করিয়াই জীবের নানারূপ দুরবস্থা, সাধনা-জগতের অসম্ভব বিপর্য্যয়, সাম্প্রদায়িক দুষ্টভাব প্রভৃতি সংঘটিত হয়। ঘরের মাকে অবজ্ঞা করিয়া, কোথায় কাহাকে মা বলিতে যাওয়া জীবের কি মূঢ়তা! আপনার মাকে পরিত্যাগ করিয়া অপরের দ্বারে স্নেহপ্রার্থী হইলে যে, অবিধিপূর্ব্বক তোমারই কৃপা প্রার্থনা করা হয়, ইহা গীতায় রাজ্যগুহ্য-যোগে তুমি বিশেষভাবে বলিয়াছ! মা! আমিও একদিন তোকে চিনিতে না পারিয়া, তোর দীনতার মলিন বেশ দেখিয়া, ঘৃণাভরে দূর করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। সেই দিনের তোর সে অভিমানভরা ও অশ্রুভারাক্রান্ত মুখখানি মনে পড়িলে, এখনও বক্ষ বিদীর্ণ হয়! তুমি যে আমার রাজরাজেশ্বরী মা! অনন্ত জগতের অধীশ্বরী মা, তাহা কি সে দিন বুঝিতে পারিয়াছিলাম! কত অবজ্ঞা করিয়াছি, এখনও করিতেছি, আর প্রতি মুহূর্ত্তে তুমি অভিমানভরে বলিতেছ—"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।" সত্যই মা! মানুষ আমরা তোমায় বড়ই অবজ্ঞা করি। তোমার তির্য্যক্ সন্তানগণ তোমায় জানে না, তাহাদের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তির বিকাশ হয় নাই; সুতরাং তাহাদের অবজ্ঞা সম্ভব নহে। তারপর তোমার প্রিয়তম সন্তান দেবতাবৃন্দ—তাঁহারা তোমাতে নিত্যযুক্ত। নিত্য স্ব স্ব প্রকৃতিরূপিণী মহামায়ার পূজায় নিরত; কিন্তু মানুষ আমরা মানুষী-তনু-আশ্রিতা প্রকৃতিরূপিণী তোমাকে নিয়ত—প্রতিপদক্ষেপে অবজ্ঞা করিতেছি। আমার কোন্ কার্য্যটী তোমা ব্যতীত হয় মা! নিশ্বাসটী হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত, কোন্ কার্য্যটী তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া সম্ভব হয়! ওগো! ভোগরূপে তুমি অপবর্গরূপেও তুমি, সুখরূপে তুমি, অসুখরূপেও তুমি, হাসিরূপে তুমি, কান্নারূপেও তুমি, জন্ম-মৃত্যুরূপে তুমি, আবার বন্ধন-মুক্তিরূপেও তুমি। প্রতিজীবে বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন সাজে একমাত্র তুমিই বিরাজিতা।

শুধু কি তাই মা! আমি বহুত্বপ্রিয়, আমি নিত্য নূতন সাজে সাজিতে চাই, অমনি তুমি আমারই জন্য নিত্য নূতন সাজ পরিধান করিয়া, একই তুমি বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত হও। কখনও সাধু সাজিতে চাহিয়াছি, অমনি তুমি সাধুর সাজে আমায় কোলে করিয়া রাখিয়াছ! কখনও তস্কর সাজিতে চাহিয়াছি, অমনি তুমি তস্করের মলিন সাজ পরিয়া আমায় কোলে করিয়া বসিয়া আছ। এইরূপ কি স্বর্গে, কি নরকে, তুমি ত আমায় এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোলছাড়া কর নাই। শুধু আমার মা হইয়া, আমার প্রত্যেক অভিসন্ধি পূরণ করিবার জন্য বিশ্বস্ত অনুচরের মত, প্রিয়তম সখার মত, সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছ! যে দিন আমি তোমার মহতী মূর্ত্তির সুধাময় অঙ্ক হইতে বহুত্বের উল্লাসে লাফাইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই দিন হইতে তুমি আমার একার মা সাজিয়াছ। সেই দিন হইতে তুমি আমার চির সাথী। এত ভালবাসা! এত আদর! এক দিন তাকাইয়া দেখিলাম না! তুমি আমার জন্য এত করিয়াছ, করিতেছ; অথচ বিন্দুমাত্র প্রতিদানের অপেক্ষা রাখ নাই। কৃতজ্ঞতা, প্রতিদান—দূরের কথা, প্রতিনিয়ত তোমার অঙ্কে বসিয়া তোমায় অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছি; তথাপি তুমি যেমন স্নেহশীলা, যেমন পুত্রস্নেহে অন্ধা, তেমনই রহিয়াছ। আমার দোষ দেখিবার চক্ষু তোমার নাই, অবজ্ঞা দেখিবার অবসর তোমার নাই, এমনই মা তুমি! কবে আমি তোমায় মা বলিব! বেশী নয়, একবার মাত্র মা বলিব! শুধু ঐটুকু অপেক্ষা করিয়া নির্নিমেষ নেত্রে অহর্নিশ আমার পানে তাকাইয়া রহিয়াছ—কবে আমার মুখ দিয়া যথার্থ মাতৃনাম বিনির্গত হইবে। শুধু ঐটুকু তোমার অপরিসীম স্নেহের প্রতিদান। কই, তাহাও ত পারি না! তোমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেই যে তুমি রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইবে, ইহা ত কিছুতেই বুঝিতে পারি না! তাই, তোমাকে ভগ্ন গৃহে উপেক্ষিতা পরিচারিকা সাজাইয়া রাখিয়াছি'। ওগো তোমার প্রিয়তম পুত্রগণকে বলিয়া দাও—স্ব স্ব প্রকৃতিই মা। যাহারা মাকে অনুসন্ধান করিয়া পায় না, তাহাদিগকে বলিয়া দাও—স্ব স্ব প্রকৃতিই মা। যাহারা সাধনা করিয়া হতাশ হয়, তাহাদিগকে বলিয়া

দাও—স্ব স্ব প্রকৃতিই সাধনার অবলম্বন। যাহারা গুরুর সন্ধান করিয়া পায় না, তাহাদিগকে বলিয়া দাও—স্ব স্ব প্রকৃতিই গুরু।

মা! তুমি গুণত্রয়বিভাবিনী; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণে তোমার ব্যষ্টি ও সমষ্টি প্রকৃতি বিভাবিত—পরিব্যক্ত হইয়া থাকে। নির্গুণা মা! তুমি যখন সর্ব্বপ্রথমে একত্ববোধে সম্বুদ্ধ হইয়াছিলে, তখন এক দ্বারা গুণিত হইলে—ইহাই সত্ত্বগুণ। তার পর যখন বহু হইবার জন্য ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ করিলে, তখন দ্বিগুণিত হইলে—ইহাই রজোগুণ। আর যখন বহু হইতে গিয়া, তোমার চৈতন্যময় স্বরূপটি জড়াকারে পরিণত হইল, তখন তৃতীয় বার গুণিত হইলে—ইহাই তমোগুণ। সত্ত্বগুণে তোমার সৎ, রজোগুণে চিৎ এবং তমোগুণে আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। সচ্চিদানন্দময়ী মা! তুমি আপনাকে বিশিষ্টভাবে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া, তিন গুণে গুণিত হইয়া, সমষ্টিতে মহতী, দৈবী ও আসুরী প্রকৃতিরূপে এবং ব্যষ্টিতে জীব-প্রকৃতিরূপে অভিব্যক্ত হও। তুমি অনির্দ্দেশ্যা, অব্যক্তরূপা হইয়াও পুত্র-স্নেহের প্রেরণায়, গুণত্রয় বিভাবিনী—প্রকৃতি। দর্শনকারগণ বলেন—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। উহা অব্যক্ত; সুতরাং অসাধ্য। আমরা চাই—তোমাকে আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ করিতে। আমরা স্থূল হইয়া পড়িয়াছি; তাই তোমার স্থূলভাবের সেবা করিয়াই আত্মতৃপ্তির সন্ধান করি; সুতরাং ত্রিগুণাত্মিকা ব্যষ্টিমূর্ত্তিই আমাদের আরাধ্য। যাঁহারা সমষ্টির সন্ধান পাইয়াছেন—হিরণ্যগর্ভ হইয়াছেন, তাঁহারা উচ্চ অধিকারী—তাঁহারা তোমার সমষ্টি-প্রকৃতি মহাদেবী-মূর্ত্তির পূজা করুন। আমরা ক্ষুদ্র অবোধ শিশু, খেলার পুতুল ভালবাসি; তাই, তোমার সর্ব্বভাবময়ী সর্ব্বেন্দ্রিয়যুক্ত ব্যষ্টি প্রকৃতিরূপা মূর্ত্তিই আমাদের প্রিয়। তাই, আমাদের নিকট তুমি গুণত্রয়বিভাবিনী। আমরা জানি—তোমার এই মূর্ত্তির পূজা করিতে পারিলেই, মহতী মূর্ত্তির সন্ধান পাইব; কারণ, এই তিন গুণকে সম্যক্ লয় করিবার জন্য, তুমিই কালরাত্রি, মহারাত্রি এবং মোহরাত্রি-রূপে প্রকটিত হইয়া থাক।

কালও যে স্থানে প্রকাশিত হয় না তাহাই কালরাত্রি। সত্ত্বগুণের লয়স্থানকে কালরাত্রি কহে। এইরূপ রজোগুণের লয়স্থানকে মহারাত্রি এবং তমোগুণের লয়স্থানকে মোহরাত্রি কহে। মোহ তমোগুণের বহিঃপ্রকাশ; উহার রাত্রি—অপ্রকাশ অর্থাৎ লয়স্থান।

গুণত্রয়বিভাবিনী মা! ব্যষ্টিপ্রকৃতিরূপে তুমি শুধু আমার মা—আর কাহারও নয়, কেবল আমার মা! এইরূপ কেবল আমার মা তোমাকে পূজা করিতে গিয়া, ক্রমে তোমার যে তিনটি স্বরূপ দেখিতে পাইব, এই স্থানে তুমি তাহারই পূর্ব্বাভাস দিলে। তুমি কালরাত্রি-রূপে আবির্ভূত হইয়া, আমার কালজ্ঞান দূর করিয়া দিবে। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানরূপ ত্রিবিধ কালপ্রতীতি, গভীর 'অন্ধকারময় ক্ষেত্রে—অপ্রকাশযোগ্য স্থানে বিলীন হইবে। সকলই বর্ত্তমানবৎ প্রতীত হইবে। তখন আমি কালের অতীত হইয়া মৃত্যুঞ্জয় হইব, তোমার রক্তচরণ বক্ষে ধরিয়া শিব হইব, জীবত্ব চিরদিনের জন্য ঘুচিয়া যাইবে। ইহাই সত্ত্বগুণের প্রলয়। আবার মহারাত্রিরূপে আবির্ভূত হইয়া, তুমি আমার মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত বিলীন করিবে। তখন আমার ক্রিয়াশীলতা বা রজোগুণজনিত চঞ্চলতা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে, আমার নৈষ্কর্ম্য লাভ হইবে; তখন আমি শুধু চৈতন্যময় আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ থাকিব। আর মোহরাত্রিরূপে প্রকটিত হইয়া, আমার জগৎমোহ সংসার ধাঁধা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করিয়া দিবে। তখন আমি অজেয় মোহকে জয় করিয়া নিত্য চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে চিরতরে মুহ্যমান থাকিব।

মা! তোর এই মূর্ত্তিত্রয় দারুণা—অতীব ভয়ঙ্করী। যেখানে কাল-শক্তি রুদ্ধ, জগৎপ্রকাশ সুপ্ত, মোহশক্তি বিমুগ্ধ, তোর সেই কৃষ্ণা রাত্রিমূর্ত্তি স্মরণ করিলেও জীবের ভীতি উপস্থিত হয়। অমাবস্যার ঘনকৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারেও বরং একটা প্রকাশ আছে; কিন্তু মা! তোর সেই কৃষ্ণামূর্ত্তিতে তাহাও নাই। সর্ব্ববিধ-বিকাশ সেখানে বিলুপ্ত। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্। নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ"॥ সে কি দারুণ মূর্ত্তি! অথচ

স্বপ্রকাশ, অনন্ত-শান্তিময়ী। আমিত্বের গাত্রসংলগ্ন সর্ব্ববিধ জঞ্জাল দূরীভূত করিয়া, মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের রাজত্ব ছাড়িয়া, শুধু আত্মবোধটী লইয়া সেই স্থানে অবস্থান করা যায়। রাত্রিরূপিণী মা! তোমার সেই মধুময় অঙ্ক যে কত লোভনীয়, তাহা ভাষায় কিরূপে ব্যক্ত করিব! সেই দেবীপুরাণের একটী শ্লোক দেখিয়াছিলাম—"ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিঃ পরমেশলয়াত্মিকা" যেখানে জীব ত দূরের কথা পরমেশ্বরের পর্য্যন্ত বিলীন হয়, সেই একমাত্র ব্রহ্মমায়াই তোমার স্বরূপ। এই ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিরূপিণী তুমি, ত্রিগুণলয়ের জন্য জীবভাবের পক্ষে অত্যন্ত ভীতিপ্রদা কালরাত্রি ও মোহরাত্রিরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাক!

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ॥৫৮॥

অনুবাদ। মা! তুমিই শ্রী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমি অকর্ম্ম-জুগুপ্সারূপিণী হ্রী, তুমি বুদ্ধি এবং তুমিই শুদ্ধবোধস্বরূপা। লজ্জা পুষ্টি তুষ্টি শান্তি এবং ক্ষমাও তুমি।

ব্যাখ্যা। মা! তুমি যে ব্যষ্টি-প্রকৃতিরূপে সর্ব্বজীবে বিরাজিতা রহিয়াছ, তাহাই এই ব্রহ্মস্তোত্রে বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। "ত্বং শ্রীঃ"—মা তুমিই জীবের সৌভাগ্যরূপিণী। যখন দেখিতে পাই—কোন জীব সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য যশঃ অভ্যুদয় প্রভৃতি নানাবিধ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তখনই বুঝিতে পারি—শ্রীরূপিণী তুমি তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছ। যখন দেখিতে পাই, কেহ ঈশ্বরত্ব—প্রভুত্ব অর্থাৎ সহস্র সহস্র লোকের উপরে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তখনই বুঝি—তুমি ঈশ্বরীমূর্ত্তিতে তাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়াছ। যখন দেখিতে পাই—কেহ অসৎ কর্ম্ম করিয়া নিন্দার ভয়ে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝি, সে হ্রীরূপিণী তোমারই অঙ্কে অবস্থিত। আমাদের যে নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি বা বুদ্ধি, যাহা এই জগৎকে

প্রকাশ করিতেছে, যাহা না থাকিলে জগৎসত্তা থাকে না, সেই বুদ্ধিরূপে তুমিই বিরাজিতা। আবার যখন জগৎবোধ বিলুপ্ত হইয়া যায়, শুদ্ধবোধমাত্ররূপে আত্মসত্তা সম্বুদ্ধ থাকে, শুধু বোধ ব্যতীত যাহার অন্য কোন লক্ষণ নাই, তুমিই সেই বোধলক্ষণা মা। কোন নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া, যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, সেই লজ্জারূপেও প্রতিজীবে তুমিই অধিষ্ঠিতা! এইরূপ যখন দেখিতে পাই—কেহ দৈহিক পুষ্টিলাভ করিয়া জনসমাজে অতুলনীয় বলবান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করে, তখনই বুঝি—পুষ্টিরূপিণী মা তুমি তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছ। যখন দেখি, কেহ মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া দিনযাপন করিতেছে, তখনই বুঝি—তুষ্টি-রূপিণী মা তুমি তাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আছ। যখন দেখিতে পাই—কেহ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া জগতের সুখ দুঃখের অতীত শান্তিময় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তখনই বুঝি—শান্তিরূপিণী মা তুমি তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছ। যখন দেখিতে পাই—কেহ প্রতিকার করিবার সামর্থ্য সত্ত্বেও পরের অপকার অম্লান বদনে সহ্য করিতেছে, তখনই বুঝি—সে ক্ষমারূপিণী মা তোমারই অঙ্কে অবস্থিত।

মা! এই সকল মূর্ত্তিতে সর্ব্বজীবের প্রকৃতিরূপে তুমি নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছ; কিন্তু মূঢ় জীবগণ ঐ সকলকে মানসিক বৃত্তিমাত্র বলিয়া উপেক্ষা করে। হায়! তাহারা জানে না যে, তাহাদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য, তাহাদিগকে ধরা দিবার জন্য তুমিই এইরূপ বহু মূর্ত্তিতে আসিয়া তাহাদিগকে আদর করিতেছ। মা! তোমার এ সকল নিত্য প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি—তোমার সর্ব্বত্র সর্ব্বদা প্রকট স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কোন্ সপ্তস্বর্গের পরপারে, কোন্ সর্ব্বতত্ত্বের অতীত ক্ষেত্রে জীব তোমাকে অন্বেষণ করিতে যায়! যাহাকে তুমি চক্ষু দিয়াছ, সে যে সর্ব্বভাবে তোমার আলিঙ্গনে সংবদ্ধ থাকিয়া নিয়ত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। কিন্তু সে অন্য কথা।

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা ॥৫৭॥

অনুবাদ। মা। তুমি খড়্গ ও শূলধারিণী, তুমি ঘোরা—তোমার এক হস্তে নৃমুণ্ড ; তুমিই গদা চক্র শঙ্খ ধনু বাণ ভুশুণ্ডী (কণ্টকাকীর্ণ লৌহ-লগুড় বিশেষ) এবং পরিঘরূপ (লৌহমুদ্গর) আয়ুধসমূহ ধারণ কর।

ব্যাখ্যা। মা! পূর্ব্ববর্ত্তিমন্ত্রে জীব-জগতে তোমার শ্রী, ঈশ্বরী প্রভৃতি দশবিধ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে। উহারা মাতৃ-ভাবে—ব্রহ্মভাবে উপাসীত না হইলে অর্থাৎ যাহারা "মনোব্রহ্ম" এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত সাধনায় বিমুখ, তাহাদিগের পক্ষে তোমার ঐ সকল মূর্ত্তি উৎপীড়নকারিণী দশপ্রহরণধারিণীরূপে আবির্ভূত হয়। উহা বাস্তবিক উৎপীড়ন নহে, শাসনের আকারে মাতৃ-স্নেহের বহির্বিকাশ। অনভিজ্ঞ শিশু-সন্তানকে অনেক সময় শাসনরূপ স্নেহবিকাশে জ্ঞানের উজ্জ্বলক্ষেত্রে আনয়ন করিতে হয়! তাই, তুমি খড়্গ শূল গদা প্রভৃতি আয়ুধবিমণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হও।

যে জীব শ্রীরূপিণী প্রকৃতির অঙ্কে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যলাভে ধন্য, সে যদি অনভিজ্ঞ শিশুর মত ঐ সৌভাগ্য ভোগ করিয়া যায়,—তুমিই যে তাহার অভ্যুদয়রূপে প্রকটিতা, তাহা যদি না দেখে, অভ্যুদয়রূপিণী মা! তোমার চরণে যদি কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি না দেয়, তবে সেই জীবের পক্ষে শ্রীরূপিণী মা তুমি খড়্গিনী মূর্ত্তিতে প্রকটিতা হও। অর্থাৎ শীঘ্রই উক্ত সৌভাগ্য-সুখকে খড়্গাচ্ছিন্নের ন্যায় বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও। তুমিই যে শ্রীরূপে আসিয়াছিলে, ইহা বুঝাইবার জন্য—যে অহঙ্কার তোমাকে না দেখিয়া স্বয়ং সৌভাগ্যবান্ হইয়া বসিয়াছিল, তাহার মস্তক ছিন্ন করিবার জন্যই তোমার শ্রীমূর্ত্তি খড়্গধারিণীরূপে প্রকটিত হয়। এইরূপ যাহারা প্রভুত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরীমূর্ত্তি তোমায় অবজ্ঞা করে, তাহাদিগের নিকট তুমি শূলধারিণী-রূপে প্রকটিত হও। প্রভুত্ব হইতে বিচ্যুতিরূপ শূলাঘাতে তাহাদিগকে

বিদ্ধ কর, তাই তোমার ঈশ্বরীমূর্ত্তি শূলধারিণী। যাহারা অসৎকর্ম্ম করিয়া নিন্দাভয়ে গোপন করে, সে হ্রীমূর্ত্তিরূপিণী তোমারই অঙ্কস্থিত জীব যদি তোমার উদ্দেশ না রাখে, যদি তোমার স্মরণ না করে, তবে অচিরাৎ তুমি এক হস্তে নৃমুণ্ডধারিণী ঘোরারূপে আবির্ভূত হইয়া, তাহার সেই অসৎকর্ম্ম জনসমাজে প্রকাশিত করিয়া, তোমার শরণাগত হইতে শিক্ষা দাও। এইরূপ যাহারা বুদ্ধিবৃত্তিকে তোমারই স্বরূপ না দেখিয়া বুদ্ধিমাত্র মনে করে, তাহারা পুনঃপুনঃ দৈব-প্রতিকুলতারূপ গদার আঘাতে আহত হইয়া স্বকীয় বুদ্ধিকে ভ্রমসঙ্কুলা মনে করিয়া ব্যথিত হয়। তাই, বুদ্ধিরূপিণী মা! সে স্থানে তোমার গদাধারিণী-মূর্ত্তিতে প্রকাশ। যাহারা তোমার কৃপায় শুদ্ধবোধের সন্ধান পাইয়াও উহাকে তত্ত্বমাত্রজ্ঞানে উপেক্ষা করে, উনিই যে একজন, ইহা না বুঝিয়া একটি আকাশীয়-ভাবমাত্র মনে করে, তাহাদের সংসারচক্রে পরিভ্রমণ নিবৃত্ত হয় না। তাই মা তোমার বোধলক্ষণা মূর্ত্তি অজ্ঞান জীবের নিকট চক্রধারিণীরূপে প্রকটিতা হয়। যাহারা অসৎকর্ম্মে সঙ্কোচরূপ লজ্জাকে তোমারই বিশিষ্ট আবির্ভাব বলিয়া দেখে না, তাহাদের সেই নিন্দিত কর্ম্ম অচিরাৎ শঙ্খনিনাদে সর্ব্বজন-বিদিত হইয়া পড়ে। তাই মা তুমি লজ্জারূপে শঙ্খিনী। যাহারা শারীরিক পুষ্টিকে মাত্র আহার ঔষধ অথবা ব্যায়ামের ফল মনে করিয়া, পুষ্টিরূপিণী তোমার অনাদর করে, তাহাদের সে পুষ্টি দুরারোগ্য রোগে পরিণত হইয়া, তোমার চাপিনী বা ধনুর্দ্ধারিণী মূর্ত্তির আবির্ভাব ঘোষণা করে। যাহারা মানসিক তুষ্টিকে তোমারই মূর্ত্তি না দেখিয়া, মাত্র বিষয় ভোগের সন্ধান করে, আকস্মিক বিপৎপাতরূপ বাণবিদ্ধ হইয়া তাহাদের মর্ম্মদেশ চিরদিনের জন্য ব্যথিত হয়; তাই তোমার তুষ্টিমূর্ত্তি বাণধারিণী। যাহারা শান্তি লাভ করিয়া শান্তিরূপিণী তোমার মূর্ত্তি দেখিতে না পায়, জ্ঞানসম্পন্ন হইলেও তাহাদিগকে সাংসারিক দুর্ঘটনারূপ লৌহলগুড়াঘাতজনিত যাতনা সহ্য করিতে হয়। তাই, তুমি শান্তিরূপ ভুশুণ্ডীধারিণী। যাহারা অপরকে ক্ষমা করিয়া, তোমার ক্ষমাময়ী মূর্ত্তি না দেখে,

তাহারা অন্য কর্ত্তৃক অযথা উৎপীড়িত হইয়া তোমার পরিঘধারিণী-রূপের বিকাশ দেখিতে পায়।

এইরূপ যাহারা সর্ব্বভাবে তোমায় না দেখে, তাহারা যতদিন তোমায় না দেখিবে, ততদিন তুমি ঐ সকল ভাবের ভিতর দিয়া একটা না একটা উৎপীড়ন আনিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাক। সন্তানের অজ্ঞান দূর করিবার জন্যই তোমার এই শাসনকর্ত্রী মূর্ত্তি। যাহারা একবার শাসনে বুঝিতে না পারে, তাহাদের নিকট বাধ্য হইয়া তোমাকে পুনঃপুনঃ ঐরূপ বিভিন্ন আয়ুধধারিণী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইতে হয়। ইহা তোমার সন্তান-বাৎসল্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। সন্তানকে অপূর্ণ দেখিয়া, পূর্ণা তোমার পরিতৃপ্তি হয় না ; তাই সন্তানের ইচ্ছার অভ্যন্তর দিয়া—সন্তানের অভিলাষ পূরণের অন্তস্তল দিয়া, তোমার মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছা অলক্ষিতে পরিচালিত হয়। সেই ইচ্ছা ততদিনই শাসনের আকারে আসিয়া থাকে—যতদিন জীব সর্ব্বভাবে তোমাকে দেখিতে না পায়। আর যাহারা তাহা পারে, তাহাদিগের নিকট তুমি এই সকল মূর্ত্তিতে প্রকটিতা না হইয়া, সৌম্যা-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও। পরবর্ত্তি মন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে।

সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥৬০॥

অনুবাদ। মা! তুমি সৌম্যা, সৌম্যতরা এবং সৌম্যতমা। তুমি অতিশয় সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা। তুমি পর এবং অপর উভয়েরই আশ্রয়—পূজনীয়া ; সুতরাং তুমিই পরমেশ্বরী।

ব্যাখ্যা। মা! যাহারা সর্ব্বভাবে তোমাকে দেখিতে অভ্যস্ত হয় নাই, সে অজ্ঞান শিশুগণের জ্ঞাননেত্র-উন্মীলনের জন্য তুমি নানা প্রহরণ-ধারিণী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হও। আর যাহারা স্ব স্ব প্রকৃতিকে মা বলিয়া জানিয়াছে, সর্ব্বভাবে সর্ব্বত্র মায়ের কর্ত্তৃত্ব দেখিয়া আপনাকে যন্ত্রস্বরূপ মনে করে, যাহারা "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।

ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া” ॥ এই গীতোক্ত মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের নিকট তুমি সৌম্য মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হও।

যাহারা কেবল জ্ঞানে বুঝিয়াছে—সর্ব্বভাবে একমাত্র তুমিই বিরাজিতা অর্থাৎ যাহারা বুদ্ধিযোগে প্রথম অধিকারী হইয়াছে, তাহাদের নিকট মা তুমি সৌম্যা। যাহারা তোমাকে প্রাণ দিয়া সর্ব্বভাবে আত্ম-প্রাণের বিশিষ্ট উদ্বেলনমাত্র দেখিতে পায়, তাহাদের নিকট তুমি সৌম্যতরা। আর যাহারা সর্ব্বতোভাবে তোমাতে মন অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছে—অর্থাৎ সবটা মন তোমাতে মিলাইয়া দিতে সমর্থ, তাহাদের নিকট তুমি “অশেষসৌম্যেভ্যঃ অতিসুন্দরী” অর্থাৎ সৌম্যতমা মূর্ত্তিতে প্রকটিতা। এইরূপে তুমি তিন স্থানে ত্রিবিধরূপে প্রকটিতা হও। বুদ্ধিযোগীর নিকট তুমি সৌম্যা, প্রাণদর্শীদিগের নিকট সৌম্যতরা এবং মন বিলয়কারীদিগের নিকট সৌম্যতমা। মা! যে সকল সৌভাগ্যবান্ সন্তান সম্পূর্ণ মনটী তোমাকে অর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারা সর্ব্বভাবে মাতৃ-ময় হইয়া যায়, তাহাদের স্থূল ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত মাতৃ-ধর্ম্ম মাতৃ-মহিমা প্রত্যক্ষ করিতে থাকে, তাহারা অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র মায়ের সৌম্যতমা মূর্ত্তির প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হয়। মা! তোমার সৌন্দর্য্য যাহার চক্ষে পড়িয়াছে, সে কি আর কখনও জগতের বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়! চন্দ্রে পদ্মে কামিনীর কমনীয় মুখমণ্ডলে যে সৌন্দর্য্য—যে হ্লাদিনী-শক্তির বিকাশ দেখিয়া জীব মুগ্ধ হয়, উহা তোমার সৌন্দর্য্যরাশির কোটিতম অংশও নহে। জগতের যেখানে যত সৌন্দর্য্য আছে, উহা সৌন্দর্য্যসিন্ধু তোমারই ক্ষুদ্রতম বিন্দুমাত্র। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত সৌন্দর্য্যকণা রহিয়াছে, সকল একত্র করিয়া যে সৌন্দর্য্যরাশি কল্পনায় গঠিত হয়, তাহাই তোমার সৌম্যতমা মূর্ত্তির আভাস।

মা! তুমি ‘পরাপরাণাং পরমা’। পর—ব্রহ্মাদি, অপর—দেব মনুষ্যাদি। এই উভয়েরই তুমি আশ্রয়—পূজ্যা; সুতরাং তুমিই পরমা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তুমিই পরমেশ্বরী! যাহারা তোমার পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সৌম্য মূর্ত্তির বিকাশ দর্শনে ধন্য হইয়াছে, যাহাদের বুদ্ধি, প্রাণ ও মন

সম্যক্‌ভাবে মাতৃযুক্ত হইয়াছে তাহারাই দেখিতে পায়—ব্রহ্মা হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত অনন্তকোটী-ব্রহ্মাণ্ড তোমারই সত্তায় সত্তাবান্‌। এই ব্রহ্মাণ্ড-যজ্ঞাগারে পর অপর উচ্চ নীচ যেখানে যাহা আছে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, সকলেই তোমার পূজায় নিরত। তাহাদের নিকটই তুমি এইরূপ পরমেশ্বরীমূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ হও।

এইখানে একটু খুলিয়া বলিতেছি—**স্ব স্ব প্রকৃতিকে** মা বলিয়া বুঝিতে পারিলে, সর্ব্বভাবে মাতৃ-যোগে অভ্যস্ত হইলে, তখন আর ক্ষুদ্র জৈবী প্রকৃতি থাকে না। তখন ঐ প্রকৃতিই জগদ্‌বিধাত্রী দৈবী মহতী প্রকৃতিরূপে উপলব্ধ হয়। তখন আর তাহাকে দীনা মলিনা মা বলিয়া মনে হয় না। সেই অবস্থায় সাধক দেখিতে পায়—এত দিন যাঁহাকে শুধু আমার মা বলিয়া মনে বুঝিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি—তিনিই পরাপরপূজ্যা পরমা পরমেশ্বরী। "আমারই মা সর্ব্ব জগতের মা", সাধকের যখন এই উপলব্ধি হয়, তখন তাঁহাকে "সৌম্যতমা অতি সুন্দরী" না দেখিয়া আর কি মলিনা কাঙ্গালিনী মূর্ত্তিতে দেখিতে পারে?

যখন দেখিতে পাই—ঐ সূর্য্য অনন্ত অনন্ত গ্রহ উপগ্রহ পরিবেষ্টিত হইয়া আমারই মায়ের অঙ্গে প্রতিনিয়ত কিরণ বিকীরণ করিতেছে; যখন দেখিতে পাই—ঐ সমীরণ কুসুম-সৌরভসম্ভার বহন করিয়া আমারই মায়ের তৃপ্তি-সাধন করিতেছে; যখন দেখিতে পাই—জলদবৃন্দ পূতবারিবর্ষণে আমারই মায়ের অঙ্গ স্নিগ্ধ করিতেছে; যখন দেখিতে পাই—উন্নত শৈলরাজি মস্তক উন্নত করিয়া আমারই মাকে দেখিবার জন্য ধীরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; যখন দেখিতে পাই—পুষ্পিত তরুবৃন্দ আমারই মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে; যখন দেখিতে পাই—বিহঙ্গমনিচয় কলকণ্ঠে আমারই মায়ের বন্দনাগীত গান করিতেছে; এইরূপ যখন সর্ব্বভাবে সর্বত্র আমারই মায়ের পূজা সেবা দেখিতে পাই; তখন আমি যে কি হইয়া যাই, তাহা বলিতে পারি না। তখন আর আমি থাকে না, থাকে শুধু মা—মায়ের এই বাসুদেবমূর্ত্তি। এইরূপ অবস্থায় সাধক এক অদ্বিতীয়

ব্রহ্ম মূর্ত্তির সম্বেদনে একান্ত আত্মহারা হইয়া পড়ে; ইহাই মায়ের আমার অতি সুন্দরী সৌম্যতমা পরমেশ্বরী মূর্ত্তি।

যচ্চকিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥৬১॥

অনুবাদ। হে অখিলাত্মিকে জননি! (যখন দেখিতে পাইতেছি) সৎ অসৎ যেখানে যাহা কিছু বস্তু আছে, সবই তুমি এবং যে শক্তি এই সর্ব্বভাবে বিরাজিত, তাহাও তুমি, তখন আর তোমাকে কি স্তব করিব!

ব্যাখ্যা। মা! যাহারা আত্মপ্রকৃতিকে মা বলিয়া সাধনাক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, তাহারা কিরূপে স্তরে স্তরে ভেদজ্ঞানশূন্য অদ্বৈত-তত্ত্বে উপনীত হয়, তাহাই এই ব্রহ্মার স্তোত্রে একে একে দেখাইয়া দিলে মা! তুমি পরমাত্মরূপে দুরধিগম্যা; কিন্তু প্রকৃতিরূপে মনুষ্যমাত্রেরই উপলব্ধিযোগ্যা। প্রকৃতিরূপিণী তোমার সেবা করিলেই, তোমার পরমেশ্বরী মূর্ত্তি প্রকটিত হয়, তখন সৎ বা অসৎ বলিয়া কোন ভেদ থাকে না। সর্ব্বময় জগন্ময় আত্মার বিকাশ-দর্শনে এবং সর্ব্বরূপে যে বহুত্বপ্রতীতি হয়, উহা যে আত্মারই শক্তিমাত্র, এইরূপ দর্শনে জীবের সর্ব্ববিধ সংশয় তিরোহিত হয়।

যখন সকলই আমার প্রকৃতি—আমার মা—আমার আত্মা বা আমি; যখন স্তব্য, স্তোতা ও স্তুতি, সকলই আমি—মা, তখন আর কে কাহার স্তব করিবে! "যদা সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কং পশ্যেৎ" এইরূপ উপলব্ধিতে উপস্থিত হইলে, সেই মুহূর্ত্তে সর্ব্ববিধ ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া যায়। পূজ্যপূজকভেদ থাকে না, এক হইয়া যায়। আমিত্বের মহাপ্রসারে জীবভাবীয় আমিত্ব ডুবিয়া যায়। যাহা "সর্ব্বস্য প্রকৃতি" ছিল, তাহা মহাদেবী হইয়া যায়। চিত্ত-বিক্ষেপ, বাক্য,

নিশ্বাস হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যায়; শুধু একটী ঘন আনন্দময় সত্তা বিদ্যমান থাকে। যাহাতে উপস্থিত হইলে মনে হয়—"আছে" বলিয়া কথাটী এইখানেই বলা যায়। জগতের অস্তিত্ব ইহার নিকট নাই বলিলেই চলে। যাক্ সে অন্য কথা!

যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥৬২

অনুবাদ। যিনি জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা, সেই বিষ্ণু পর্য্যন্ত যখন তোমার প্রভাবে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখন আর কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে ?

ব্যাখ্যা। হে মা! যে প্রাণ হইতে জগৎ জাত, যে প্রাণে এই সমস্ত জগৎ বিধৃত এবং যে প্রাণে সমস্ত জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী সেই প্রাণ বা বিষ্ণুশক্তিই যখন যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন, স্বয়ং বিষ্ণু যখন জগদ্বীজ—অর্থাৎ জন্ম-মরণের মূলীভূত সংস্কার পর্য্যন্ত দূরীভূত করিতে বিমুখ, তখন আর কে তোমার স্তব করিবে? আমি (ব্রহ্মা) প্রাণের অঙ্কে অবস্থিত মন মাত্র, বিষ্ণু বা প্রাণের সহায়তা ব্যতীত তোমার স্তব করিবার সামর্থ আমার কোথায় ?

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ ॥৬৩॥

অনুবাদ। বিষ্ণু, আমি এবং ঈশান আমরা তিনজনেই যখন তোমা হইতে শরীর গ্রহণ করিয়াছি; (আমাদের শক্তি যখন তোমারই শক্তি) সুতরাং তোমার স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে ?

ব্যাখ্যা। মা! তুমিই জ্ঞান, প্রাণ ও মনোরূপে প্রকটিত হইয়া শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা নামে অভিহিত হও। যখন তুমি জীবভাবাপন্ন সংস্কাররূপে আত্মপ্রকাশ কর, তখনই তোমার নাম মন। এইরূপ প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অনুভূত ব্যষ্টি চৈতন্যই প্রাণ, এবং প্রতিজীবে নিয়ত প্রকাশমান বুদ্ধি জ্ঞান নামে অভিহিত। প্রত্যেক জীবে অনুভূয়মান এ ব্যষ্টি মন, প্রাণ ও জ্ঞান একটী সমষ্টি বিরাট্ মন প্রাণ ও জ্ঞানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদমাত্র। প্রতিজীবে যাহা মন, প্রাণ ও জ্ঞান নামে অভিহিত, সমষ্টিতে তাহাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে বর্ণিত। সকলই যখন মহামায়া মা তোমারই বিশিষ্ট বিকাশমাত্র, আমরা যখন তুমি ছাড়া অন্য কিছুই নয়, তখন আর আমাদের তোমাকে স্তব করিবার সামর্থ কোথায়?

এখানে একটু সাধনার রহস্য বলিয়া রাখিতেছি—ঐ বিরাট্ মন প্রাণ ও জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, উঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে, স্বকীয় জীবভাবীয় মন প্রাণ ও জ্ঞানের সন্ধান করিতে হয়। উহাদিগকেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলিয়া পূজা করিতে হয়। যেরূপ পৃথিবীর অন্তর্নিহিত জলপ্রবাহ স্পর্শ করিতে হইলে, নিজ প্রাঙ্গণে কূপ খনন করিলেই অভীষ্ট পূর্ণ হয়, সেইরূপ বিরাটের বা সমষ্টির সন্ধান করিতে হইলে, নিজের অন্তরে অহরহঃ অনুভূয়মান ব্যষ্টি সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। মহামায়ার যে শক্তি-বিন্দুটুকু তোমার ভিতরে প্রকাশ পাইতেছে, যে অংশটুকু তোমার আয়ত্তে আছে, উহাকেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জননী বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। উহারই চরণে তোমার সুখ দুঃখের কথা নিবেদন কর। উনিই মহতী শক্তিরূপে প্রকটিত হইবেন; তোমার সকল অবসাদ দূর করিবেন।

এস্থলে দেখা যাইতেছে—ব্রহ্মা স্তব করিতে করিতে এমন এক ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যেখান হইতে সর্ব্বময় মাতৃ-কর্ত্তৃত্ব দর্শন করিয়া, সর্ব্বভাবে মাতৃ-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, সর্ব্বত্র মাতৃ-শক্তি অনুভব করিয়া, তিনি ক্রমে স্তোত্র হইতে বিরত হইতেছেন। সাধনা

ক্ষেত্রেও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। প্রারম্ভে দ্বৈত-বোধ লইয়া—জীব ও ঈশ্বর এই দ্বিবিধ ভাব অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ক্রমে দ্বৈত প্রতীতির বিলোপ হইয়া আত্মানুভূতিমাত্র বিদ্যমান থাকে। কি সমস্ত জীবনের সাধনায়, কি দৈনন্দিন সন্ধ্যা বন্দনাদি অনুষ্ঠানে এইরূপ উপলব্ধি করিতে হয়। সাধকগণ যতদিন পর্য্যন্ত দৈনন্দিন উপাসনায় এইরূপ অবস্থার আভাসও পায় না, ততদিন বুঝিতে হইবে —সাধনা ঠিক হইতেছে না। প্রতিদিনের সাধনায়ই অন্ততঃ একবার করিয়া সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তির মধ্যে প্রথম তিন প্রকার মুক্তির আস্বাদ লইতে হয়। সে তত্ত্ব পরে বলিবার ইচ্ছা আছে।

সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ ॥৬৪॥
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেতৌ মহাসুরৌ ॥৬৫॥

অনুবাদ। হে দেবি! স্বকীয় অতি উদার প্রভাবের দ্বারা স্বয়ং সংস্তুত হইয়া (নিত্যতৃপ্তা তুমি বিশেষভাবে প্রসন্নতার পরিচয় দিতেছ ; সুতরাং প্রার্থনা করি) এই দুর্দ্দমনীয় অসুরদ্বয়কে মুগ্ধ ও জগৎকর্ত্তা অচ্যুত বিষ্ণুকে প্রবুদ্ধ কর এবং যাহাতে তিনি এই অসুরদ্বয়কে নিহত করেন, সেইরূপ বোধের অনুপ্রেরণা কর।

ব্যাখ্যা। মা! এতদিনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি—তোমার স্তব, তোমার সাধনা তুমিই কর। তোমার অতি উদার প্রভাব, অলৌকিক মহত্ত্বের গাথা, মহতী শক্তির অনির্ব্বচনীয় কাহিনী, স্নেহের অনন্ত নির্ঝর-রহস্য যদি তুমি নিজে বর্ণনা না কর, নিজে নিজেকে প্রকাশিত না কর—নিজে ইচ্ছা করিয়া ধরা না দাও, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে তোমাকে ধরিতে বা বুঝিতে পারে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন" যত শাস্ত্র-জ্ঞান, যত বেদ-অধ্যয়ন, যত কঠোর

তপস্যা হউক না কেন, তুমি ইচ্ছা করিয়া ধরা না দিলে, কাহারও অধিকার নাই যে, তোমাকে জানিতে পারে। আজ আমরা তোমার স্তব করিতে গিয়া, তোমার বিশিষ্ট প্রভাব দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি এবং বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছি, এই যে স্তুতি, এই যে ব্যাখ্যা যাহা এই মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, এইরূপেও তুমিই আবির্ভূত হইয়াছ! তুমিই তোমার স্তব করিলে; এবং তাহারই ফলে নিত্যতৃপ্তা তুমি বিশেষ প্রসন্নতার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছ। সুতরাং প্রার্থনা করি—মা! যদি বিশেষ দয়া-প্রকাশে সন্তানের হৃদয় আলোকিত করিয়া স্বপ্রকাশ-রূপিণী পরমেশ্বরী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া থাক, তবে এই অসুর দুইটীকে (মধু কৈটভকে) মুগ্ধ কর। এই যে বহু হইবার সাধ, এই যে বহুত্ব ক্রীড়া, ইহারা আমাদিগকে বড় উৎপীড়িত করিতেছে, ইহারা একটু স্থির হইয়া তোমার সৌমমূর্ত্তির জগদতীত সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে দেয় না। যাহাতে এই সুরবিরোধী ভাবদ্বয় স্বকীয় ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার একরস আনন্দঘন মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হয়, তাহা কর।

শুধু ইহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। যে প্রাণশক্তির অঙ্কে ইহারা প্রকাশিত, যিনি একমুহূর্ত্তের জন্য কাহারও হৃদয়-বৃন্দাবন হইতে বিচ্যুত হন না, সেই অচ্যুত বিষ্ণু যাহাতে প্রবোধিত হন, তাহাও তোমাকে করিতে হইবে; কারণ, বিষ্ণু যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন বলিয়াই ত এই অসুরের অত্যাচার। প্রাণ ক্ষণিক আত্মমিলনের মোহে জগদ্ব্যাপার উচ্ছেদ করিতে বিমুখ রহিয়াছেন, এই অসুরদ্বয়কে নিধন করিলেই যে চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ হয়, ইহা তিনি বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না; তাই তিনি আজ অসুর নিধনে পরাঙ্মুখ।

আমরা মুখে বলি—আর সংসার চাই না, আর বিষয় চাই না, আর দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধির মধ্য দিয়া প্রকাশ হইতে চাই না; চাই—নিত্য সনাতন মাতৃ-চরণ; কিন্তু প্রাণের দিকে চাহিলেই বুঝিতে পারি, উহা কথার কথা মাত্র। প্রাণ যথার্থ পূর্ণভাবে মাকে চায় না,

যতটুকু চাহিয়াছে, ততটুকু পাইয়াছে। প্রাণ এখনও পূর্ণভাবে জগৎ-খেলা বিদূরিত করিতে চায় না ; তাই যোগ থাকিতেও নিদ্রা। এই নিদ্রা দূর করিতেই হইবে।

যোগিগণ যে সমাধি হইতে বারংবার ব্যুত্থিত হন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, ঐ যোগনিদ্রা—ঐ মধুকৈটভ। তাঁহাদের ইচ্ছা মা ও জগৎ উভয়ই থাকুক। তাঁহারা দুইদিক বজায় রাখিয়া অগ্রসর হইতে চান ; কিন্তু মা! তুমি যে সর্ব্বগ্রাসিনী, সকল একা গ্রাস না করিয়া তোমার তৃপ্তি নাই ; সুতরাং এই অসুর-উৎপীড়ন প্রাণে ফুটাইয়া প্রাণের দ্বারাই অসুর নিধন করাও—সম্যক্‌ভাবে আপনাতে মিলাইয়া লও। ইহাই তোমার মধুকৈটভবধের রহস্য।

এখানে দেখিতে পাই—ব্রহ্মা—মায়ের নিকট তিনটী বর প্রার্থনা করিলেন। একটি মধুকৈটভের মোহ, একটি বিষ্ণুর জাগরণ এবং অন্যটি বিষ্ণুর অসুরবধানুসারিণী বুদ্ধির অনুপ্রেরণা। কার্য্যতঃ এই তিনটি না হইলে, এই দুর্জ্জয় অসুর বিনাশ প্রাপ্ত হয় না ; কারণ, অসুররূপেও মা ; মায়ের এই আসুরী প্রকৃতি যদি স্বেচ্ছায় আত্মনিধন যাচিয়া না লয়, তবে কাহারও সাধ্য নাই যে, উহাদিগকে নিধন করে! দ্বিতীয়তঃ, বিষ্ণু বা প্রাণশক্তি সম্যক্‌ভাবে প্রবুদ্ধ না হইলে, মাতৃ-লাভ হয় না! তৃতীয়তঃ মাতৃ-মিলনের অভিলাষ পূর্ণভাবে উদ্‌বুদ্ধ হইলেই, প্রাণ জগদ্ভাবকে বিমথিত করিতে উদ্যত হয়। ইহাই বিষ্ণুর অসুর-নিধনে বুদ্ধির অনুপ্রেরণা।

ঋষিরুবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা।
বিষ্ণোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তুং মধুকৈটভৌ ॥৬৬॥
নেত্রাস্য-নাসিকাবাহু-হৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ।
নির্গম্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ ॥৬৭॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপ স্তুত হইয়া তামসী দেবী বিষ্ণুর জাগরণ এবং মধুকৈটভের নিধনের জন্য, নেত্র মুখ

নাসিকা হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া, অব্যক্ত-জন্মা ব্রহ্মার দর্শনবিষয়িণী হইলেন।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মার কাতর প্রার্থনায় মহামায়া তামসীমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইলেন। তমোগুণেই সর্ব্বভাবের বিলয় হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মহামায়া দ্বিবিধ প্রকৃতিতে প্রকটিত হয়েন।—মহতী প্রকৃতি ও জীব-ভাবীয় প্রকৃতি। প্রকৃতি—গুণত্রয় বিভাবিনী। জীব-ভাবীয় প্রকৃতি যেরূপ সত্ত্বরজস্তমোময়ী, মহতী প্রকৃতিও সেইরূপ ত্রিগুণাত্মিকা। ভগবদ্গীতায় এই দ্বিবিধ প্রকৃতিই যথাক্রমে পরা ও অপরা নামে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরা প্রকৃতির যে স্থলে সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি, অপরা প্রকৃতির সেইটীই সর্ব্বপ্রথম বিকাশ বা পরিণাম। পরা প্রকৃতি তমোগুণ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণরূপে এবং অপরা প্রকৃতি যথাক্রমে সত্ত্ব রজ ও তমোগুণরূপে অভিব্যক্ত হয়। অপরা প্রকৃতির সর্ব্বশেষে এবং পরা প্রকৃতির সর্ব্বপ্রথমে তমোগুণ। সত্ত্বগুণ উভয় প্রকৃতির সন্ধিস্থল। নিদ্রা তন্দ্রা মোহ আলস্য জড়তা প্রভৃতি অপরা প্রকৃতির তমোগুণের ধর্ম্ম, আর সর্ব্বভাবের বা বহুত্বের বিলয় পরা প্রকৃতির তমোগুণের ধর্ম্ম। এক কথায় মহামায়ার জগৎমুখী বিকাশের নাম অপরা প্রকৃতি এবং পরমাত্মাভিমুখী বিকাশের নাম পরা প্রকৃতি। জীব-প্রকৃতি যখন তমঃ ও রজোগুণের প্রাধান্যকে অভিভূত করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত হয়, তখনই পরা প্রকৃতির রজোগুণের ক্রিয়াশীলতা দ্বারা ঐ সত্ত্বগুণ প্রলয়াভিমুখী হয়, অর্থাৎ পরা প্রকৃতির তমোগুণে বিলীন হয়; সুতরাং এস্থলে মহামায়ার তামসী মূর্ত্তির আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজনীয়। মধু ও কৈটভ সত্ত্বগুণ হইতে সঞ্জাত—সত্ত্বগুণেরই অভিব্যক্তি তমোগুণে বা তামসীমূর্ত্তির অঙ্কে এই বহুভাবেচ্ছা ও তন্মূলক আনন্দরূপ অসুরদ্বয়কে বিলীন করিবার জন্য মধ্যবর্ত্তি-রজোগুণের ক্রিয়াশীলতা বা প্রাণের জাগরণ একান্ত আবশ্যক। ইহাই ব্রহ্মার স্তবে তামসী মূর্ত্তির আবির্ভাব এবং মধুকৈটভ নিধনের জন্য বিষ্ণুর জাগরণ।

এই তামসী প্রকৃতি স্থূলভাবে প্রকাশিত হইলেই, পূর্ব্বকথিত খড়্গ শূল প্রভৃতি দশবিধ প্রহরণধারিণী মহাকালী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন। এই মূর্ত্তি নীলকান্তমণির ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট; ইহার হস্ত পদ ও মুখ প্রত্যেকে দশখানি। ইহারা জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ দশবিধ চিৎশক্তি-প্রবাহের দ্যোতক। একমাত্র চিৎশক্তিই যে দশ ইন্দ্রিয়পথে বহুভাবে বিকাশ পায়, ইহা পরিস্ফুট করিয়া এই বহুভাবকে একত্বে বিলীন করিবার জন্যই এইরূপ তামসী মহাকালী মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। এই মূর্ত্তিতে একত্ব ও বহুত্বের অপূর্ব্ব সমন্বয় প্রকটিত। মুমুক্ষু সাধক এই মূর্ত্তি-দর্শনে ধন্য হইয়া থাকেন।

চিদ্ব্যোম-ক্ষেত্রে যখন কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, তখন সেই মূর্ত্তিটি সাধকের সংস্কারানুযায়ী গঠিত হইয়া থাকে। মায়ের নিজের কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তি নাই। সর্ব্বরূপেই তিনি, অথচ স্বয়ং রূপবিবর্জিত। তথাপি "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা"। সাধকের হিতের জন্যই সত্য-সঙ্কল্প ব্রহ্ম বা মা আপনাতে বিশিষ্ট রূপের কল্পনা করেন। উহাই আমাদের পুরাণাদি-শাস্ত্র-বর্ণিত দেব দেবী। সাধক যেরূপ সংস্কারে, যেরূপ বিশেষণে, যেরূপ গুণে আত্মাকে বিশেষিত করেন, ভক্তিপ্রিয় অরূপ পরমাত্মা সেইরূপ গুণে গুণময় হইয়া সাধকের অভিলাষ পূর্ণ করেন। ইহাই সাধনা-জগতে বিশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শনের রহস্য।

দুই স্থানে এইরূপ বিশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শন হয়! এক মনোময় ক্ষেত্রে, অন্য বিজ্ঞানময় কোষে বা প্রজ্ঞায়। মনে মনে কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তির কল্পনা (প্রতিদিন অভ্যাসের ফলে) ঘন করিয়া তুলিলে প্রায় ঐরূপ মূর্ত্তি-দর্শন হয়। কোন কোন স্থলে ঐরূপ অভ্যাসের সাহায্যে কল্পনা ঘন না করিলেও কদাচিৎ কোন মূর্ত্তির দর্শন হইয়া থাকে। বুঝিতে হইবে—সে সকল পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত ঘন কল্পনার ফল। যাহা হউক, মনোময় ক্ষেত্রে যে সকল মূর্ত্তির দর্শন হয়, উহা ক্ষণিক আনন্দদায়ক ও ভগবৎসত্তার বিশ্বাসবর্দ্ধক; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই; কিন্তু ঐ সকল মূর্ত্তি সাধককে কৃতার্থ করিতে পারে না; কারণ, উহাতে

প্রাণধর্ম্মের বিকাশ নাই, সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বদর্শিতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা, প্রভৃতি মহত্ত্বের স্ফুরণ নাই। উহা মনঃকল্পিত একটি ছায়াবিশেষ মাত্র; সুতরাং সাধককে বরাভয়দানে, অমরত্ব প্রদানে সমর্থ হয় না; কিন্তু প্রজ্ঞাক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট মূর্ত্তির দর্শনলাভ ঘটিলে, সর্ব্ববিধ সংশয় দূর হয়, জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়, সাধক অভীষ্ট বরলাভে ধন্য হয়।

সে যাহা হউক, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—নেত্র আস্য নাসিকা বাহু হৃদয় এবং বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া তামসী দেবী ব্রহ্মার দর্শন-গোচর হইয়াছিলেন। ঐ সকল স্থান প্রাণশক্তির বিশিষ্ট অনুভূতির কেন্দ্র। জগতের বীজ সমূহকে পুনরায় অঙ্কুর-উৎপাদন-শক্তি-হীন না করিয়া পরমাত্মার সহিত যে মিলন-প্রয়াস, সেই অবস্থাকে যোগনিদ্রা বলে। এই অবস্থায় প্রাণের ক্রিয়াশীলতা স্তব্ধ থাকে; সুতরাং চক্ষু মুখ নাসিকা বাহু হৃদয় এবং বক্ষঃস্থল প্রভৃতি বিকাশকেন্দ্র হইতে উপসংহৃত হইয়া প্রাণশক্তি পরমাত্মার অঙ্কে সংলীন হইতে প্রয়াসী হয়। এই অবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হইলে অর্থাৎ যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইলে, ঐ সকল কেন্দ্রে প্রাণশক্তির ক্রিয়াশীলতা পূর্ব্ববৎ পরিলক্ষিত হয়। সাধকমাত্রেই বুঝিতে পারেন—প্রথম প্রথম যখন দেহাত্মবোধ ও বহুভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ পরমাত্মাভিমুখী গতি লাভ হয়, তখন চক্ষু মুখ হৃদয় প্রভৃতি অবয়বের অস্বাভাবিক স্পন্দন বা বিক্ষেপ হইতে থাকে। আবার যোগযুক্ত অবস্থা হইতে বহির্ম্মুখ হইবার উপক্রম হইলেও, এই সকল অবয়বের ঐরূপ বিক্ষেপ আরম্ভ হয়। এতদিন জগন্মূর্ত্তি মায়ের রূপ দেখিয়া নেত্র, গুণ কীর্ত্তন করিয়া আস্য, চরণস্পর্শ করিয়া বাহু, সত্তানুভূতিদ্বারা হৃদয় এবং স্নেহ বহন করিয়া বক্ষঃস্থল পরিতৃপ্ত ছিল। এ সকল অবয়ব এখন আর মায়ের এই পরিচ্ছিন্ন ভাবসমূহে মুগ্ধ থাকিতে চায় না। তাই, মা আমার তামসী মূর্ত্তিতে ইন্দ্রিয়বর্গের আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক, বিশুদ্ধ আত্ম-স্বরূপে সংস্থিত হইবার জন্য প্রাণশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া দিলেন।

মন্ত্রে ব্রহ্মাকে অব্যক্ত জন্মা বলা হইয়াছে। অব্যক্ত বা প্রকৃতি হইতেই মনের জন্ম হয়। মনুষ্যমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন—

চিত্তের বৃত্তিগুলি কোন অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় উহাতেই বিলীন হয়। এই অব্যক্তক্ষেত্রের সন্ধান পাইলেই সাধক পরমাত্মস্বরূপের সন্নিহিত হয়।

উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ।
একার্ণবেঽহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ ॥৬৮॥
মধুকৈটভৌ দুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ।
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ ॥৬৯॥

অনুবাদ। যোগনিদ্রা কর্ত্তৃক বিমুক্ত জনার্দ্দন জগন্নাথ একার্ণবে শেষ শয়ন হইতে উত্থিত হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন—দুরাত্মা অতি বীর্য্যবান্ পরাক্রমশালী ক্রোধরক্তলোচন মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মার স্তবে বিশেষ পরিতুষ্টা মহামায়া মা বিষ্ণুর যোগনিদ্রা-মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিলেন। নিদ্রামুক্ত জগন্নাথ উঠিলেন; কিন্তু জনার্দ্দনরূপে এবার যে অসুর নিধন করিতে হইবে; তাই বিষ্ণুর এই জন-পীড়ক রূপধারণ।

পূর্ব্বে যে মন অতি চঞ্চল ও জগদ্ব্যাপারে সর্ব্বপ্রধান নিয়ন্তা ছিল, আজ সে মনই পরম শান্তভাবে অবস্থান করিবার জন্য, অসুর-নিধনের জন্য মহামায়ার প্রসাদে প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিল। চঞ্চলতা পরিত্যাগ যে কি সুখের, কি আনন্দের, তাহা প্রশান্ত ভাবের একটু আস্বাদ না পাইলে উপলব্ধি হয় না। খুলিয়া বলিতেছি—জগৎময় সত্যপ্রতিষ্ঠার ফলে, প্রত্যেক পদার্থে আত্মসত্তা-দর্শনের ফলে, জগদ্-ব্যাপারের উচ্ছেদ সাধন না করিয়াই প্রাণ মাতৃ-যুক্ত হয়। এদিকে এইরূপ মাতৃ-যুক্ততার ফলে, অতি চঞ্চল মনও চিরাভ্যস্ত চঞ্চলতার হাত হইতে পরিত্রাণলাভে উদ্যত হয়; কিন্তু আদি সংস্কাররূপী অসুরদ্বয় তাহাকে পুনরায় বহুভাবে তরঙ্গায়িত হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে

থাকে। ইহাই মধুকৈটভের ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যম। এতদিন জগদ্ধর্ত্তা প্রাণ জগৎকে একার্ণবীকৃত করিয়া—জগৎসংস্কারসমূহকে শয্যারূপে পরিকল্পিত করিয়া, মাতৃ-যুক্তভাবে অবস্থান করিতেছিল; জগন্মূর্ত্তি মাতৃ-স্বরূপে পরিতৃপ্ত প্রাণও ভাবাতীত মাতৃ-সত্তায় পূর্ণভাবে মিলন-বিষয়ে উদাসীন ছিল; কিন্তু এতদিনে সে মোহের অবসান হইয়াছে। যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া মা তাহাকে জনার্দ্দনরূপে—অসুর-পীড়করূপে প্রবুদ্ধ করিলেন; তাই, আজ প্রাণ আদি-সংকল্পের বিলয় করিতে উদ্যত।

এইরূপই হয়। যতদিন মা আমার দয়া করিয়া জীবের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া না দেন, যতদিন নিদ্রারূপিণী মা প্রবোধরূপে প্রকাশিত না হন, ততদিনই জীব জগতের ধূলি গায় মাখিয়া, অতি চঞ্চল নশ্বর সুখে মুগ্ধ থাকিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। তারপর গীতাতত্ত্ব উন্মেষিত হইলে, বুদ্ধিযোগরূপ জগৎময় সত্যদর্শনের ফলে বিশিষ্টভাবে মাতৃ-লাভে ধন্য হয়। এই অবস্থায় জীব এই গুণময়ী ভাবময়ী মায়ের দর্শনকেই জীবনের চরম চরিতার্থতা মনে করিয়া, আত্মতৃপ্তির সঙ্কীর্ণ মোহে আচ্ছন্ন থাকে। তারপর ধীরে ধীরে চণ্ডীতত্ত্বের উন্মেষ হয়। একে একে অসুরকুলের আবির্ভাব হইতে থাকে—বহুত্বের সংস্কারসমূহ সাধককে চঞ্চল করিয়া তোলে। সেই চঞ্চলতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভাবরূপ গুণরূপ অসুর-নিবহকে নিধন করিয়া, ভাবাতীত গুণাতীত সত্তায় প্রবেশ করিবার জন্য সাধক প্রাণপণ উদ্যম করে। এই উদ্যম বাহিরে দেখিবার নহে, ইহা বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা। সেখানে কি ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা যাঁহারা বিজ্ঞানময় কোষে আত্মবোধ উপসংহৃত করিয়াছেন, মাত্র তাঁহারাই দর্শন বা অনুভব করিতে পারেন। অকপট কাতর প্রার্থনা এবং সম্যক আত্মসমর্পণই সে ক্ষেত্রের সাধনা বা উদ্যম। কত বিফলতা, কত হতাশ আসিয়া সাধককে অবসন্ন করিয়া দিতে প্রয়াস পায় কিন্তু একমাত্র নির্ভরতা ও আত্মসমর্পণের ফলে সকল প্রতিকূলতা অপূর্ব্ব উপায়ে দূরীভূত হইয়া যায়!

সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ ॥৭০॥

অনুবাদ। অনন্তর সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত, বাহুপ্রহরণ, বিভু, সর্ব্বসংহারক হরি নিদ্রা হইতে উঠিয়া, পঞ্চবর্ষসহস্র সেই অসুরদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা। যোগনিদ্রা-বিমুক্ত প্রাণ, আপনাকে ভগবান্, বিভু এবং হরি এই ত্রিবিধ উপলব্ধিতে মহাশক্তিমান্ বলিয়া বোধ করেন। ভগবান্ শব্দের অর্থ—সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত। বিভু শব্দের অর্থ—ব্যাপক, অসীম-শক্তিসম্পন্ন। হরি শব্দের অর্থ—সর্ব্ব-সংহারক। এই ত্রিবিধ অনুভূতি প্রাণে না ফুটিলে, অসুর-নিধনের যোগ্যতালাভ হয় না।

অবসাদ দূর করাই প্রথম সাধনা। "আমি কি এই অনাদিকাল সঞ্চিত অজ্ঞানকে দূর করিতে পারিব ?" এইরূপ ভাব প্রাণের অবসাদ-সূচক ; সুতরাং একপক্ষে ইহা নিদ্রা-স্থানীয়। মায়ের চরণ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিলে, যথার্থভাবে মায়ের কৃপা প্রার্থনা করিলে, প্রাণে মা এমন বল সঞ্চারিত করেন যে, সাধক যথার্থই অনুভব করিতে পারে —আমিই ভগবান্, আমিই বিভু, আমিই সর্ব্বসংহারক হরি ; সুতরাং নিশ্চয়ই আমি অসুরকুল নির্ম্মূল করিতে সমর্থ। ইহাই পরম পুরুষকার।

বাহুপ্রহরণ শব্দে গ্রহণ বা আদানশক্তি বুঝা যায়। বাহু বা গ্রহণেন্দ্রিয় যাহার প্রহরণ অর্থাৎ অস্ত্রবিশেষ তিনিই বাহুপ্রহরণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রাণশক্তি আদি সংস্কারের ফলোন্মুখতা নিরাকৃত করিবার জন্য—আপনাতে মিলাইয়া লইবার জন্য, আদান-শক্তির প্রয়োগ করেন। ইহাই মধুকৈটভের সহিত বিষ্ণুর বাহুযুদ্ধ। এই যুদ্ধ পঞ্চ-বর্ষসহস্র-ব্যাপী হইয়াছিল। 'পঞ্চবর্ষ-সহস্রাণি' ইহার আধিভৌতিক অর্থ—পাঁচ হাজার বৎসর ব্যাপিয়া ; কিন্তু আধ্যাত্মিক দর্শনে ইহার অন্যরূপ অর্থপ্রতীতি হয়। পঞ্চ শব্দের অর্থ—রূপ রসাদি বিষয়পঞ্চক। বর্ষ শব্দের অর্থ—স্থান এবং সহস্র শব্দটী অসংখ্যের

বোধক ; সুতরাং 'পঞ্চ-বর্ষসহস্রাণি' শব্দের অর্থ—অসংখ্য ভেদবিশিষ্ট বিষয়পঞ্চকের অনুভূতিস্থানকে লক্ষ্য করিয়া।

মনের যে কেন্দ্র হইতে পঞ্চবিধ বিষয়ানুভূতি ফুটিয়া উঠে, সেই স্থানের নাম পঞ্চবর্ষ। ঐ পঞ্চবিধ অনুভূতিই আবার অসংখ্য নাম রূপাদি ভেদবিশিষ্ট হয়। তাই, সহস্রাণি পদটিতে বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে। যে স্থান হইতে এই অসংখ্য ভেদবিশিষ্ট পঞ্চবিধ বিষয়ের অনুভূতি ফুটিয়া উঠে, সেই কেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া আদান বা গ্রহণ-শক্তির প্রয়োগ করিতে হয়।

খুলিয়া বলি—'আমি বহু হইব' এই সংস্কারের মূলে ছুইটী ভাব আছে। একটী আনন্দ এবং অপরটী বহুত্বের ইচ্ছা। উহারাই মধুকৈটভ। উহাদিগকে নাশ করিতে হইলে, বহু ভাবের কেন্দ্রস্থানকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ আদানশক্তির প্রভাবে আত্মোপসংহরণ করিতে হয়। যতদিন অনুভূতিসমূহ আত্মরতি ও আত্মতৃপ্ত না হয়, ততদিন এই বাহু-প্রহরণ-প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক। অনুভূতিগুলি বিষয়াভিমুখে ধাবিত হয়, আর প্রাণ যেন পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে ছুই হাতে ধরিয়া আপনাতে মিলাইয়া লইতে থাকেন। ইহাই আদানশক্তি বা বাহুপ্রহরণ-প্রয়োগের রহস্য। অনুভূতি-কেন্দ্র বহুজন্মাবধি পঞ্চবিধ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে অভ্যস্ত। ঐ তরঙ্গগুলি আবার বিভিন্ন নামরূপ ও ব্যবহারের অসংখ্য ভেদবিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হয় ; সুতরাং মধুকৈটভের নাশ করিতে হইলে, ঐ অনুভূতি-কেন্দ্র বা পঞ্চবর্ষসহস্রকে লক্ষ্য করিয়া আদানশক্তির প্রয়োগ করিতে হয়, অর্থাৎ বাহুপ্রহরণ ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে মধুকৈটভের নিধন নিষ্পন্ন হইতে পারে না। তাই, এস্থলে অসুরদ্বয়ের সহিত বিষ্ণুর বাহুযুদ্ধের কথাই উক্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ পঞ্চবর্ষসহস্র শব্দটীর দীর্ঘকালরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। সে মতের তাৎপর্য্য এই যে, জীবত্বের মৌলিক উপাদান-স্বরূপ ঐ ছুইটি প্রবল সংস্কার ঈশ্বরভাবীয় অবস্থাবিশেষ ; সুতরাং জীবভাবীয় শক্তি-প্রয়োগে উহার বিনাশসাধন করিতে হইলে, দীর্ঘকালব্যাপী অভ্যাস ও

বৈরাগ্যরূপ উভয় হস্তের শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে, দীর্ঘকালব্যাপী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিরন্তর অভ্যাস এবং বিষয়-বৈরাগ্য ব্যতীত জীবত্বের গ্রন্থি কিছুতেই সমূলে ছিন্ন হয় না।

তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়া-বিমোহিতৌ।
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্ ॥৭১॥

অনুবাদ। তাহারা উভয়ে অতি বলোন্মত্ত; কিন্তু মহামায়া-স্বরূপে মুগ্ধ হইয়া তাহারা কেশবকে বলিল—"তুমি আমাদের নিকট হইতে বর গ্রহণ কর।"

ব্যাখ্যা। মধুকৈটভ অতি বলোন্মত্ত অসুর; কারণ, "সোঽকাময় বহু স্যাং প্রজায়েয়" এই যে বহুভাবের ইচ্ছা—সংস্কার, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ক্ষেত্র বা ব্রহ্ম হইতে সঞ্জাত; সুতরাং অতি প্রবল। আর বহুভাবে প্রকাশিত আমি এক হইব" এই ইচ্ছাটি জীবভাবীয় সংস্কার হইতে সঞ্জাত; সুতরাং দুর্ব্বল কর্ত্তৃক প্রবলের উচ্ছেদ অসম্ভব; তাই মহামায়া মা স্বয়ং আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিয়া ঐ অসুরদ্বয়কে বিমোহিত করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণ যেখানে মাতৃ-স্নেহে মুগ্ধ, মন সেখানে মায়ের মহতী শক্তিতে মুগ্ধ; এই উভয়ই যখন আর বহুভাব চায় না, মহামায়া মায়ের অনন্ত উদার নিত্য শান্তিময় সর্ব্ব-ভাববিরহিত নিরঞ্জন সত্তায় মিলাইয়া যাওয়াই যখন উভয়ের উদ্দেশ্য, একান্ত অভিলাষ, তখন উহাদের কাতর প্রার্থনায় বাধ্য হইয়া, মহামায়া মা মধুকৈটভকে আত্ম-স্বরূপে মুগ্ধ করিলেন। তাহারা সেই নীলাশ্মদ্যুতি তামসী-মূর্ত্তির মনোহর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। ঐ স্বরূপে সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

ঠিক এইরূপই হয়। ওরে, মায়ের আমার এমনই রূপমাধুরী! যে একবার দেখিয়াছে, সে আর ভুলিতে পারিবে না। সেই স্নিগ্ধ-শ্যামা, সেই কোটি-চন্দ্র-সূর্য্য-ম্লানকারিণী সুধাময়ী মাধুরী, সেই অভিনব

চিদ্‌ঘন চারুতা, তাহা একবার দেখিলে আর জগৎ ভাল লাগে না, আর বহুত্ব ভাল লাগে না। সর্ব্বদাই তাহাতে মিলাইয়া যাইতে বাসনা হয়। সেই যে আমার যথার্থ স্বরূপ, সেই যে আমি গো, এখানে যে "আমি আমি" করি, এ ত যথার্থ আমি নয়! এ যে কাঙ্গাল আমি, হস্তপদ-শৃঙ্খলাবদ্ধ জীব আমি। সে আমি স্বাধীন সরল বিভু নিরঞ্জন আনন্দঘন আরও কত কি বলিব! একবার সেই আমিকে দেখিলে, আর কেহ এই আমিতে থাকিতে চায় কি? তাই বহুত্বের সংস্কাররূপী অসুরদ্বয় আজ মাতৃ-সত্তায় বিমুগ্ধ হইয়া, নিজেরাই নিজেদের বিনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছে; মরিয়া অমর হইতে ছুটিয়াছে। তাই, কেশবকে বলিল—"আমাদের নিকট হইতে বর গ্রহণ কর।"

প্রাণ এখানে কেশব-মূর্ত্তিতে বিরাজিত অর্থাৎ সর্ব্বভাবের বীজকে সংহরণ পূর্ব্বক স্বকীয় বিশিষ্ট ভাবটী পর্য্যন্ত বিলয় করিয়া, মহাকারণে সম্মিলিত হইতে উদ্যত। ইহাই কেশব-মূর্ত্তির স্বরূপ; 'ক' শব্দের অর্থ জল। কারণ সলিলে যিনি শববৎ অবস্থান করেন, তিনিই কেশব। সে যাহা হউক, প্রাণের প্রলয়কালীন শক্তির আভাস পাইয়া মহামায়া-বিমোহিত অর্থাৎ মাতৃ-স্বরূপে মুগ্ধ অসুরদ্বয় প্রাণকে বলিল—তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব, আর আমরা তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইব না। এতদিন বুঝি নাই, তুমিই আমাদের মহামঙ্গলের একমাত্র হেতু; তাই, বহুভাবে বিকাশ ও তজ্জনিত আনন্দে মুগ্ধ ছিলাম; কিন্তু এখন তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি—তুমি আমাদিগকে মাতৃ-অঙ্গের ভূষণ করিয়া দিবে, তাহারই চেষ্টা করিতেছ! সুতরাং তুমি যাহা চাও, তাহাই দিব।

সংস্কাররাশিও জ্ঞান। জ্ঞান জন্য-পদার্থ নহে; সুতরাং জ্ঞানের ধ্বংস অসম্ভব। তাই সংস্কারগুলিও দগ্ধ-বীজবৎ ব্রহ্মেই অবস্থিত থাকে। উহাই মাতৃ-কণ্ঠে মুণ্ডমালা। কোনরূপ ভাব উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া উহারা মৃত। এ সকল রহস্য দ্বিতীয় তৃতীয় চরিত্রে বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইবে।

শ্রীভগবানুবাচ।

ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি।
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম ॥৭২॥

অনুবাদ। ভগবান্ কহিলেন—যদি তোমরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তবে উভয়েই আমার বধ্য হও। এস্থলে অন্য বরে আর কি প্রয়োজন? ইহাই আমার প্রার্থিত বিষয়।

ব্যাখ্যা। কিছুদিন অনুভূতি-কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া, আদান-শক্তি প্রয়োগ বা মাতৃ-স্বরূপ দর্শনে অভ্যস্ত হইলে অর্থাৎ প্রত্যেক অনুভূতিই মা, এইরূপ বোধ যখন সংশয় ও বিপর্য্যয়-প্রতীতি-শূন্য হয়, তখনই মধুকৈটভ বধ্য হয়। সাধক! তুমিও দেখ—তোমার পঞ্চবর্ষ (অনুভূতি-কেন্দ্র) প্রতিনিয়ত সহস্র সহস্র ভেদ-বিশিষ্ট হইয়া উপস্থিত হইতেছে। তোমার বাহুই প্রহরণ। তুমিও দুই হাতে সেই ভাবরাশিকে গ্রহণ করিয়া বল—এস মা আমার, এস আত্মা আমার, এস আমি আমার, এস সর্ব্বস্ব-আমার! রূপ হইয়া আসিয়াছ, এস মা! রস হইয়া আসিয়াছ, এস মা! শব্দ হইয়া আসিয়াছ, এস মা! এইরূপে সর্ব্বভাব আত্মাতে এবং আত্মাকে সর্ব্বভাবে দর্শন কর, দেখিবে—অজেয় অসুর স্বেচ্ছায় আপনার মৃত্যু যাচিয়া লইবে।

কিরূপে ইহা হয়? যখন তুমি দেখিতে পাইবে—দৃঢ় অধ্যবসায়-বলে সংস্কাররাশিকে মাতৃ-ময় করিয়া তুলিয়াছ, তোমার অনুভূতি-কেন্দ্রে সত্যরূপ অগ্নি জ্বালিয়াছ, পতঙ্গবৎ সংস্কাররাশি আসিয়া সেই অগ্নিতে পড়িয়া সত্যময় হইয়া উঠিয়াছে, সবই মা হইয়াছে, তখন তুমি আদরের সন্তান মাকে বলিতে পার—'আর কেন মা, এই বহুভাবে ফুটিতেছ? এইবার তোমার বহুভাব সংহরণ কর।' তখন সন্তান-বৎসলা মা বহুরূপ সংহরণ করিয়া লইবেন। মা নিজে যদি সন্তানস্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আসুরী মূর্ত্তির সংহরণ না করেন, তবে আর কাহারও সাধ্য নাই যে, উহার অঙ্গ স্পর্শ করে। যতই যোগ, যতই

বৃত্তিনিরোধ, যতই দৃঢ় অধ্যবসায়সহকারে চিত্তবিক্ষেপ দূর করিতে চেষ্টা কর না কেন, তোমার সকল চেষ্টাই বৃথা হইতে পারে—যদি প্রকৃতিরূপিণী মা স্বকীয় আসুরীভাব (পুনঃ পুনঃ পরিণামরূপ বহুত্ব) স্বকীয় অঙ্গে বিলীন করিয়া না লয়েন। ইহাই যথার্থ তত্ত্ব।

সে যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি—ভগবান্ বিষ্ণু অসুরদ্বয়ের বধ্যত্ব প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—'কিমন্যেন বরেণাত্র।' আর অন্য বরে কি প্রয়োজন? আর কিছুই চাই না। আমি সিদ্ধি শক্তির দ্বারা মণ্ডিত হইয়া জগতে শক্তিমান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠা রাখিতে চাই না, অথবা প্রেম ভক্তি জ্ঞান সৎকর্ম্ম প্রভৃতি সর্ব্বোত্তম ভূষণে ভূষিত হইয়া মহিমময় মহাপুরুষ সাজিতে চাই না, গায়ের মলিন পোষাকগুলি খুলিয়া আমাকে মহামূল্য রত্নভূষণে সাজাইব, ইহাও আমার বাসনা নহে। আমি চাই—আমাকে সর্ব্বতোভাবে তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া দিব। তোমার চরণে আত্মবলি দিয়া, অনন্ত জীবনব্যাপী অকৃতজ্ঞতার একবিন্দু প্রায়শ্চিত্ত করিতে চেষ্টা করিব। এইরূপ নিষ্কামতা বা যথার্থ মুমুক্ষুভাব প্রাণে বিকাশ পাইলেই, অসুরের নিকট প্রার্থনা করা যায়—"তোমরা আমার বধ্য হও!" সংস্কাররূপী অসুর মাতৃ-মূর্ত্তিতে চিরতরে মিলাইয়া যাউক, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা!

ঋষিরুবাচ।

বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ।
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতো ভগবান্ কমলেক্ষণঃ॥
আবাং জহি ন যত্রোর্ব্বী সলিলেন পরিপ্লুতা॥৭৩॥

অনুবাদ। ঋষি বলিলেন—সেই অসুরদ্বয় আপনাদিগকে বঞ্চিত মনে করিয়া এবং সমগ্র জগৎ রসময় দর্শন করিয়া, কমললোচন ভগবান্ বিষ্ণুকে বলিল—পৃথিবী যেখানে সলিল-পরিপ্লুতা নহে, সেই স্থানে আমাদিগকে বধ কর।

ব্যাখ্যা। মধুকৈটভ আজ মহামায়ার স্বরূপে মুগ্ধ; তাই তাহারা এতদিন পরে বুঝিতে পারিল—আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। বহুভাবের খেলা খেলিয়া, ভূমা সুখ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। ঠিক এইরূপ জীবও যতদিন মহামায়ার মায়ায় সম্পূর্ণ বিমুগ্ধ না হয়, ততদিনই জগদ্‌ভাবে—বহুভাবে—মুগ্ধ থাকে, জগৎকেই আনন্দের স্থান বলিয়া মনে করে। যতদিন জীব অতি অল্পকালস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সুখেই চরিতার্থ হয়, ততদিন আপনাদিগকে বঞ্চিত বলিয়া মনেও করিতে পারে না; কিন্তু মহামায়া মা যেদিন আত্মস্বরূপ খুলিয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে ধরেন, সেইদিনই বুঝিতে পারে—"হায়! এতদিন জগতে যথার্থ সুখ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি।"

"আপোময়ং জগৎ"—দেবীসূক্ত-ব্যাখ্যা-অবসরে আচার্য্য সায়নদেব অপ্‌শব্দের অর্থ করিয়াছেন—ব্যাপনশীলা ধী-বৃত্তি। এই স্থানে অর্থাৎ এই বুদ্ধিতত্ত্বেই পরমাত্মা বিশেষভাবে অনুভূতিযোগ্য। সাধক দেহাদি হইতে আত্মবোধ অপসৃত করিয়া ধী-ক্ষেত্রে আরোহণ করেন, আর পরমাত্মা জীবের প্রতি স্নেহপরবশতাহেতু যেন বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এই স্থানেই জীব ও পরমাত্মার মিলন সংঘটিত হয়। ইহাই জীবন্মুক্তের আনন্দ-নিকেতন। ইহাই বৈষ্ণবের ভাষায় বৃন্দাবন—এই খানেই রাসলীলা। রসস্বরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়শক্তিরূপিণী গোপীগণ-পরিবেষ্টিতা আরাধিকা জীবপ্রকৃতির সহিত এইস্থানেই রমণ করেন। এ আনন্দ ভাষায় বর্ণনার যোগ্য নহে। "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ" আত্মারাম হইয়াও কিরূপে তিনি আমাদের সহিত রমণ করেন, তাহা এই বৃন্দাবনে না আসিলে কিরূপে বুঝিবে? গোপী বা ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ যখন আত্মার মহাকর্ষণে বিষয়রূপ কুল পরিত্যাগ করিয়া, তীব্র বেগে বংশীধ্বনির অনুসরণে কৃষ্ণান্বেষণে পরিধাবিত হয়, রাধিকা—"জীব আমি" যখন সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণপ্রেমে—পরমাত্মমোহে মুগ্ধ হইয়া, এই বুদ্ধিময় ক্ষেত্র-রূপ বৃন্দাবনে উপনীত হয়, তখনই আত্ম-মিলনের মহা-সন্ধিক্ষণ। শৈবের ভাষায় এই ধী-ক্ষেত্রই কৈলাস। এইখানেই বিজ্ঞানময় শিব

পার্ব্বতীরূপিণী পরাপ্রকৃতির সহিত আনন্দে বিহার করেন। এইস্থানে আসিলেই "সর্ব্বমাপোময়ং জগৎ" সমস্ত জগৎ ব্যাপনশীল-ধীময়—বোধময় দৃষ্ট হয়। এখানে সকলই আছে; কিন্তু মাত্র বোধ দ্বারা গঠিত অর্থাৎ চিন্ময়। জড়ভাব এখানে সম্পূর্ণ তিরোহিত। পক্ষান্তরে, অপ্ শব্দের অর্থ রস। পরমাত্মাই একমাত্র রসস্বরূপ। আনন্দময় আত্মদর্শন হইলেই জগৎ আপোময় বা রসময় প্রতীত হয়। মধুকৈটভ এতদিন পরে আনন্দময়ী মহামায়াস্বরূপে মুগ্ধ হইয়াছে; সুতরাং সমগ্র জগৎ আপোময় দেখিতেছে।

যে বিষ্ণু তাহাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত, সেও এখন তাহাদের দৃষ্টিতে "ভগবান্ কমলেক্ষণ"—অতি প্রিয়দর্শন হইয়াছে। যেহেতু এখন তাহারা প্রাণকেই প্রকৃত বন্ধু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। প্রাণ যে তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়া, রসের সমুদ্রে ডুবাইতে যাইতেছে, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। তাহারা রস-সমুদ্রের তরঙ্গমাত্র; তরঙ্গরূপে আর বিকশিত হইতে হইবে না, একেবারে সমুদ্র হইয়া যাইবে। প্রাণই এই মহামিলনের একমাত্র উপায়; সুতরাং প্রাণই পরম প্রিয়; তাই, সে এখানে কমলেক্ষণ—স্নেহ-দৃষ্টি-সম্পন্ন।

মধুকৈটভ বিষ্ণুর নিকট যাহা প্রার্থনা করিল, তাহা আরও বিস্ময়কর। যেখানে 'উর্ব্বী সলিল দ্বারা পরিপ্লুত নহে, সেইখানে আমাদিগকে বধ কর।' কি সুন্দর প্রার্থনা! তাহারা জগৎকে বোধময় বা রসময় দর্শন করিতেছে। রস বা আনন্দসমুদ্রের কতকগুলি তরঙ্গই উর্ব্বী বা পৃথিবীরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যেখানে এই সলিল-পরিপ্লুতা পৃথিবী নাই, যেখানে নিরবচ্ছিন্ন সলিল অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন রস নিরবছিন্দ আনন্দ সেইখানে আমাদিগকে নিধন কর—ডুবাইয়া দাও। আর এই বিশিষ্ট আনন্দ এবং এই কীটের ন্যায় বহুভাবে বিকাশ চাহি না। যেখান হইতে আসিয়াছি, সেইখানে লইয়া চল।

শুন—বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপনীত হইলে, জগৎসত্তা বিলুপ্তপ্রায় হয়। এখানে জগৎ বোধময়রূপে প্রকাশ পায়। ঐ বোধটী আনন্দস্বরূপ।

তাই, মন্ত্রে "আপোময়ং জগৎ" বলা হইয়াছে। যেখানে বোধময় জগদ্‌ভাবও নাই, যেখানে নিরবচ্ছিন্ন বোধ বা আনন্দ সেইখানেই বিষয়সংস্পর্শজন্য আনন্দ ও বহুত্বের অবসান হয়। বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্বের উদয়ে দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষিভাবটির উপলব্ধি হয়। জগৎটা যেন ছায়ার মত বুদ্ধিসত্তায় ভাসিতে থাকে। সুখ দুঃখ হাসি কান্না প্রভৃতি বিরুদ্ধভাবগুলি আর সাধককে চঞ্চল করিতে পারে না "আমি এই সর্ব্বভাবের দ্রষ্টা-মাত্র" এইরূপ বোধ ফুটিয়া উঠে। এই অবস্থায় আত্মবোধময় উদাসীন ক্ষেত্রে জগৎসত্তা ক্ষীণভাবে থাকে ; ইহাই "আপোময়ং জগৎ"। যেখানে জগতের ঐ ক্ষীণ সত্তাটুকুও নাই, সেই বিশুদ্ধবোধমাত্রস্বরূপেই সর্ব্বভাবের অবসান হয়। মধুকৈটভ সেইখানে যাইতে চায়। ধন্য তাহাদের প্রার্থনা।

ঋষিরুবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতা শঙ্খচক্র-গদাভৃতা।
কৃত্বা চক্রেণ বৈ চ্ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥৭৪॥

অনুবাদ। ঋষি কহিলেন—শঙ্খ চক্র গদাধারী ভগবান্ "তাহাই হউক" বলিয়া মধুকৈটভের মস্তকদ্বয় স্বকীয় জঘনদেশে স্থাপনপূর্ব্বক চক্রদ্বারা ছেদন করিলেন।

ব্যাখ্যা। শঙ্খ—ইহা নাদশক্তির প্রতিভূ। যে প্রণবধ্বনি অনন্ত-জগৎ-পরিব্যাপ্ত, অনাহত-চক্র হইতে সাধক যে ধ্বনি শুনিতে পায়, যাহার বিভিন্ন তরঙ্গসমূহ জগতে শব্দ-আকারে পরিচিত, শঙ্খ তাহারই প্রতিনিধি। গীতায় দেখিতে পাই—সারথিরূপী ভগবানের হস্তে শঙ্খ সুশোভিত ; আর এখানেও মধুকৈটভারি ভগবানের হস্তে নাদ-শক্তির প্রতিভূস্বরূপ শঙ্খ বিদ্যমান। নাদতত্ত্ব পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

চক্র শব্দের অর্থ জগৎ। অন্ন হইতে প্রাণী, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, বেদ হইতে কর্ম্ম এবং অক্ষর

পুরুষ হইতে বেদ সম্ভূত। অনুলোম ও বিলোমভাবে এই চক্রবৎ গতির নাম সংসার। ইহাই বিষ্ণুর হস্তস্থিত চক্র। ইহাই সুদর্শন নামে অভিহিত। ব্রহ্ম হইতে প্রবর্ত্তিত এই জগৎ-চক্রকে যাঁহারা নিয়ত ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত দেখেন, তাঁহাদের চক্ষে এই চক্র অতি সুন্দর দর্শন।

গদা—লয় বা সংহার-শক্তির প্রতিভূ। যে শক্তিপ্রভাবে এই জগৎ-চক্রের প্রলয় হয়, তাহাই গদা নামে অভিহিত। গদ্ ধাতুর অর্থ —ব্যক্ত শব্দ। শঙ্খ বা প্রণবনাদে জগতের উৎপত্তি; উহা অব্যক্ত ধ্বনি। আর গদা বা ব্যক্ত নাদে ব্যোম্ (বি + ওম্) শব্দে জগতের প্রলয়; সুতরাং শঙ্খ-চক্র-গদাধারী বলিলে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা বুঝা যায়।

মধুকৈটভ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিহত হইতে অভিলাষী। প্রাণশক্তি মহামায়ার শক্তিতে শক্তিমান্—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সামর্থ্য উদ্ভাসিত। এই অবস্থায় বিষ্ণু মধুকৈটভের মস্তক স্বকীয় জঘনদেশে স্থাপনপূর্ব্বক ছেদন করিলেন। "মহীতলং তজ্জঘনে" বিষ্ণুর জঘনদেশ মহীতল। মহী বা ক্ষিতিতত্ত্ব জড়ের সর্ব্বশেষ পরিণতি। জড় হইতে চৈতন্যকে বিচ্ছিন্ন করিতে হইলে, স্থূলতম ক্ষিতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এক কথায়, পার্থিব দেহ ব্যতীত জড় চৈতন্যের ভেদ উপলব্ধিযোগ্য হয় না; সুতরাং মানব-দেহই সাধনার ক্ষেত্র। ইহা হইতেই ভোগ এবং অপবর্গের লাভ হয়। ইহাই বিষ্ণুর জঘনদেশ নামে অভিবর্ণিত হইয়াছে।

মস্তকচ্ছেদন কথাটির মধ্যে একটু রহস্য আছে। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ কণ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত। যদিও ত্বক্ সর্ব্বশরীরব্যাপী তথাপি ত্বকের ধর্ম্ম—স্পর্শ, প্রধানভাবে অধর-ওষ্ঠেই পরিব্যক্ত। কণ্ঠের উপরিভাগ জ্ঞান বা চিৎক্ষেত্র এবং নিম্নভাগ জড়ক্ষেত্র। এই চিৎ-জড়-মিলনের নাম জীব। ইহার বিচ্ছেদ করাই জীবত্বরূপ-বন্ধন বিমুক্তি। যে জড়ের সংমিশ্রণে চৈতন্য তাঁহার স্বকীয় শুদ্ধ ভাবকে তিরস্কৃত করিয়া, পরিচ্ছিন্ন জীবভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছেন; সেই জীব-ভাব হইতে চৈতন্যকে মুক্ত করাই সর্ব্ববিধ সাধনার উদ্দেশ্য। এই

উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়াই অস্মদ্দেশে দেবতাপূজায় উৎসর্গীকৃত ছাগাদি পশুর কণ্ঠদেশ ছেদন করা হয়।

যাহা হউক, এইরূপ যোগনিদ্রা-বিমুক্ত বিষ্ণু মধুকৈটভের শিরশ্ছেদন করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে মৌলিক সংস্কারবশে জীব অনন্তকালব্যাপী জন্ম-মৃত্যুর খরস্রোতে ছুটিয়া চলিতেছে, সেই আদি-সংস্কার—সেই বহুত্ব মূলক আনন্দ ও বহুভাবেচ্ছা এতদিনে প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তি কর্তৃক স্থূল বা পার্থিব দেহকে আশ্রয় করিয়াই বহুত্ব হইতে বিমুক্ত হইল। ইহাকেই জীবের ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ বলে। মন যে অজ্ঞানগ্রন্থিবশতঃ প্রতিনিয়ত বহুত্বের সঙ্কল্প করে এবং তাহাতেই আনন্দ পায়, সেই গ্রন্থির উচ্ছেদ হওয়ার নাম ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ। ব্রহ্মা বা মন যে গ্রন্থিতে আবদ্ধ, সেই বহুভাবমূলক মৌলিক সংস্কাররূপ প্রথম গ্রন্থির উচ্ছেদ এই মধুকৈটভবধ-প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ হইলে, সাধক বেশ বুঝিতে পারে—এই জগৎ, এই স্ত্রী পুত্রাদি, এই দেহ সকলই কল্পনামাত্র! মায়ের বিরাট্ মনের কল্পনাই যে বিশ্বরূপে প্রতিভাত, তখন ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। আর ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষাও দূরীভূত হইয়া যায়। বিষ্ণু ও রুদ্র-গ্রন্থি-ভেদ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরিত্রে ব্যাখ্যাত হইবে। পরমাত্মদর্শনেই এই গ্রন্থিত্রয়ের ভেদ হয়। এক কথায়, ইহাই আগামী, সঞ্চিত এবং প্রারব্ধ এই ত্রিবিধ কর্ম্মফল-ধ্বংস নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কর্ম্মফল-ধ্বংস বিষয়ে ভগবান্ বলিয়াছেন—'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।' যেরূপ প্রজ্জ্বলিত বহ্নি ইন্ধনসমূহকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্ম ভস্মসাৎ করিয়া থাকে। আচার্য্য শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, এস্থলে সর্ব্ব শব্দটির অর্থ সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি বলেন—জ্ঞানলাভ হইলে আগামী এবং সঞ্চিত এই দ্বিবিধ কর্ম্ম ক্ষয় পায়; কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যাধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন। কোন ব্যাধ একটি মৃগকে লক্ষ্য করিয়া ধনুতে একটি বাণ সংযোজিত করিয়াছে। বাম হস্তে অপর

একটি শর এবং পৃষ্ঠে বাণ-পূর্ণ তূণীর রহিয়াছে। অদূরস্থিত পলায়মান মৃগের উদ্দেশ্যে শর নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরক্ষণে ভগবৎকৃপায় ব্যাধের জ্ঞানোদয় হইল। অকস্মাৎ বৈরাগ্যের আবির্ভাব হওয়ায়, হস্ত ও পৃষ্ঠস্থিত বাণ পরিত্যাগ করিল। স আর কখনও প্রাণিহত্যা করিবে না; কিন্তু যে বাণটী হস্তচ্যুত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্যভূত মৃগকে বিদ্ধ করিবেই। সেইরূপ জ্ঞানলাভ হইলে, বর্ত্তমানে যে কর্ম্ম ভবিষ্যৎ কর্ম্মের বীজস্বরূপ হইতেছে অথবা যে কর্ম্মের ফলভোগ এখনও আরম্ভ হয় নাই, সঞ্চিত রহিয়াছে, সেই উভয়বিধ কর্ম্মই বিনষ্ট হইতে পারে; কিন্তু যে কর্ম্মের ফলে বর্ত্তমান দেহ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সম্যক্ ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই ক্ষয় হয় না। কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত বটে; শাস্ত্রেও আছে—'মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি', অভুক্ত কর্ম্ম কোটিকল্প কালেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আমাদের কিন্তু মনে হয়— যখন ভগবান্ বলিয়াছেন—'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে' তখন যথার্থ জ্ঞানলাভ হইলে, নিশ্চয়ই সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান যতটা উজ্জ্বল হইলে—জ্ঞানের যে অবস্থায় পৌঁছিলে, সাধকের প্রারব্ধ-কর্ম্ম-ফলরূপ এই স্থূল দেহটি পর্য্যন্তেরও বিলয় হইয়া যায়, জ্ঞানের সেই উন্নত স্তরে উপস্থিত হইতে পারিলে, যথার্থই সর্ব্ব-কর্ম্ম-ক্ষয় হইয়া যায়। জ্ঞান যতটুকু উজ্জ্বল হইলে আগামী ও সঞ্চিত কর্ম্মমাত্র ক্ষয় পায়, সাধকগণ দৃঢ় অধ্যবসায়-বলে ততটুকু পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন; কিন্তু যাহাতে প্রারব্ধ পর্য্যন্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তত উজ্জ্বল জ্ঞান লাভ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। যাঁহারা বারংবার সমাধিস্থ হইয়া, আবার দেহাত্মবোধে ব্যুত্থিত হন, বুঝিতে হইবে—তাঁহারা জ্ঞানের সেই উজ্জ্বলতম ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহাদের প্রারব্ধ-ভোগ-ক্ষেত্ররূপ দেহটি থাকিয়া যায়; কিন্তু সাধকের এমন একটী দিন আসে—যে দিন সমাধিস্থ হইয়া আর দেহাত্মবোধে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। "যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম"; ইহাই জ্ঞানের উজ্জ্বলতম স্বরূপ এবং জ্ঞানের এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে যথার্থ সম্যক্ জ্ঞান অধিগত হয়।

এবমেষা সমুৎসন্না ব্রহ্মণা সংস্তুতা স্বয়ম্।
প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥৭৫॥
ইতি মার্কণ্ডেয়-পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে
মধুকৈটভবধঃ ॥

অনুবাদ। ব্রহ্মা কর্তৃক স্তুত হইয়া, মহামায়া এইরূপে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বৎস সুরথ! এই দেবীর প্রভাব—মাহাত্ম্য পুনরায় বর্ণনা করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত সাবর্ণিক-মন্বন্তরীয় দেবী-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে মধুকৈটভ-বধ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা বা মন কর্তৃক স্তুত হইলেই দেবী স্বয়ং বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হন। যতক্ষণ মাত্র বুদ্ধিতে ভগবদ্‌ভাব ফোটে, ততক্ষণ সত্তামাত্রের উপলব্ধি হয়। প্রাণে যখন ভগবদ্‌ভাব বিকাশ পায়, তখন সর্ব্বত্র অব্যক্ত চৈতন্য-সত্তা প্রত্যক্ষ হয়। আর যখন মন পর্য্যন্ত ভগবদ্‌ভাবে তন্ময় হইয়া পড়ে, তখনই মা আমার মনোময়ী ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মময়ী বিশিষ্ট মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া থাকেন; সুতরাং ব্রহ্মা বা মন যদি মায়ের আরাধনা করে, যদি মাতৃ-আবির্ভাবের জন্য ব্যাকুল হয়, তবে মা নিশ্চয়ই এইরূপ স্থূলমূর্ত্তিতেও দেখা দেন। এইরূপ যাঁহারা বুদ্ধি, প্রাণ ও মন সম্যক্‌ভাবে মাতৃ-ময় করিয়া মাতৃ-লাভে ধন্য হয়েন, তাঁহাদের সেই দর্শনই সর্ব্ববিধ সংশয়ের নিরাস ও হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ করিয়া দেয়।

যাঁহারা বুদ্ধি ও প্রাণের সন্ধান না লইয়া, মাত্র মনের গতি কথঞ্চিৎ ভগবৎমুখী করিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হন, তাঁহারাও অনেক সময় বিশিষ্ট মূর্ত্তির দর্শন পাইয়া থাকেন; কিন্তু সেই মূর্ত্তি চিত্রাঙ্কিত মূর্ত্তির ন্যায় জড় ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। মাতৃ-ধর্ম্মের—মাতৃ-মহত্ত্বের অভিব্যক্তি না থাকিলে, মূর্ত্তি কদাপি সাধকের অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারে না।

সে যাহা হউক, এই প্রথম চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই—

সমাধি-সহায় সুরথরূপী জীবাত্মা মেধসরূপী বিজ্ঞানময় গুরুর চরণে আশ্রয় লইয়া ক্রমে ক্রমে মাতৃ-মহত্বের—মহামায়ার প্রভাব দর্শনে ধন্য হইতেছে। মধু ও কৈটভ—আগামী-কর্ম্মের বীজ। এই বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত অর্থাৎ পুনরায় অঙ্কুর-উৎপাদন শক্তি শূন্য হইলেই ব্রহ্মগ্রন্থি ভেদ হয়। "আর আমি কিছু চাই না, ঐহিক পারত্রিক কোনরূপ ভোগের—ফলের কামনা আমার নাই" এইরূপ নিষ্কাম ভাবই, "এক আমি বহু হইব" এই আদিম সংস্কারের বিরোধী। আচার্য্য শঙ্করের ভাষায় ইহাকে 'ইহামূত্র-ফলভোগ বিরাগ' বলা হয়। তিনি বলেন,—ঐটা হইলে, তবে পরমাত্মসাক্ষাৎকারলাভ হয়, আর দেবী-মাহাত্ম্য বলেন—মহামায়ার তামসী মূর্ত্তিতে আবির্ভাব এবং বিষ্ণুর জাগরণ হইলেই যথার্থ ফলভোগ-বিরাগ উপস্থিত হয়। আমরা জানি—মাকে দেখিবার পূর্ব্বে কেহ পূর্ণভাবে বাসনা ত্যাগ করিতে পারে না।

মাকে দেখিবার উপায় কি? উপায় ইচ্ছা। দেখিবার ইচ্ছা হইলেই দেখা যায়। তিনি ত আর লুকাইয়া নাই যে, কোনও রূপ উপায়ের সাহায্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তিনি সর্ব্বত্র সুপ্রতিভাত! জীবের ইচ্ছা হয় না, তাই দেখে না। মাকে দেখিবার ইচ্ছা হইলেই তিনি সদ্‌গুরুরূপে প্রথমে দেখা দেন। সদ্‌গুরু লাভ হইলেই সাধক তাহার দেহ মনপ্রাণ সর্ব্বস্ব গুরু-চরণে অর্পণ করিতে উদ্যত হয়। ক্রমে গুরুই তাহার "আমি" হইয়া যান, জীব-ভাবীয় কর্ত্তৃত্ববোধ শিথিল হইয়া পড়ে, সৎ, অসৎ যেরূপ কর্ম্মই হউক, সে আর "আমি করিতেছি" এরূপ ধারণাই করিতে পারে না। তখন 'কেনাপি দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' এইরূপ জ্ঞানে জাগতিক কার্য্যগুলি অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। তাহারই ফলে বর্ত্তমান কর্ম্মগুলি অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্য হয়; সুতরাং উহা ভবিষ্যৎ কর্ম্মের বীজরূপে বা বন্ধনরূপে পরিণত হয় না। এইরূপে জাগতিক কর্ম্মে যে পরিমাণে আসক্তি কমিয়া আসিতে থাকে, সেই পরিমাণে হৃদয়স্থ গুরুর প্রতি সাধকের আসক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। আসক্তি যত বৃদ্ধি পায়, ততই সে তাহাতে মুগ্ধ হইতে থাকে। ক্রমে সর্ব্বতোভাবে

আত্মসমর্পণ করিয়া, সাধক নিশ্চিন্ত হয়। তখন বুঝিতে পারে—গুরু ও মা ভিন্ন নহেন, একজন। তিনিই অন্তরে থাকিয়া, তাহার যাবতীয় অনুষ্ঠান শেষ করাইয়া লইতেছেন। এই সময়ই সাধক দেখিতে পায়—তাহার ত্রিবিধ কর্ম্মফল ক্ষয় করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে মা বিশিষ্টভাবে আবির্ভূত হইতেছেন। তখন আর তাহার কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু থাকে না। অহংবুদ্ধিতে বিশিষ্টপুরুষকার প্রয়োগ করিতে হয় না। কোনও অলজ্ঘ্য নিয়মবশে সমস্ত কার্য্যগুলি যেন একটীর পর একটী স্বয়ং নিষ্পন্ন হইয়া যাইতেছে। যখন যে গ্রন্থিটি ভেদ করিবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায় প্রয়োগ আবশ্যক, মা আমার স্বয়ং সেইরূপভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকেন। ইহাই সাধনা-জগতের যথার্থ ক্রম বা সোপান। যে কোন সম্প্রদায়ের সাধকই হউন, তাহাকে এই সাধারণ ক্রমগুলির মধ্যে আসিয়া পড়িতেই হইবে। তবে একটী কথা, ইহার প্রথমটি আসিলেই, পর পরটী আপনি আসিতে থাকে, ইহাই সাধনার সুশৃঙ্খল পদ্ধতি। সুরথসমাধির উপাখ্যানের ভিতর দিয়া এই তত্ত্বই সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

প্রথমে মধুকৈটভনিধন বা সত্যপ্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় মহিষাসুরবধ বা চৈতন্য প্রতিষ্ঠা এবং সর্ব্বশেষে শুম্ভবধ বা আনন্দপ্রতিষ্ঠা। মা আমার 'সচ্চিদানন্দস্বরূপা'। তাঁহার জগৎমুখী অভিব্যক্তি বা সৃষ্টি যেরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ (পূর্ব্বে ইহা বিশেষভাবে বলা হইয়াছে), আত্মাভিমুখী অভিব্যক্তি বা প্রলয়ও সেইরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপ; সুতরাং সৎ বা সত্যের প্রতিষ্ঠাই সাধনার প্রথমস্তর (১), চিৎ বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা দ্বিতীয় স্তর এবং সর্ব্বশেষে আনন্দপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নিত্যমুক্তভাব। অথবা সত্য ও প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইলে, আনন্দপ্রতিষ্ঠা আপনিই হয়। শুধু অস্তিত্বের উপলব্ধিই যথার্থ সত্যপ্রতিষ্ঠা। এই "মা রহিয়াছ" এই বিশ্বাস ঘনীভূত হইলেই জীবভাবীয় কর্তৃত্ব শিথিল হয়। আগামীকর্ম্মের মূল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহাকেই ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ বা মধুকৈটভবধ কহে।

কেহ কেহ অনুরাগ এবং বিদ্বেষকে মধু ও কৈটভ বলেন। তাঁহাদের

(১) সত্য প্রতিষ্ঠা-নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে ইহা সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে।

সহিত আমাদের কোনরূপ বিপ্রতিপত্তি নাই; কারণ, রাগ এবং দ্বেষ এই দুইটীই যথার্থ বন্ধনের হেতু। রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত হইলেই কর্ম্মগুলি বন্ধন-উৎপাদন বিষয়ে শক্তি-হীন হয়। সর্ব্বকর্ম্মের ভিতর যে একমাত্র সত্যস্বরূপা মহামায়া নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন, এই সত্যাংশমাত্র জীবের লক্ষ্য হইলেই, কর্ম্মগুলি রাগদ্বেষশূন্য হইয়া যায়। তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই, যাহাতে উহা নিষ্পন্ন হইতে পারে; সুতরাং এ দিক দিয়া দেখিতে গেলেও সত্যপ্রতিষ্ঠাই যে মধুকৈটভ-নাশের আভ্যন্তরিক তাৎপর্য্য, তাহাতে কোনরূপ সংশয়ই উঠিতে পারে না।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু জীবাত্মরূপী সুরথের সংশয় নিরাশ করিতে গিয়া বিজ্ঞানময় গুরু মেধস্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্য মহামায়া যখন বিশিষ্টভাবে আবির্ভূতা হন, তখনই তিনি উৎপন্না বলিয়া অভিহিতা হইয়া থাকেন।" পরম করুণাময় গুরু সুরথকে মহামায়ার সেই আবির্ভাবটী প্রত্যক্ষ করাইয়া বলিলেন—"এবমেষা সমুৎপন্না"। বিপন্ন ব্রহ্মাকে অসুরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া, মা কিরূপে তামসী-মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হয়েন, তাহা দেখাইয়া দিলেন এবং পরে যথাক্রমে আরও বিশিষ্ট আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করাইবেন, তাই বলিলেন—মহামায়ার আরও মহত্ত্বের কথা আমি বর্ণনা করিতেছি, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর—দর্শন কর।

মায়ের প্রিয়তম সন্তান! সাধক মনুজবৃন্দ! তোমরা কি এইরূপ মধুকৈটভের দ্বারা—ক্ষণস্থায়ী বিষয়ানন্দজনিত চঞ্চলতা দ্বারা আপনাদিগকে উৎপীড়িত বলিয়া মনে করিতেছ? যদি এই বহুত্বের আনন্দকে উৎপীড়ন ও আত্মবঞ্চনা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই তুমি সদ্গুরু-কৃপায় মাতৃ-স্নেহে মুগ্ধ হইতেছ। অচিরাৎ মা তোমায় বক্ষে লইবেন, তাহারই পূর্ব্ব আয়োজন চলিতেছে। তুমি মোক্ষশাস্ত্র উপনিষদ্রহস্য বা গীতার সোপানশ্রেণী ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" আমিতত্ত্বে—চিন্ময়-ক্ষেত্রে প্রশান্ত উদার মাতৃ-বক্ষে—আনন্দময় মুক্তি-জলধিতে ঝাঁপ দিয়াছ! নিশ্চয় ডুবিবে।

তিনটী তরঙ্গমাত্র দেখিতে পাইবে। তাহার একটীতে তোমার অবিশ্বাস ও সন্দেহের যে লেশটুকু ছিল, তাহা ধুইয়া সর্ব্ববিধ বাসনার অনল নির্ব্বাপিত করিয়া দিবে। তখন অন্তরের অন্তস্তম তল অন্বেষণ করিয়াও বিন্দুমাত্র কামনার সন্ধান পাইবে না। সর্ব্বত্র আনন্দময় মাতৃ-সত্তার বিশ্বাস হিমাচলের মত দৃঢ় ও অচল-প্রতিষ্ঠ হইবে। যে মনকে এখন বহুত্বপ্রিয় ও বিষয়াসক্ত বলিয়া নিজেকে অকর্ম্মণ্য—মাতৃ-লাভের অযোগ্য বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছ, সেই মনই অগ্রসর হইয়া মাতৃ-শক্তি উদ্বোধিত করিয়া বহুত্ব ও তন্মূলক আনন্দ বা আসক্তির উচ্ছেদ সাধন করিবে। মধুকৈটভ নিহত হইবে। তোমার আগামীকর্ম্মের বীজ উন্মূলিত হইবে। ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ হইবে—তুমি সত্যপ্রতিষ্ঠ হইবে। সেই তরঙ্গটী এই চলিয়া গেল। ক্রমে আরও দুইটী তরঙ্গ আসিবে। উহার একটীতে তোমার সর্ব্বময় আত্মসত্তার—মাতৃ-সত্তার দৃঢ় বিশ্বাসকে প্রাণময় চৈতন্যময় করিয়া দিবে। সর্ব্বত্র আত্ম-প্রাণের লীলা-বিলাস দেখিয়া আত্মহারা হইতে আরম্ভ হইবে। বিষ্ণু বা প্রাণময় গ্রন্থির উচ্ছেদসাধন হইবে। সঞ্চিত-কর্ম্মফল-ভোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি প্রাণপ্রতিষ্ঠ হইবে! সর্ব্বশেষে আর একটী তরঙ্গ আসিবে—উহা তোমার বিশ্বময় প্রসারিত মহান্ আমিটীকে একেবারে আনন্দসমুদ্রে ডুবাইয়া দিবে। পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানময় রুদ্রগ্রন্থির উচ্ছেদ হইবে। প্রারব্ধ কর্ম্মফলস্বরূপ স্থুল দেহটী পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া যাইবে, তুমি আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

তাই, বিজ্ঞানময় গুরু ব্রহ্মর্ষি মেধস্ সত্যের বৈজয়ন্তী বহন করিয়া স্নেহ-করুণা-পূর্ণ কণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন—এস সুরথ! এস সমাধি! এস সাধক! এস অমৃতের বরপুত্র! "প্রভাবমস্যা দেব্যাস্তু ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে" আবার দেবীর মাহাত্ম্য বলিব—দেখাইব। কে কোথায় আছ—সকলে মিলিয়া কোটি কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে মা মা বলিয়া অগ্রসর হও! মাতৃ-প্রভাব—মায়ের মধ্যম এবং উত্তম চরিত্রের বিস্ময়পূর্ণ কাহিনী, অভূতপূর্ব্ব সাধনরহস্য শ্রবণ কর—প্রত্যক্ষ কর, ধন্য হও! অজ্ঞানান্ধ নয়ন জ্ঞানাঞ্জনে উন্মীলিত হউক! শ্রদ্ধা-ভক্তি-হীন শুষ্ক-হৃদয়

পরাভক্তির বিশুদ্ধ মন্দাকিনী-ধারায় অভিপ্লাবিত হউক! হৃতাশ কর্ম্মহীন অলসপ্রাণ আবার নিয়ত কর্ম্মপরায়ণ হউক! তোমরা জ্ঞান-ভক্তিকর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়-পূর্ণ অবস্থায় উপনীত হও।

এস মা আমার! সন্তান-স্নেহে মুগ্ধ হইয়া একবার সত্যলোক হইতে ছুটিয়া এস! আমরা বড় কাঙ্গাল—বড় মলিন সাজিয়া বসিয়া আছি! কিছুতেই এই দীনতা, মলিনতা দূর করিতে পারিতেছি না। চতুর্দ্দিক হইতে মিথ্যার—ভ্রান্তির অন্ধকার যেন আরও নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। একবার দেখ মা! তোমার প্রিয়তম সন্তানগণ দুর্ভিক্ষ মহামারী জলপ্লাবন প্রভৃতি উৎপীড়নে জর্জ্জরীভূত, সন্দেহ অবিশ্বাস অশ্রদ্ধার প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে হৃদয়ের সরস ও প্রশান্ত ভাবগুলি উন্মূলিত, নিরানন্দ ও মৃত্যুই যেন এ যুগের লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং এই যুগসন্ধির মহাক্ষণে একবার আবির্ভূত হও মা! একবার স্নেহ করুণাভার নম্রা মূর্ত্তিতে দাঁড়াও। আনন্দের—অমৃতের পূতধারায় আমাদিগকে অভিষিক্ত করিয়া দাও! আমরা যে—বিজ্ঞানময়ী, আনন্দময়ীর বড় স্নেহের সন্তান, তুমি যে আমাদিগকে বড় ভালবাস মা, এই কথাটা শুধু বুঝিতে দাও! আমাদের অবিশ্বাসী অকৃতজ্ঞ প্রাণ একবার স্বীকার করুক—তুমি আমাদের একান্ত আশ্রয়—সন্তানবৎসলা জননী। আমাদের বুঝাইয়া দাও মা। আমরা সর্ব্বতো-ভাবে তোমারই অঙ্কে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। আমরা যে যথার্থই অমৃতের সন্তান, আনন্দই যে আমাদের স্বরূপ ইহা আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করাইয়া দাও মা! আমরা যেন সত্য সত্যই সরল-প্রাণ শিশুর মত সমবেত কণ্ঠে একবার মা বলিয়া ডাকিতে পারি। তোমার মঙ্গলময় স্নেহাশীর্ব্বাদ আমাদের মস্তকে বর্ষিত হউক; আমরা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হই—ধন্য হই! মা! তুমি আমাদের ভক্তিহীন প্রণাম গ্রহণ কর।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥

ইতি সাধন-সমর বা দেবীমাহাত্ম্য-ব্যাখ্যায় ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ
নামক প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

সাধন-সমর কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত—

পুস্তকাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সাধন-সমর বা দেবী-মাহাত্ম্য—(শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১ম খণ্ড—মধুকৈটভবধ বা ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ। ৪৲। ২য় খণ্ড—মহিষাসুরবধ বা বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ। ৪৲। ৩য় খণ্ড—শুম্ভবধ বা রুদ্র-গ্রন্থিভেদ। ৪৲। ইহা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়পূর্ণ গ্রন্থ। কিরূপে জীবের অজ্ঞানগ্রন্থি ছিন্ন হয়, কিরূপে সাধক সত্যে, প্রাণে ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবন্মুক্তির আস্বাদ পায়, তাহা বিশদ্‌ভাবে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দী—১ম খণ্ড ৪৲, ২য় খণ্ড ৪৲, ৩য় খণ্ড যন্ত্রস্থ।

যোগরহস্য—মূল্য ৬৲ টাকা। পাতঞ্জল যোগদর্শনের অপূর্ব্ব ভাষ্য (দেবনাগর অক্ষরে) সমন্বিত প্রাঞ্জল বাংলা ব্যাখ্যা। যোগদর্শনের এরূপ অবশ্যজ্ঞাতব্য রহস্য ইতিপূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। সাধনার প্রতি-পদক্ষেপে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। সাধকজগতে এই গ্রন্থ অমূল্য রত্ন। শিক্ষিত ব্যক্তি ও সাধকমাত্রেই ইহা পাঠে মুগ্ধ হইবেন।

রাজগুহ্যযোগ—(গীতার ৯ম অধ্যায়ের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা)। মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র। সর্ব্বমানবের পরম কল্যাণের পথ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শ্রীভগবান সাধকবরেণ্য অর্জ্জুনের নিকট সাধনার যে গুপ্তরহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন, সেই সহজ ধর্ম্ম কেমন করিয়া জীবনে জীবনে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহাই ব্রহ্মর্ষি তাঁহার স্বভাবসুলভ অননুকরণীয় প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দী সংস্করণ ১৷৹।

সত্য-প্রতিষ্ঠা—সর্ব্বপ্রথম কোন্ কেন্দ্র হইতে সাধনার সূত্রপাত করিলে, সকল সম্প্রদায়ের সাধনাই অচিরে সফলতামণ্ডিত হয়, তাহা ইহাতে অতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵৹ আনা। হিন্দী সংস্করণ মূল্য ৷৹ আনা। ইংরেজী সংস্করণ মূল্য ৷৹ আনা। ডাচ্ ভাষায়ও ইহার অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—মূল্য ৸৹ আনা। বিশ্বের প্রতি পদার্থে কিরূপে প্রাণ দর্শন করিতে হয়, কি উপায়ে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়া জীবন সার্থক হয়, তাহারই সরল ও অব্যর্থ পন্থা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দী সংস্করণ ৷৹

সত্যালোকম্—শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত মোহমুদ্গরের ছন্দে কতিপয় সুমধুর শ্লোক ও তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা। সাধনার সকল কথাই ইহাতে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আনা। হিন্দী সংস্করণ মূল্য ।৹ আনা।

শোকশান্তি—প্রিয়জনের বিরহে শোকসন্তপ্তজনগণের প্রাণে আশু শান্তি প্রদানের সহজ ও সরল উপায়। মূল্য ॥০ আনা। হিন্দি ।৵০ ইংরেজী ।০

পূজাতত্ত্ব—এই পুস্তকখানিতে পূজাসম্বন্ধীয় বহু জ্ঞাতব্য বিষয় যথা—পূজার প্রয়োজনীয়তা, পূজার সঙ্কল্প ও কাল, দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, শ্যামাপূজা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা প্রভৃতি চতুর্দ্দশটী পূজার অভূতপূর্ব্ব বিবরণ, এবং মূর্ত্তিরহস্য, মন্ত্ররহস্য, প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ১।০। হিন্দী সংস্করণ ১।০

উপাসনা—ইহাতে বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত কতিপয় শ্রেষ্ঠ স্তোত্র, মন্ত্রাদি ও তাহার সুললিত ব্যাখ্যা আছে। মূল্য ॥৵০ আনা। হিন্দী সংস্করণ মূল্য ॥০ আনা।

মাতৃদর্শন—মূল্য বার আনা। শ্রীশ্রীঠাকুরের লিখিত ...বিষয়িক প্রবন্ধ সমূহ একত্র সঙ্কলিত। ইহাতে অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, রটন্তী ও শ্যামা বিষয়ক এক একটি এবং শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা বিষয়ক নয়টি প্রবন্ধ আছে।

দেশাত্মবোধ বা শ্রীশ্রীদেশমাতৃকা পূজা—মূল্য ।০ আনা। হিন্দি সংস্করণ মূল্য ।০ আনা। দেশের দুরবস্থা দূর করিবার অব্যর্থ পন্থা। দেশাত্মবোধ কি এবং কি উপায়ে লাভ করা যায়, তাহাই এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীদেশমাতৃকার প্রতিচিত্র—মূল্য ॥০ আনা।

শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিচিত্র—বড় ১৲। ঐ মাঝারি ।৹ ছোট ।০ আনা।

জীবন-লক্ষ্য—(ব্রহ্মচারী বিশ্বরঞ্জন লিখিত) মূল্য ১৵০ মাত্র। এই পুস্তকে সরল সত্যের সন্ধান এরূপ সহজভাবে গ্রন্থকার দিয়াছেন যে, কোন আনন্দানুসন্ধিৎসু-পিপাসু পথিক তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিত রত্নের সন্ধান পাইবেন।

সত্য কথা—আত্মবল লাভের সর্ব্বপ্রথম সোপান। মূল্য এক আনা।

অমৃত—ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেবের অমৃতময় উপদেশ সমূহের একত্র সঙ্কলন্ মূল্য ।৵০।

ঈশোপনিষদ বা বৈদিযুগে ঈশ্বরোপসনা—তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সাধকগণের পরম অবলম্বন—মূল্য ২৲।

আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুস্তকগুলির বহুল প্রচারে কৃতযত্ন হইয়া দেশে পুনরায় সত্যধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিবেন। ইতি—

বিনয়াবনত—**কার্য্যাধ্যক্ষ**